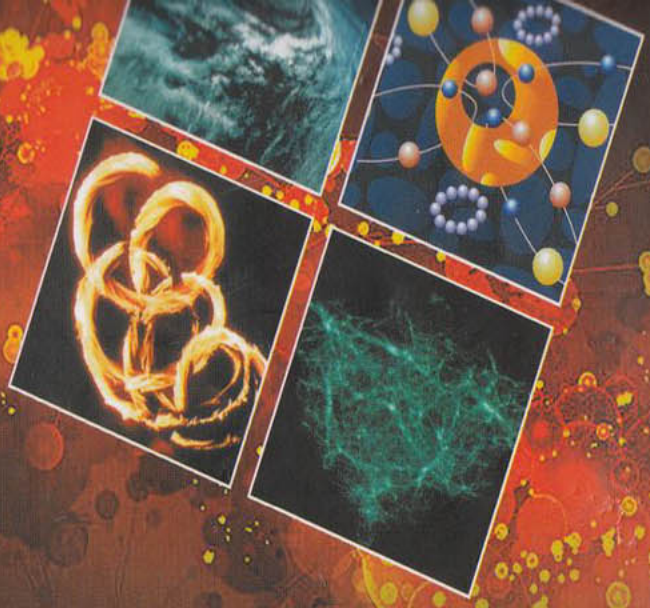

আরো

একটুখানি বিজ্ঞান

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আরো কিছু বিজ্ঞান

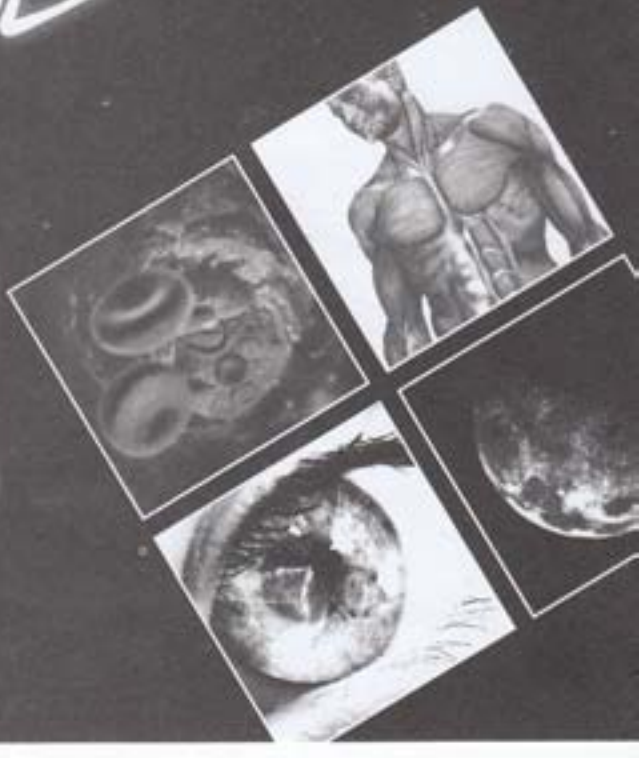

কাকলী প্রকাশনী

উৎসর্গ

প্রিয় রিহা

তোমার সাথে কখন
দেখা হবে?

ভূমিকা

আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না যে আমি ছয় বছর থেকে "কালি ও কলম" এর প্রতি সংখ্যায় বিজ্ঞানের উপর নিয়মিতভাবে লিখে এসেছি। প্রথম তিন বছরের পর লেখাগুলো সংকলিত করে প্রকাশিত হয়েছিল "একটুখানি বিজ্ঞান"। বইটির জন্যে ছেলে বুড়ো অনেকেরই একধরণের মমতা জন্মেছিল তাই পরের তিন বৎসরের লেখাগুলো সংকলিত করে "আরো একটুখানি বিজ্ঞান" প্রকাশ করার সাহস দেখাচ্ছি। এই লেখাগুলো পড়ে একজন মানুষেরও যদি বিজ্ঞানের রহস্যময় জগত নিয়ে একটু কৌতুহল হয় আমি মনে করি আমার পরিশ্রমটুকু সার্থক হয়েছে।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
২৪ জানুয়ারি ২০১০

সূচিপত্র

বিজ্ঞান :

1. বিজ্ঞান এবং অপ-বিজ্ঞান / ১১

বিজ্ঞানী :

2. হাইপেশিয়া / ১৮
3. কণার নামটি বোজন / ২৪
4. একটি নিরুদ্দেশের কাহিনী / ২৯

প্রযুক্তি :

5. ন্যানোটেক / ৩৪
6. নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র / ৪০

রসায়ন :

7. কার্বন-ডাই-অক্সাইড : পৃথিবীর ভিলেন? / ৪৬
8. একটি বিস্ময়কর বস্তু / ৫২

উদ্ভিদ বিজ্ঞান :

9. বাঁশের ফুল / ৫৮

প্রাণিজগৎ :

10. বার্ড ফ্লু / ৬৩
11. অন্য রকম খাওয়া-দাওয়া / ৬৯
12. খাদ্য যখন রক্ত / ৭৪
13. এইডস এবং একটি মহাদেশের অপমৃত্যু / ৭৯
14. মানবদেহের ডিজাইন সমস্যা / ৮৫
15. ঈশপের সেই কাক / ৯০

মনোবিজ্ঞান :

16. স্কিতজোফ্রেনিয়া / ৯৬
17. মনোবিজ্ঞানের বিখ্যাত কিছু পরীক্ষা / ১০১
18. পশু মানব / ১০৭

পদার্থ বিজ্ঞান :

19. সলিটন / ১১৩
20. নিউট্রিনো / ১১৮
21. ম্যানহাটান প্রজেক্ট / ১২৪
22. রহস্যময় প্রতি-পদার্থ / ১৩০
23. ভর আছে, ওজন নেই / ১৩৫

আবহাওয়া ও পরিবেশ :

24. পৃথিবীর তাপমাত্রা : পৃথিবীর দুঃখ / ১৪০
25. বজ্রপাত / ১৪৫
26. ঘূর্ণিঝড় / ১৫১
27. শক্তির নবায়ন / ১৫৬

সৌরজগৎ :

28. প্লুটো কেন গ্রহ নয় / ১৬২
29. পৃথিবীর মানুষ ও আকাশের চাঁদ / ১৬৭
30. সূর্যগ্রহণ ও একজন সুপার স্টার / ১৭২

জ্যোতির্বিদ্যা :

31. অতিকায় হীরক খণ্ড / ১৭৮

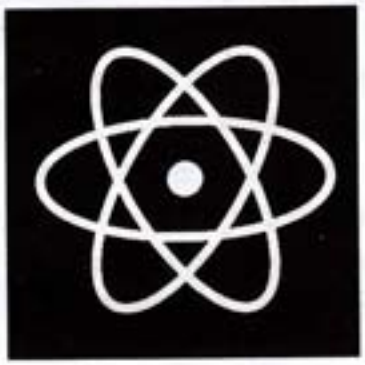

1. বিজ্ঞান এবং অপ-বিজ্ঞান

কিছুদিন আগে আমার কাছে একটা ছোট ছেলে এসেছে, সে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল তার মাথায় একটা বৈজ্ঞানিক আইডিয়া এসেছে সেটা সে আমাকে বলতে চায়। ছেলেটি মুখ খোলার আগেই আমি বুঝে গেলাম "আইডিয়া"টি কী—কারণ আমি যখন তার বয়সী ছিলাম তখন আমার মাথাতেও এরকম "বৈজ্ঞানিক আইডিয়া" এসেছিল, তবে আমি সাহস করে কারো কাছে যেতে পারি নি। সে কী বলবে জানার পরও আমি তাকে পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে দিলাম, একটা জেনারেটর আর একটা মোটর ব্যবহার করে সে অফুরন্ত শক্তি বের করে আনবে। জেনারেটর ঘুরাবে মোটরকে, মোটর ঘুরাবে জেনারেটরকে এভাবে চলতেই থাকবে।

পদার্থবিজ্ঞান পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে শক্তিকে ব্যবহার করলেই তার খানিকটা অপচয় হয়—তাই যেটুকু শক্তি দেওয়া হয় তার থেকে অনেক কম শক্তি ফেরত পাওয়া যায়, সেজন্যে কখনোই "অফুরন্ত শক্তি" বা "চির ঘূর্ণায়মান" যন্ত্র তৈরি করা যায় না। আমি ছোট ছেলেটাকে তার মতো করে বিষয়টা বুঝিয়ে দিলাম, সে ব্যাপারটা বুঝে খুশি হয়ে ফিরে গেল!

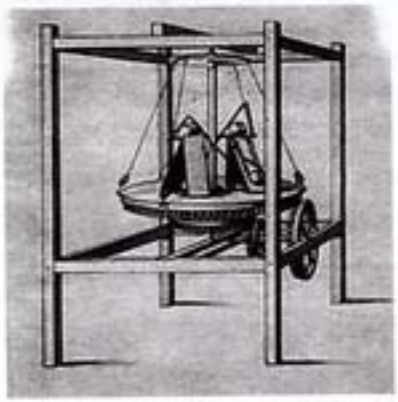

1.1 নং ছবি : 1818 সালে চার্লস রেডহেফার চির-ঘূর্ণায়মান একটি যন্ত্র তৈরি করে মানুষজনকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল– পরে দেখা যায় সেটি সত্যি নয়

মজার ব্যাপার হচ্ছে বড়রা ব্যাপারটা বুঝতে চায় না! একবার একজন বয়স্ক মানুষ এসে আমাকে একই ধরনের একটা "চির ঘূর্ণায়মান" যন্ত্রের কথা বলল। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম কেন এটা কাজ করবে না কিন্তু সে বুঝতে রাজি হলো না! তার ধারণা আমি একটু সাহায্য করলেই সে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী হয়ে কোটি কোটি টাকা কামাই করতে থাকবে—আমি হিংসা করে তাকে নিরুৎসাহিত করছি! বাধ্য হয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস

করলাম, সে কী তার একটা যন্ত্রের মডেল তৈরি করতে পারবে? মানুষটি বলল অবশ্যই পারবে, সেটা তৈরি করতে তার দরকার কয়েক ফিট প্লাস্টিকের নল, দুটো পানির বোতল আর কিছু পানি। আমি তাকে বললাম সে যদি তার মডেলটা তৈরি করে আনতে পারে তাহলে আমি তাকে একটা নোবেল পুরস্কার, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার, তার সাথে বিবিসি, সি. এন. এন.-এ সাক্ষাৎকারের সবকিছু ব্যবস্থা করে দেব। মানুষটি উত্তেজিত ভঙ্গিতে তখন তখনই বের হয়ে গেল—দুই ঘণ্টার মাঝে সে মডেলটা তৈরি করে এনে আমাকে দেখাবে। দুই ঘণ্টার পর আরো ছয় বছর পার হয়ে গেছে সেই মানুষটি তার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার উপযোগী যন্ত্রের মডেল নিয়ে আর ফিরে আসেন নি। কী কী করা যায় না সেটা জানা থাকা ভালো তাহলে সেটা করতে গিয়ে সময় নষ্ট হয় না। (কোনো কোণকে সমান তিন ভাগে ভাগ করা যায় না, পাঁচ ঘাত সমীকরণ সমাধান করা যায় না, ঠিক সে রকম শক্তি না দিয়ে শক্তি ফিরে পাওয়া যায় না।)

এই ব্যাপারগুলো ঘটে বিজ্ঞান না জানার কারণে—আমাদের খবরের কাগজ মাঝে মাঝে দায়িত্বহীন কাজ করে বসে থাকে। বিজ্ঞান জানা নেই তাই আজগুবি কিছু একটা দাবি করে কোনো মানুষ একটা ঘোষণা দিয়ে বসে থাকে, খবরের কাগজ সেগুলো যাচাই করে ছাপে, এই দেশে থাকার কারণে সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না বলে তারা সরকারকে গালাগাল করে! কিন্তু সবারই জানা থাকতে হবে কোনো শক্তি না দিয়ে সে কখনো শক্তি ফিরে পাবে না এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ঘোষণা দিতে হয় বিজ্ঞানের জার্নালে, কখনোই সেটা খবরের কাগজে দিতে হয় না!

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে একেবারে এই বর্তমানকাল পর্যন্ত অনেকেই কোনো শক্তি না দিয়েই শক্তি পাবার জন্যে যন্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করে এসেছেন। শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ডায়েরিতেও এরকম যন্ত্রের ছবি রয়েছে—এই যন্ত্রগুলোর মাঝে একটা মিল রয়েছে, কেউ এগুলো তৈরি করতে পারে না, ড্রয়িং হিসেবেই থেকে যায়।

"চির ঘূর্ণায়মান" অফুরন্ত শক্তির ইঞ্জিনের মডেল যে একেবারেই তৈরি হয় নি তা নয়। 1813 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার্লস রেডহেফার নামে একজন মানুষ একটা যন্ত্র তৈরি করেছিল যেটা নিজে থেকেই ঘুরত। অনেক মানুষ সেটা পয়সা খরচ করে দেখতে এসেছিল এবং রেডহেফার সাহেব রীতিমতো বড়লোক হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিছু সন্দেহপ্রবণ মানুষ কাঠের কিছু তক্তা খুলে দেখতে পেলেন একাধিক পুলি ব্যবহার করে ছাদে বসে একটা বুড়ো মানুষ সেটা দর্শকদের জন্যে ঘুরিয়ে যাচ্ছে।

কেউ যেন মনে না করে পৃথিবীতে রেডহেফারের মতো মানুষ খুব কম—ইতিহাস ঘাঁটলে এরকম অসংখ্য মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে। বৈজ্ঞানিক জুয়াচুরির এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণটির নাম পিল্টডাউন মানব (Piltdown Man)। 1912 সালে চার্লস ডসন নামে একজন দাবি করলেন তিনি মানুষ আর বানরের মাঝখানে যোগসূত্রটি খুঁজে পেয়েছেন।

AMARBOI.COM

সেই ফসিলের প্রাণীটির ছিল মানুষের মতো মস্তিষ্ক করোটি কিন্তু বানরের মতো চোয়াল। মিউজিয়ামে সেই ফসিলটি চল্লিশ বছর মানুষের কৌতূহলকে নিবৃত্ত করেছে—1953 সালে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন এটি পুরোপুরি জুয়াচুরি। বিভিন্ন প্রাণীর ফসিল দিয়ে এটাকে তৈরি করা হয়েছে। মাথাটি মানুষের, চোয়ালটি ওরাংওটানের, দাঁতগুলো জলহস্তীর! এই জুয়াচুরিতে যারা অংশ নিয়েছিলেন তার মাঝে শার্লক হোমসের স্রষ্টা আর্থার কোনাল ডায়ালের নামও আছে।

1.2 নং ছবি : পিল্টডাউন ম্যানের ছিল বৈজ্ঞানিক জুয়াচুরির একটা বড় উদাহরণ, যেখানে দাবি করা হয়েছিল এটি মানুষ ও বানরের ভেতরের যোগসূত্র

এরকম আরেকটি বৈজ্ঞানিক জুয়াচুরির নাম হচ্ছে কার্ডিফের দানব। 1869 সালে জর্জ হাল একটা বিশাল জিপসাম খণ্ডের মাঝে প্রায় দশ ফুট লম্বা একটা মানুষের শরীর খোদাই করে সেটাকে প্রাচীন ফসিলের রূপ দিয়ে কার্ডিফকে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর তার নিজের কিছু শ্রমিকদের ব্যবহার করে সেটাকে আবিষ্কার করার একটা নাটক করলেন। দশ ফুট লম্বা মানুষের পাথর হয়ে থাকা শরীর নিয়ে সারা পৃথিবীতে বিশাল হইচই। মানুষ টিকেট কিনে সেটা দেখতে যেত। শেষ পর্যন্ত নিজেদের মাঝে ঝগড়া হওয়ার কারণে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে যায়। কার্ডিফের দানবের সেই দেহটি এখনো সযত্নে রক্ষা করা আছে, মানুষজন এখনো সেটা দেখতে পায় তবে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের জন্যে নয় জুয়াচুরির একটি উদাহরণ দেখার জন্যে।

এ ধরনের জুয়াচুরি যে শুধু অতীতে ঘটেছে তা নয়—অতি সাম্প্রতিককালেও সেটা ঘটেছে। একটা বিখ্যাত উদাহরণ হচ্ছে ফিলিপাইনের তাসাডে সম্প্রদায়। 1971 সালে ফিলিপাইনের একজন মন্ত্রী তাদের একটা দ্বীপে এই সম্প্রদায়কে খুঁজে পেলেন যারা সেই প্রস্তর যুগ থেকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে আছে, সভ্য জগতের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা খুব শান্ত প্রকৃতির, গায়ে কোনো কাপড় নেই, উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে গেল, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে তাদের উপর বিশাল নিবন্ধ ছাপা হলো!

AMARBOI.COM

আসলে পুরোটাই হলো জুয়াচুরি। কিছু মানুষকে টাকা-পয়সা দিয়ে প্রস্তর যুগের মানুষ হিসেবে সাজিয়ে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের ধোঁকা দেয়া হয়েছিল! ফিলিপাইনের সেই মন্ত্রী তাসাডে সম্প্রদায় রক্ষা কমিটি করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়ে প্রেসিডেন্ট মার্কোসের পতনের পর দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন।

একজন খুব সম্পদশালী মানুষ তার নিজেকে ক্লোন করেছে এরকম একটা খবর 1978 সালে আমি টাইম পত্রিকায় দেখেছিলাম। ডেভিড ররভিক নামে যে মানুষটি এই তথ্য পরিবেশন করেছিল কেউ তার কথা বিশ্বাস করে নি—তারপরেও সে এই জুয়াচুরি করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করে ফেলেছিল।

একেবারে খাঁটি বিজ্ঞানীরাও যে জুয়াচুরি করেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার উদাহরণও আছে। সাউথ কোরিয়ার বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী হোয়াং উ-সাক এরকম একজন মানুষ। সারা জীবনের পরিশ্রমে তিনি যেটুকু অর্জন করেছিলেন 1978 সালে তার পুরোটুকুই ধুলায় মিশে গেল যখন জানা গেল তার গবেষণার বড় অংশই হচ্ছে জালিয়াতি। তিনি গবেষণার যে 11টি ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন তার 9টির কোনো অস্তিত্বই নেই, পুরোটাই বানানো।

1.3 নং ছবি : জিপসামে মানবদেহ খোদাই করে তৈরি করা হয়েছিল বিখ্যাত কার্ডিফের দানব

ভুল গবেষণার ফলাফল শুধু যে অসৎ বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করেন তা নয়, অনেক সময় খাঁটি বিজ্ঞানীও সেটা নিজের অজান্তেই করে ফেলেন! এরকম একজন বিজ্ঞানীর নাম ব্লাস কাবেরা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ম্যাগনেটিক মনোপোল নামে প্রকৃতির একটি রহস্যময় জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছেন। প্রকৃতিতে যদি এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে পুরো পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস অন্য রকম করে লিখতে হবে। অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীর ধারণা এটা আছে, শুধুমাত্র এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাই 1982 সালের 14 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনের ভালোবাসার দিনে যখন সেটা খুঁজে পাওয়া গেল তখন সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে গেল। বিজ্ঞানী ব্লাস কাবেরা রাতারাতি জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেলেন, তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। পৃথিবীর সব ল্যাবরেটরি তখন সেই ম্যাগনেটিকে মনোপোল খোঁজার কাজে লেগে গেল—কিন্তু কেউ আর সেটা খুঁজে পেল না, ব্লাস কাবেরার সেই একমাত্র গবেষণার ফলাফলটিকে এখন একটা বৈজ্ঞানিক ভুল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

তবে যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিয়ে সবচেয়ে বেশি হইচই হয়েছিল সেটার নাম কোল্ড ফিউসান। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে বড় বড় নিউক্লিয়াসকে ভেঙে ছোট টুকরো করে শক্তি

AMARBOI.COM

বের করা হয়। এভাবে শক্তি তৈরি করার পর যে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য তৈরি হয় সেটি থেকে শুধু এই পৃথিবী নয় পুরো সৃষ্টি জগতের মুক্তি নেই। কিন্তু যদি ছোট ছোট নিউক্লিয়াসকে একত্র করে একটু বড় নিউক্লিয়াস তৈরি করে শক্তি বের করা হয় সেটি অত্যন্ত নিরাপদ। শুধু তাই নয় তার জ্বালানি হিসেবে খুব সহজেই হাইড্রোজেনের মতো অতি সহজে পাওয়া যায় এরকম মৌল ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতিটির নাম ফিউসান এবং ফিউসান ঘটানোর জন্যে হালকা নিউক্লিয়াসগুলোকে ভয়ঙ্কর গতিতে একের সাথে অন্যকে আঘাত করতে হয়। তার জন্য যে তাপমাত্রা দরকার সেই তাপমাত্রা ধারণ করার মতো কোনো পাত্র নেই!

1.4 নং ছবি : 1971 সালে ফিলিপাইনে তাসাডে নামে প্রস্তর যুগের সভ্যতার একটি সম্প্রদায় খুঁজে পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়েছিল– যেটি ছিল একটি সাজানো ঘটনা

তাই 1989 সালে স্ট্যানলি পন এবং মার্টিন ফ্লিশম্যান নামে দুজন বিজ্ঞানী যখন ঘোষণা করলেন যে তারা একটা কাচের বোতলে সাধারণ তাপমাত্রায় ফিউসান প্রক্রিয়াটা ঘটিয়ে ফেলেছেন তখন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ সত্যিই যদি এটা ঘটে থাকে তাহলে পৃথিবীতে আর শক্তির অভাব থাকবে না। সাধারণ তাপমাত্রায় এই ফিউসান ঘটে থাকে বলে এর নাম কোল্ড ফিউসান (Cold Fusion)। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এখন স্ট্যানলি পন আর মার্টিন ফ্লিশারম্যানের পরীক্ষাটা করে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ সেটা করে নিশ্চিত হতে পারলেন না। কোটি কোটি টাকা খরচ করে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা রায় দিলেন পরীক্ষার ফলাফলটি ছিল ভুল!

1.5 নং ছবি : কোল্ড ফিউসান–পৃথিবীতে সাড়া জাগানো একটি ঘটনা, যদিও বিজ্ঞানীরা কখনো তার পুনরাবৃত্তি করতে পারেন নি

এখন পর্যন্ত যতগুলো উদাহরণ দেয়া হয়েছে তার সবগুলোই হলো ইচ্ছে করে কিংবা ভুল করে ভুল তথ্য দিয়ে বিজ্ঞানীদের

AMARBOI.COM

বিভ্রান্ত করা। এর বাইরেও কিছু উদাহরণ আছে যেখানে রসিকতাপ্রিয় বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র তামাশা করার জন্যে জার্নালে গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। এর মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনার নায়ক এলেন সোকাল নামে একজন পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি শুধুমাত্র ঠাট্টা করার জন্যে গাল ভরা শব্দ দিয়ে ভরাট করে একটা পুরোপুরি অর্থহীন একটা পেপার লিখে প্রকাশ করার জন্যে সেটা ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত একটা জার্নালে পাঠিয়ে দিলেন। জার্নালের বড় বড় সম্পাদকরা সেটা ছাপিয়েও দিলেন—এলেন সোকাল তখন তার এই রসিকতাটুকু ফাঁস করে দিলেন। সারা পৃথিবীর শিক্ষাবিদরা তখন যে অট্টহাস্য করেছিলেন এখনো সেটা শুনতে পাওয়া যায়। প্রায় একই ধরনের কাণ্ড করেছিল এম. আই. টি.-এর কিছু ছাত্র। তারা একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখেছে যেটা বৈজ্ঞানিক পেপার লিখতে পারে। কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করে সেটি এমন কিছু লিখে ফেলতে পারে যেটা পুরোপুরি অর্থহীন কিন্তু দেখায় সত্যিকারের গবেষণা পেপারের মতো। সাইজেন (SCIGEN) নামে সেই প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে তারা একটা পেপার লিখে তারা একটা কনফারেন্সে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানে সেটা ছাপাও হয়ে গেল! ছাত্ররা যখন তাদের রসিকতাটুকু প্রকাশ করেছে তখন সেই কনফারেন্সের বড় বড় কর্মকর্তাদের মুখ দেখানোর উপায় নেই!

1.6 নং ছবি : 2001 সালে ফক্স টেলিভিশন একটা অনুষ্ঠান করে দাবি করল মানুষ আসলে চাঁদে যায় নি।

বিজ্ঞানের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা নিয়ে শুধু যে বিজ্ঞানীরাই ভুল-ভ্রান্তি করে ফেলেন তা নয়—তাদের অন্য এক ধরনের শত্রু আছে, সেটা হচ্ছে প্রচারলোভী কিছু মানুষ কিংবা প্রতিষ্ঠান। আমরা সবাই জানি পৃথিবীর মানুষ 1969 সালে চাঁদে গিয়েছিল। সেটা একই সাথে ছিল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর মানুষের দুঃসাহসের একটা চমৎকার উদাহরণ। 2001 সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফক্স টেলিভিশন হঠাৎ করে একটা বিশাল অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করল যেখানে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করল পৃথিবীর মানুষ আসলে কখনোই চাঁদে যায় নি। পুরোটাই নাসার একটা ধাপ্পাবাজি।

এরকম উদ্ভট একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে সেটা অবিশ্বাস্য কিন্তু মজার ব্যাপার হলো পৃথিবীর অনেক মানুষ সেটা বিশ্বাস করে ফেলল! ফক্স টেলিভিশনের সেই অনুষ্ঠানেই যেসব যুক্তি দেয়া হয়েছিল তার সবগুলোই হচ্ছে অত্যন্ত দুর্বল এবং খোঁড়া যুক্তি, অনুষ্ঠানটা

AMARBOI.COM

প্রচার করা হয়েছিল শুধুমাত্র একটা হইচই সৃষ্টি করে তাদের চ্যানেলের রেটিং বাড়ানোর জন্যে—সোজা কথায় কিছু পয়সা কামাই করার জন্যে!

কাজেই আমরা যারা বিজ্ঞানকে অত্যন্ত পূতপবিত্র মহান একটা বিষয় হিসেবে জানি তাদেরকেও খুব সতর্ক থাকতে হয়। পৃথিবীর অনেক ধুরন্ধর মানুষ বিজ্ঞানকে অপবিজ্ঞানে রূপ দিয়ে কোথাও নামধাম এবং কোথাও টু-পাইস কামিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে।

যারা সত্যিকার বিজ্ঞানী তাদের এ ধরনের ফাঁদে পা দেয়ার কোনো ভয় নেই, অন্যদের একটু সতর্ক করে রাখা ভালো।

AMARBOI.COM

2. হাইপেশিয়া

আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান পড়ি তখন আমাদের ক্লাসের অর্ধেকই ছিল মেয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রে পি.এইচ.ডি. করতে যাই তখন আমাদের ক্লাসে ছাত্রী ছিল মাত্র একজন। আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম—আমার ধারণা ছিল "উন্নত" দেশে নিশ্চয়ই বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে অনেক বেশি ছাত্রী পড়ালেখা করবে। মজার কথা হচ্ছে সে দেশে গিয়ে আমি আরও বিচিত্র তথ্য আবিষ্কার করলাম, সেখানে মেয়েরা খুব ভাবনা-চিন্তা করে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি থেকে দূরে থাকে। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়গুলো মেয়েদের বিষয় নয়—এগুলো হচ্ছে কাঠখোট্টা ছেলেদের বিষয়! শুধু তাই নয়, কোনো মেয়ে যদি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করে তাহলে ছেলেরা তার থেকে শত হস্ত দূরে থাকে, মেয়েটি যদি লেখাপড়ায় ভালো হয় তাহলে তো কথাই নেই, সেই মেয়েটি হয়তো বিয়ে করার জন্যে কোনো ছেলের দেখাই পাবে না!

2.1 নং ছবি : বিজ্ঞানী হাইপেশিয়ার জন্ম হয় দেড় হাজার বছর আগে

AMARBOI.COM

কথাটা যদিও হালকা সুরে বলা হয়েছে কিন্তু এর মাঝে সত্যতা আছে। শুধু যে বর্তমানকালে এর সত্যতা আছে তা নয়, এটি সবসময়েই সত্যি। ছেলেরা আর মেয়েরা কখনোই সমান অবস্থায় থেকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কিংবা সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষাতে অংশগ্রহণ করতে পারল না। তাই পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা পুরুষ বিজ্ঞানী কিংবা প্রযুক্তিবিদ যেরকম পাই মেয়েদের সেভাবে পাই না, তুলনামূলকভাবে তাদের সংখ্যা অনেক কম। ইদানীং তবু চোখে পড়ার মতো মহিলা বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ দেখা যায়, অতীতে বা মধ্যযুগে তাদের সংখ্যা ছিল একেবারেই হাতেগোনা।

AMARBOI.COM

2.2 নং ছবি : আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি ঘিরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি চমৎকার পরিবেশ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল

সুদূর অতীতে—আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছরের আগে এরকম একজন মহিলা বিজ্ঞানী ছিলেন, তার নাম ছিল হাইপেশিয়া (Hypatia)। তিনি এমন একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন যাকে এতকাল পরেও অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে

সেই সময়ে মেয়েদের লেখাপড়া করার বা অন্য কিছু করার সুযোগ দূরে থাকুক তাদেরকে সামান্য সম্মানটুকুও দেয়া হতো না। সত্যি কথা বলতে কী সে সময়ে মেয়েরা ছিল পুরুষদের সম্পত্তি! সেই সময়ে হাইপেশিয়া শুধু যে একজন তুখোড় গণিতবিদ, সফল পদার্থবিজ্ঞানী, প্রতিভাময় জ্যোতির্বিদ আর নিউপ্লেটোনিক দর্শন ধারার প্রধান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির শেষ গবেষক।

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির গবেষক কথাটার মনে হয় আলাদা করে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। আমরা পৃথিবীতে এখন যে সভ্যতাটুকু দেখছি সেটার পিছনে যেটা সবচেয়ে বেশি কাজ করছে সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান। পৃথিবীতে আরো একবার সেই বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এবং সেটা ঘটেছিল আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিকে ঘিরে। প্রায় দুই হাজার বছর আগে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে এই লাইব্রেরিটি গড়ে উঠেছিল। আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি ছিল সত্যিকার অর্থে একটি কসমোপলিটান শহর। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ এই শহরে থাকত। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর যে গ্রিক সম্রাটরা মিসর শাসন করত তারা সত্যিকার অর্থে জ্ঞানের সাধনা করত। সেই দুই হাজার বছর আগে তারা গবেষণার গুরুত্বটি ধরতে পেরেছিল, তাই আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিকে ঘিরে তারা গবেষণার একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল, যেখানে গবেষকরা গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে শুরু করে ভূগোল বা সাহিত্যে গবেষণা করতেন।

গবেষণা করার জন্যে দরকার বই, তাই আলেকজান্দ্রিয়ায় একটা বিশাল লাইব্রেরি গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। বলা যেতে পারে সেই যুগে আলেকজান্দ্রিয়া ছিল এই প্রকাশনার স্বর্গ। বই বলতে আমরা এখন যা বুঝি আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে পৃথিবীতে বই মোটেও সে রকম ছিল না। প্রিন্টিং প্রেস ছিল না বলে সেগুলো ছিল হাতে লেখা। আসল কপিটি লেখক নিজে লিখতেন এবং অন্যেরা সেটা দেখে দেখে তার অন্য কপিগুলো

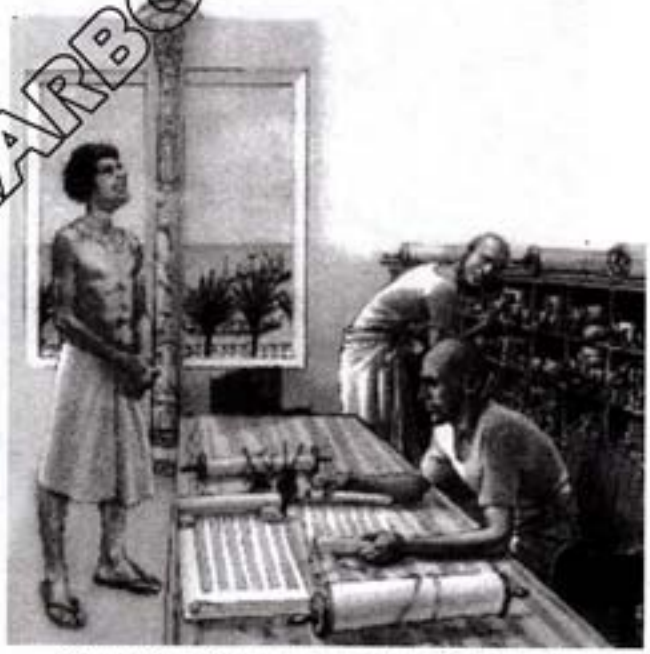

2.3 নং ছবি : দুই হাজার বছর আগে হাতে লিখতে হতো বলে বইগুলো ছিল অত্যন্ত মূল্যবান

AMARBOI.COM

আরেক জায়গায় লিখে রাখতেন। সে কারণে বইগুলো ছিল অসম্ভব মূল্যবান এবং যাদের কাছ সেই বইগুলো থাকত তারা যক্ষের মতো সেগুলো আগলে রাখত। মিসরের গ্রিক সম্রাটরা অনেক কষ্ট করে সারা পৃথিবী থেকে অমূল্য বইগুলো সংগ্রহ করেছিল। কেউই তাদের আসল বইটি হাতছাড়া করতে চাইত না—অনেক টাকা জামানত রেখে তারা বইগুলো কপি করার জন্যে আনত! সেই সময়কার গ্রিক সম্রাটরা বইগুলোকে এতই মূল্যবান মনে করত যে তারা জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হতে দিয়ে সেই বইগুলো আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে রেখে দিত—ফেরৎ দিত কোনো একটা কপি! লাইব্রেরিতে ঠিক কতগুলো বই ছিল সঠিকভাবে কেউ জানে না, অনুমান করা হয় তার সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশি ছিল। এই বিশাল লাইব্রেরিকে ঘিরে গবেষকরা যেসব কাজ করেছেন সেগুলো ছিল যুগান্তকারী। যেমন ইরাতোস্থিনিস প্রথম বারের মতো নিখুঁতভাবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বের করে তার একটা ম্যাপ তৈরি করেছিলেন, হিপার্কাস নক্ষত্রের প্রকৃতির সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তাদের নিখুঁত ক্যাটালগ তৈরি করেছিলেন। ইউক্লিড তার বিখ্যাত জ্যামিতির বই লিখেছিলেন, গেলেন লিখেছিলেন চিকিৎসা আর শারীরবিদ্যার বই। এরকম একটি-দুটি নয়, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিভিত্তিক গবেষণার অজস্র উদাহরণ দেয়া যায়।

সেই লাইব্রেরির একজন গবেষক ছিলেন হাইপেশিয়া। তার জন্ম হয় 370 সালে। তার বাবাও ছিলেন বড় দার্শনিক, নাম থিওন। সেই যুগে মেয়েরা যখন পুরুষের সম্পত্তি হয়ে ঘরের ভেতর আটকা পড়ে থাকত তখন হাইপেশিয়া সদর্পে পুরুষদের জগতে ঘুরে বেড়াতেন। যে কোনো হিসেবে হাইপেশিয়া ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী, তাকে বিয়ে করার জন্যে পুরুষরা পাগল ছিল কিন্তু তিনি কখনো বিয়ে করতে রাজি হন নি। কথিত আছে তার এক ছাত্র একবার তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল, সেই ছাত্রকে তিনি মেয়েলী বিড়ম্বনার একটা নমুনা দেখিয়ে মোহমুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছিলেন! এই সুন্দরী মহিলা নিয়মিতভাবে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে বক্তৃতা দিতেন—তার বক্তৃতা শোনার জন্যে অনেক দূর থেকে জ্ঞানী-গুণী মানুষেরা আসত, রীতিমতো টিকেট কিনে তারা হাইপেশিয়ার বক্তৃতা শুনত!

2.4 নং ছবি : হাইপেশিয়াকে যে নিষ্ঠুরতায় হত্যা করা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে তার উদাহরণ খুব কম রয়েছে

হাইপেশিয়া যে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন তা নয়, আলেকজান্দ্রিয়া শহরের নগরপাল অরিস্টিসের সাথেও তার এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তখন খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার শুরু হয়েছে, খ্রিস্টান আর্চ বিশপের নাম সিরিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে ধর্মান্ধ খ্রিস্টানরা ধর্মবিরোধী মনে করত তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক হাইপেশিয়া ছিল তাদের চক্ষুশূল। বিশেষ

AMARBOI.COM

করে নগরপাল অরিস্টিসের সাথে তার বন্ধুত্বকে সিরিল খুব খারাপ চোখে দেখতেন। হাইপেশিয়া খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন কিন্তু তার ধারণা ছিল ধর্ম হতে হবে যুক্তিনির্ভর আর জ্ঞানভিত্তিক। হাইপেশিয়া তার বক্তৃতায় সেটা প্রচারও করতেন, গোঁড়া আর ধর্মান্ধ খ্রিস্টানরা সেটা খুব অপছন্দ করত। একজন মেয়ে হয়ে তার এরকম সাহসী কথাবার্তায় মানুষগুলো খুব বিরক্ত হতো। তারা চেষ্টা করত যেন হাইপেশিয়ার বক্তৃতা শুনতে কেউ না আসে, তার বিজ্ঞানের উপর কথাবার্তা কেউ শুনতে না পারে। কিন্তু এই তেজস্বী আর সুন্দরী মহিলাকে তারা কোনোভাবে থামাতে পারল না, তাই তারা তাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল।

2.5 নং ছবি : হাইপেশিয়াকে হত্যার জন্য জড়িত আর্চ বিশপ সিরিলকে ক্যাথলিক চার্চ সেইন্ট হিসেবে সম্মানিত করেছিল

417 খ্রিস্টাব্দে একদিন হাইপেশিয়া ঘোড়ার গাড়িতে ঘর থেকে বের হয়েছেন কাজে যাবার জন্যে, পথে তাকে ধর্মান্ধ মানুষেরা ঘিরে ধরল। মুহূর্তের মাঝে সেই মানুষগুলো তাকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে নেয়, তাকে বিবস্ত্র করে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় একটা গির্জায়, সেখানে শরীর থেকে তার মাংস খুবলে নেয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে, তারপর শরীর টুকরো টুকরো করে আগুনে ছুড়ে দেয় উন্মত্ত দানবের মতো। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নজির খুব বেশি আছে বলে জানা নেই। এই হত্যাকাণ্ডের পরপরই আর্চ বিশপ সিরিলকে সাধারণ মানুষ থেকে উপরের স্তরে নিয়ে সেইন্ট বানিয়ে দেয়া হয়—জগতে এর চাইতে উৎকট রসিকতা কী আর কিছু হতে পারে?

2.6 নং ছবি : আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিকে পুড়িয়ে শুরু হয় হাজার বছর দীর্ঘ এক অন্ধকার জগৎ

হাইপেশিয়াকে হত্যা করার সাথে সাথে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিরও দিন শেষ হয়ে যায়। এই লাইব্রেরিকে ঘিরে যে সভ্যতার জন্ম হয়েছিল সেই সভ্যতার বিকাশ থমকে দাঁড়ায়—একদিন দু'দিন নয়, প্রায় এক হাজার বছরের জন্যে। হাইপেশিয়া যেন ছিলেন একটা আলোর শিখা, ফুঁ দিয়ে সেই আলোর শিখা নিভিয়ে দেবার পর যেন পুরো জগৎটি এক হাজার বছরের জন্যে অন্ধকারে ডুবে

AMARBOI.COM

গেল। কোপার্নিকাস, গ্যালেলিও, নিউটনরা এসে সেই অন্ধকারকে দূর করার চেষ্টা শুরু না করা পর্যন্ত পুরো পৃথিবী এক হাজার বছরের জন্যে অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল!

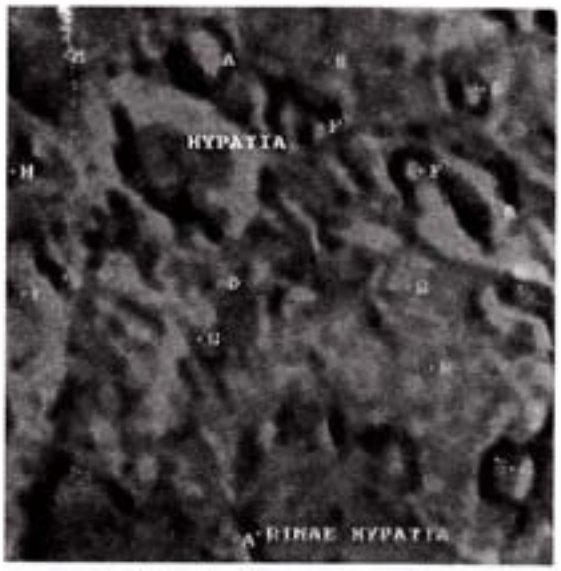

2.7 নং ছবি : হাইপেশিয়াকে স্মরণ করে চাঁদের এক অংশের নামকরণ করা হয়েছে

আলেকজান্দ্রিয়ার সেই লাইব্রেরি একদিন পুড়ে ছাই করে দেয়া হলো—ঠিক কারা সেটি করেছিল সেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। কথিত আছে লাইব্রেরির বইগুলো পুড়িয়ে গোসলখানার পানি গরম করা হয়েছে—দশ লক্ষের উপর বই পুড়িয়ে শেষ করতে সময় লেগেছে ছয় মাস থেকেও বেশি! পৃথিবীর ইতিহাসে এর থেকে হৃদয়বিদারক কোনো ঘটনা আছে বলে জানা নেই। হাইপেশিয়ার সব বই, গবেষণার সব নমুনা সেই লাইব্রেরির সাথে সাথে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। তার কাজের নমুনার বিশেষ কিছু নূতন পৃথিবীর মানুষ খুঁজে পায় নি—ভাসা ভাসাভাবে নানা সূত্র থেকে কিছু তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যে কোনো হিসেবে সেগুলো অসাধারণ।

মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্যে ধর্মান্ধ মানুষেরা এই অসাধারণ বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদকে কেটে টুকরো টুকরো করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। ধর্মান্ধ মানুষেরা ইতিহাসের পাতা থেকে কিন্তু তাকে মুছে দিতে পারে নি। আধুনিক পৃথিবীর মানুষ চাঁদের একটি অঞ্চলের নাম রেখেছে হাইপেশিয়ার নামে।

যতদিন আকাশে চাঁদ উঠবে ততদিন হাইপেশিয়া পৃথিবীর মানুষের কাছে বেঁচে থাকবেন জ্ঞানের প্রতীক হয়ে।

AMARBOI.COM

3. কণার নামটি বোজন

পদার্থবিজ্ঞানের আলো-আঁধারি জগৎ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জন্ম প্রক্রিয়া শুরু হয় 1900 সালে যখন ম্যাক্স প্লাংক আলো বিকীরণ সংক্রান্ত একটা বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্যে আলোকে বিচ্ছিন্ন কণা হিসেবে অনুমান করে নিলেন। এর আগে পর্যন্ত সবাই নিশ্চিতভাবে জানত আলো হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ—কাজেই ম্যাক্স প্লাংকের এই ঘোষণা পদার্থবিজ্ঞানের জগতে খুব বড় একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কিছুদিনের ভিতরেই বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ব্যাখ্যা করার জন্যে আলোর কণা তত্ত্ব ব্যবহার করে নোবেল পুরস্কার পেলেন। (তার আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল থিওরি অব রিলেটিভিটি কিন্তু সেটা এমনই বিচিত্র একটা বিষয় ছিল যে নোবেল কমিটির জন্যে সেটা হজম করা কঠিন ব্যাপার ছিল!) অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও নানা ধরনের পরীক্ষায় আলোর কণা তত্ত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন এবং পৃথিবীতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো নূতন করে লিখতে বাধ্য হলেন। ম্যাক্স প্লাংক জগদ্বিখ্যাত একজন পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিলেন!

3.1 নং ছবি : ম্যাক্স প্লাংক আলোকে কণা হিসেবে ধরে নিয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা করেছিলেন

AMARBOI.COM

পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আলোকে কণা হিসেবে দেখা গেছে সত্যি কিন্তু পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীদের সবার মনের ভেতরে একটা বিষয় খচখচ করছিল কারণ ম্যাক্স প্লাংক যেভাবে তার বিকীরণ সূত্রটি বের করেছিলেন সেখানে তার ব্যবহার করা যুক্তিতে একটা বড় গরমিল ছিল। পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সাথে মিলে যায় বলে কেউ সেটা ফেলেও দিতে পারেন না কিন্তু যুক্তির গরমিলটা মেনেও নিতে পারেন না—সবার ভেতরেই এক ধরনের অস্বস্তি। ঠিক এই সময়ে একজন তরুণ বিজ্ঞানী পুরো তত্ত্বটিকে সঠিক যুক্তির উপর দাঁড় করিয়ে সকল বিভ্রান্তি দূর করে পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে নিলেন—এই তরুণ বিজ্ঞানী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক একজন বাঙালি—তার নাম সত্যেন্দ্রনাথ বসু। স্নেহভরে আমরা শর্টকাট করে বলি সত্যেন বোস।

3.2 নং ছবি : ম্যাক্স প্লাংকের সূত্রকে সঠিক যুক্তির উপর দাঁড়া করিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসু, যার নামে বোজনের নামকরণ করা হয়েছে

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা সত্যেন বোস কত বড় বিজ্ঞানী সেটা অনুমান করাও কঠিন তবে তার একটা ধারণা দেয়ার জন্যে বলা যায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছু তৈরি হয়েছে যে সকল কণা দিয়ে সেই কণাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দুই ভাগের এক ভাগের নাম ফারমিওন—ইতালীয় বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নামে এই নামকরণ। অন্য ভাগের নাম আমাদের সত্যেন বোসের নামানুসারে রাখা হয়েছে বোজন (Boson)। ফারমিওন এবং বোজনের বিশেষ ধর্ম রয়েছে—খুব সহজ ভাষায় বলা যায় ফারমিওন কণাগুলো যেন একটু ঝগড়াটে ধরনের, একই ধরনের কণা হলে এক জায়গায় থাকতে পারে না ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকতে হয়। সেই তুলনায় বোজন হচ্ছে খুব সামাজিক টাইপের কণা, একই ধরনের বোজন এক জায়গায় থাকতে কোনো সমস্যা হয় না—তারা সেটা পছন্দই করে। আমাদের পরিচিত কণা দিয়ে উদাহরণ দিতে হলে বলতে হয় আলো আর ইলেকট্রনের কথা। আলো হচ্ছে বোজন আর ইলেকট্রন হচ্ছে ফারমিওন। ফারমিওনের জন্যে এক ধরনের পরিসংখ্যানের সূত্র গড়ে উঠেছে, সেটা ফারমি-ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স নামে পরিচিত। বোজনের পরিসংখ্যানের সূত্রকে বলা হয় বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স। কেউ যদি এই দুটো তত্ত্বের সাথে জড়িত বিজ্ঞানীদের নামগুলোর দিকে লক্ষ্য করে তাহলে আবিষ্কার করবে সত্যেন বোস ছাড়া অন্য সবাই তাদের কাজের জন্যে

AMARBOI.COM

নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন! আমাদের সত্যেন বোস যদি এত বড় বিজ্ঞানী না হতেন তাহলে কেন তাকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হলো না সেটা চিন্তা করে আমাদের ক্ষুব্ধ হবার কারণ হতো। এখন ব্যাপারটা হয়ে গেছে উল্টো—আমরা সবাই জানি তাকে নোবেল পুরস্কার দিতে পারলে নোবেল কমিটিই ধন্য হতে পারত!

সত্যেন বোস কেমন করে তার জগদ্বিখ্যাত বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স বের করলেন সেটা নিয়ে নানা রকম গল্প আছে। বলা হয়ে থাকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের ম্যাক্স প্লাংকের বিকীরণের সূত্রটি পড়ানোর সময় সেখানে যৌক্তিক গরমিলটি দেখানোর চেষ্টা করছিলেন। তিনি তার মতো করে যেভাবে বিষয়টা ব্যাখ্যা করছিলেন তার কারণে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন সেই গরমিলটি আর নেই—পুরো বিষয়টি একটা যৌক্তিক কাঠামোর মাঝে দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি তখন টের পেলেন পদার্থবিজ্ঞানের অনেক বড় একটি সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন।

সময়টা ছিল 1924 সালের প্রথম দিকে। তখন সত্যেন বোসের বয়স মাত্র ত্রিশ। খুব উৎসাহ নিয়ে সত্যেন বোস তার যুগান্তকারী আবিষ্কারটি লিখে সেই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ জার্নাল "ফিলোসফিকেল ম্যাগাজিন"-এ পাঠিয়ে দিলেন। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু ফিলোসফিকেল ম্যাগাজিন তার প্রবন্ধটি ছাপানোর অনুপযুক্ত বিবেচনা করে তার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিল! এরপর সত্যেন বোস যে কাজটি করলেন সেটা আরও অবিশ্বাস্য—তিনি তার প্রবন্ধটি পাঠালেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কাছে, সাথে একটা চিঠি। সেই চিঠিতে তার অনুরোধটি ছিল অকল্পনীয়। তিনি আইনস্টাইনকে লিখলেন এই প্রবন্ধটি পড়ে তার যদি মনে হয় এটা প্রকাশ করার উপযোগী তাহলে তিনি যেন জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সেটাকে সাইটশ্রিফট ফুয়ার ফিজিক (Zeitschrift Fur Physik) জার্নালে ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেন! যে কোনো হিসেবেই এটা এক ধরনের দুঃসাহস কিন্তু সত্যেন বোস এই দুঃসাহস করতে দ্বিধা করেন নি। তিনি খোলামেলাভাবে লিখলেন, যদিও তিনি আইনস্টাইনের কাছে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত তবু তিনি এটা লিখছেন কারণ সবাই আইনস্টাইনকে তাদের শিক্ষক মনে করে—এবং সে জন্যে সবাই তার ছাত্র। সত্যেন বোস

3.3 নং ছবি : পৃথিবীর যাবতীয় কণাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তার এক ভাগ ফারমিওনের নাম হয়েছে এনরিকো ফারমির নামে

আইনস্টাইনকে চিঠির শেষে মনে করিয়ে দিলেন, "আমার ঠিক জানা নেই আপনার মনে আছে কী না—কিছুদিন আগে কোলকাতা থেকে একজন আপনার রিলেটিভিটির উপর প্রবন্ধগুলো ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করার অনুমতি চেয়েছিল। আপনি অনুমতি দিয়েছিলেন এবং সেটা অনুবাদ করে বই হিসেবে বের করা হয়ে গেছে এবং আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি যে জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির উপর সেই প্রবন্ধগুলো অনুবাদ করেছি!"

সত্যেন বোস চিঠিতে লিখেন নি—কিন্তু আইনস্টাইনের কাছে প্রবন্ধটি পাঠানোর এবং সেটা অনুবাদ করে জার্নালে ছাপানোর অনুরোধ করার পিছনে আরো একটি কারণ ছিল। তখন সারা পৃথিবীতে সম্ভবত আইনস্টাইনই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি সত্যেন বোসের আবিষ্কারের গুরুত্বটা বুঝতে পারতেন। হলোও তাই, আইনস্টাইন প্রবন্ধটি পাওয়া মাত্র বসে বসে সেটাকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সত্যেন বোসের বলে দেয়া জার্নালে পাঠিয়ে দিলেন। নিচে তিনি শুধুমাত্র একটা ফুটনোট জুড়ে দিয়ে সেখানে লিখলেন, বোসের এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র এই ফুটনোটের জন্যে বিশ্বখ্যাত এই পরিসংখ্যান সূত্রটিতে আইনস্টাইনের নাম ঢুকে গেছে—এটাকে কেউ বোস স্ট্যাটিস্টিক্স বলে না—সবাই এটাকে বলে বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স! পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে এরকম উদাহরণ খুব বেশী নেই যেখানে একটি প্রবন্ধ অনুবাদ করার জন্যে একটি সূত্র অনুবাদকের নামেও পরিচিত হতে শুরু করেছে। তবে ব্যাপারটি নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তুলে নি কারণ এখানে অনুবাদক হচ্ছেন স্বয়ং আইনস্টাইন!

সত্যেন বোসের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আইনস্টাইন নিজেই সেটা নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন এবং সেখান থেকে বের হয়ে এলো জগদ্বিখ্যাত বোস-আইনস্টাইন কন্ডেনসেশন নামের একটি নূতন ধারণা! এই ধারণার উপর কাজ করার জন্যে 2001 সালে তিনজন পদার্থবিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে! মজার ব্যাপার হচ্ছে সত্যেন বোস নোবেল পুরস্কার পান নি কিন্তু তার কাজের উপর কাজ করে অনেকেই নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন!

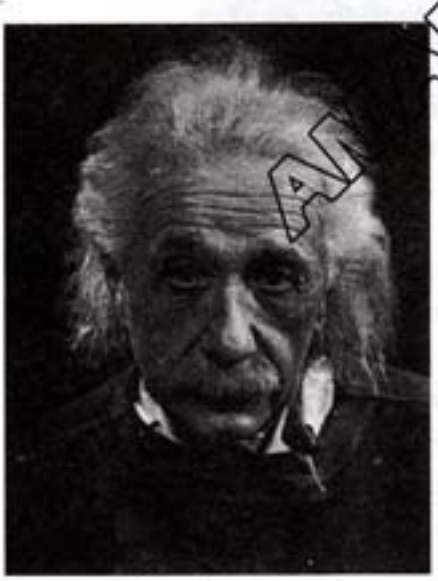

3.4 নং ছবি : জার্নালে ছাপানোর জন্যে আইনস্টাইন সত্যেন বোসের প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে দিয়েছিলেন

সত্যেন বোস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 1921 সালে রিডার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তখন তার বেতন ছিল মাত্র 400 টাকা (যদিও সে যুগে সেটাকে যথেষ্ট ভালো বেতন হিসেবেই বিবেচনা করা হতো!) দুই বছর অনেক পরিশ্রম করার পর তার বেতন মাত্র একশ টাকা বাড়িয়ে আরো দুই বছরের জন্যে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। সত্যেন বোস ঠিক তখন তার বিখ্যাত বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কাজ করছেন—তখন তার ইচ্ছে হলো ইউরোপে পৃথিবীর

সেরা বিজ্ঞানীদের সাথে সময় কাটানোর। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছরের জন্যে ছুটির আবেদন করলেন। তার ছুটি মঞ্জুর হলো। তিনি ইউরোপে গেলেন দুই বছরের জন্যে। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে 1927 সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিলেন।

সত্যেন বোস সুদীর্ঘ 24 বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছেন। তার আগ্রহ ছিল বহুমাত্রিক, বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের নানা ধরনের যন্ত্রপাতিও গড়ে তুলেছিলেন। আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন কার্জন হলের বিভিন্ন কোনায় পুরানো যন্ত্রপাতি পড়ে থাকতে দেখেছি, পুরানো মানুষদের জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছি সেগুলো নাকি সত্যেন বোসের হাতে তৈরি নানা এক্সপেরিমেন্টের অংশ।

3.5 নং ছবি : সত্যেন বোস তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

অসাধারণ প্রতিভাময় এই মানুষটি দেশ বিভাগের ঠিক আগে আগে কলকাতা ফিরে গিয়েছিলেন। তার কর্মময় জীবনের একটা অংশে তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দায়িত্বও পালন করেছেন। শুধু বিজ্ঞানচর্চা নয় বিজ্ঞানের শিক্ষার জন্যেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। 1974 সালে ফেব্রুয়ারির 4 তারিখ এই কর্মময় মানুষের জীবনাবসান হয়।

আমরা যখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ভবনের সাথে সাথে পদার্থবিজ্ঞান ভবনের নাম করেছিলাম সত্যেন বোস ভবন—তখন সেটা যেন আমরা না করতে পারি সে জন্যে সিলেট শহরের সকল ধর্মান্ধ শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ করে রেখেছিল!

ভাগ্যিস সত্যেন বোস ততদিনে মারা গেছেন—তাকে এই ঘটনাটি নিজের কানে শুনতে হয় নি!

4. একটি নিরুদ্দেশের কাহিনী

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন গাছের পাতা ছিঁড়তে বা তার ডাল ভাঙতে আমরা খুব সতর্ক থাকতাম। কারণ সেই জন্ম থেকে শুনে আসছি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু বলেছেন গাছের প্রাণ আছে, গাছও মানুষের মতো ব্যথা পায়। পৃথিবীর কত বিজ্ঞানীই তো কত কথা বলেছেন— তাদের সবার কথাই যে এরকম বেদবাক্য হিসেবে নেয়া হবে তা নয়, কিন্তু জগদীশচন্দ্র বসুর কথার একটা আলাদা গুরুত্ব ছিল, তার কারণ তিনি ছিলেন বাঙালি। শুধু যে বাঙালি তা নয়— তার জন্ম হয়েছিল আমাদের বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জে। বড় হয়ে জানতে পেরেছি গাছের প্রাণ আছে কথাটি সত্যি কিন্তু মানুষের মতো গাছের স্নায়ু নেই, তাই সেটা ব্যথা পায় কথাটি পুরোপুরি ঠিক নয়। সেই সময় প্রচলিত বিশ্বাস ছিল গাছের ভেতর তথ্যগুলো যায় রাসায়নিক বিক্রিয়া দিয়ে, জগদীশচন্দ্র বসু দেখিয়েছিলেন সেটা আসলে যায় বৈদ্যুতিক সংকেতের ভেতর দিয়ে। প্রায় একশ বছর আগে আমাদের দেশের একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে এরকম গবেষণা করে কিছু একটা বের করে ফেলা খুব সহজ কাজ ছিল না।

4.1 নং ছবি : বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি আমাদের মুন্সীগঞ্জে

আমরা জগদীশচন্দ্র বসুর কথা মনে রেখেছি, বইপত্রে তার কথা পড়ি, তাকে নিয়ে আলোচনা করি, তার প্রধান কারণ তিনি একজন বাঙালি বিজ্ঞানী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের তার কথা আলোচনা করার সে রকম কোনো কারণ নেই। কিন্তু 1998 থেকে হঠাৎ করে তার নামটা ঘুরেফিরে বিজ্ঞানী মহলে উঠে

AMARBOI.COM

আসছে তার কারণ সেই বছর IEEE-এর প্রসিডিংয়ে একটা যুগান্তকারী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, সেই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে রেডিও-এর প্রকৃত আবিষ্কারক মার্কোনি নন, রেডিও-এর প্রকৃত আবিষ্কারক হচ্ছেন আমাদের মুন্সীগঞ্জের বাঙালি বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। মার্কোনিকে রেডিও-এর আবিষ্কারক বলা হয় কারণ 1901 সালে তিনি কোনো তার ছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরের এক তীর থেকে অন্য তীরে প্রথমবার একটা সংকেত পাঠিয়েছিলেন। রেডিও বলতে আমরা আজকাল গান বা খবর শোনার জন্যে যে ছোট যন্ত্রটা বোঝাই, যেটা আমরা আমাদের পকেটে রেখে দিতে পারি, 1901 সালে সেটা মোটেও সেরকম কিছু ছিল না। সংকেতটা পাঠানোর জন্যে যে এন্টেনা ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা প্রায় দুইশ ফিট উঁচু ছিল, সেটাকে চালানোর জন্যে 25 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ লাগত, ভেতরে যে ক্যাপাসিটর ছিল সেটা ছিল প্রায় এক মানুষ সমান উঁচু!

AMARBOI.COM

4.2 নং ছবি : 1901 সালে রেডিও সংকেত পাঠানোর জন্যে এন্টেনার উচ্চতা ছিল প্রায় দুইশ ফিট, বিদ্যুৎ লাগত 25 কিলোওয়াট

সংকেতটাকে শোনার জন্যে যেটা ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা ছিল আরো চমকপ্রদ! প্রায় সাড়ে চারশ ফুট লম্বা একটা এন্টেনাকে ঘুড়ি দিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে সংকেতটাকে ধরতে হয়েছিল। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আসা সেই ওয়ারলেস বা বেতার সংকেতটা ছিল

খুব দুর্বল, তার জন্যে দরকার ছিল খুবই সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। যদি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি না থাকত তাহলে এই ঐতিহাসিক পরীক্ষাটা কখনোই করা সম্ভব হতো না। মার্কোনি এই সূক্ষ্ম পরীক্ষাটি করার জন্যে যে যন্ত্রটা ব্যবহার করেছিলেন সেই সময় তাকে বলা হতো কোহেরার (coherer)। তখন যে কোহেরার ব্যবহার করা হতো সেগুলো খুব ভালো কাজ করত না—একটা সংকেত পাওয়ার পরপরই কোহেরারকে ছোট হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে পরের সংকেত পাবার জন্যে প্রস্তুত করতে হতো। মার্কোনি তার পরীক্ষায় যে কোহেরার ব্যবহার করেছিলেন সেটাই ছিল রেডিও বা তারহীন সংকেত পাঠানোর প্রক্রিয়ার একেবারে মূল বিষয়। মার্কোনি কিংবা তার সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কেউ কখনো ভুলেও স্বীকার করেন নি যে সেটা আসলে আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু! তাই বিজ্ঞানের জগতে রেডিও-এর আবিষ্কারক হিসেবে জগদীশচন্দ্র বসুর পরিবর্তে মার্কোনির নামটা ঢুকে গিয়েছে।

মজার কথা হচ্ছে এর প্রায় দশ বছর আগে 1899 সালে লন্ডনের রয়েল সোসাইটিতে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু তার এই কোহেরারটি নিয়ে একটা নিবন্ধ পড়েছিলেন। তিনি যে যন্ত্রপাতিগুলো তৈরি করেছিলেন তার অনেকগুলোই কোলকাতার বোস ইনস্টিটিউটে রাখা আছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মার্কোনির অনেক আগেই তিনি কোলকাতায় ওয়ারলেস বা বেতার দিয়ে সংকেত পাঠিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে তা-ই যদি সত্যি হয় তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসে রেডিও-এর আবিষ্কারক হিসেবে জগদীশচন্দ্র বসুর নাম নেই কেন? উত্তরটাও খুব সোজা, এর মূল সমস্যা হচ্ছে জগদীশচন্দ্র বসু নিজেই! 1901 সালে মার্কোনির ঐতিহাসিক পরীক্ষার পর জগদীশচন্দ্র বসু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিটা পড়লেই কারণটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মূল চিঠিটা সম্ভবত বাংলাতেই লেখা হয়েছিল, তার ইংরেজি অনুবাদ থেকে আবার বাংলায় অনুবাদ করা হলে সেটা হয় এ রকম :

> "আমার বক্তৃতার কিছু আগে একটা খুব বিখ্যাত টেলিগ্রাফ কোম্পানির কোটিপতি মালিক আমার কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানাল খুব জরুরি একটা ব্যাপারে সে আমার সাথে দেখা করতে চায়। আমি তাকে জানালাম আমার কোনো সময় নেই। উত্তরে সে বলল সে নিজেই চলে আসছে, সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের মাঝে সে আমার সাথে দেখা করতে চলে এলো, হাতে একটা পেটেন্ট ফর্ম। সে এসে আমাকে সাংঘাতিকভাবে অনুরোধ করে বলল, আমি যেন আজকের বক্তৃতায় কিছুতেই আমার গবেষণার সব তথ্য সবাইকে জানিয়ে না দিই। সে বলল, "এর মাঝে অনেক টাকা! আমি তোমার জন্যে একটা পেটেন্ট করিয়ে দিই, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না তুমি কী পরিমাণ টাকা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছ। ইত্যাদি ইত্যাদি", মানুষটা অবশ্যই আমাকে জানিয়ে দিল, "আমি শুধু লাভের অর্ধেক টাকা নেব, পুরো খরচ আমার—ইত্যাদি!"
>
> এই কোটিপতি মানুষটি আমার কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত জোড় করে এসেছিল শুধুমাত্র আরো কিছু টাকা বানানোর জন্যে। প্রিয় বন্ধু আমার, তুমি যদি শুধু এই

AMARBOI.COM

দেশের মানুষের লোভ আর টাকার জন্যে লালসা একটিবার দেখতে! টাকা টাকা আর টাকা—কী কুৎসিত লোভ! আমি যদি একবার এই টাকার মোহে পড়ে যাই তাহলে কোনোদিন এর থেকে বের হতে পারব না। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি যে গবেষণাগুলো করি সেগুলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নয়। আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে, আমি যা করতে চাই আজকাল সেগুলো করার জন্যেও সময় পাই না। তাই আমি মানুষটিকে সোজাসুজি না বলে বিদায় করে দিয়েছি।"

এটি হচ্ছে তাঁর চিঠিটার ভাবানুবাদ—পড়লেই বোঝা যায় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর টাকা বা নামের জন্যে কোনো মোহ ছিল না। তাই যে গবেষণার ফলাফল পেটেন্ট করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করা সম্ভব ছিল তিনি সেই ফলাফল রয়েল সোসাইটির মিটিংয়ে সবার সামনে ঘোষণা করে দিয়ে এলেন। অন্য অনেক কিছুর সাথে সেখানে দুই টুকরো ধাতব পাতের মাঝখানে খানিকটা পারদ রেখে তার একটি নূতন ধরনের কোহেরারের নকশা ছিল। মার্কোনি উদ্যোগী মানুষ—তিনি জগদীশচন্দ্র বসুর নকশার অতি সামান্য গুরুত্বহীন একটা পরিবর্তন করে সেটা পেটেন্ট করে ফেললেন। জগদীশচন্দ্র বসু কোহেরার ছিল ইংরেজি ইউয়ের (U) মতো, মার্কোনির কোহেরারটা সোজা—ভেতরে বাকি সব একরকম। সেই কোহেরার বের করে তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রথম বেতার সংকেত পাঠিয়ে ইতিহাসে নিজের নামটি পাকা করে নিলেন।

4.3 নং ছবি : মার্কোনিকে এখন আর এককভাবে বেতারের আবিষ্কারক বলা হয় না

1901 থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা মার্কোনির যুগান্তকারী রেডিও বা বেতার তরঙ্গের পরীক্ষা আলোচনা করতে গিয়ে একবারও জগদীশচন্দ্র বসুর নামটি উচ্চারণ করেন নি! তখন সাদা চামড়ার মানুষেরা পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করে এরকম সময় বাদামি চামড়ার একজন বাঙালি বিজ্ঞানী রেডিও বা বেতার যোগাযোগের আবিষ্কারের সম্মানটুকু নিয়ে নেবেন সেটি কেমন করে হয়?

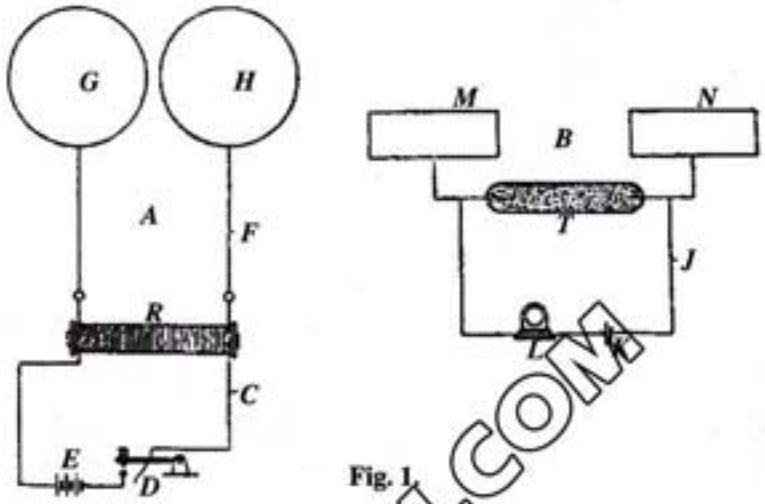

Fig. 1

4.4 নং ছবি : মার্কোনির কোহেরার ছিল সোজা, জগদীশচন্দ্রের কোহেরার ছিল 'ইউ'য়ের মতো এটুকুই শুধু পার্থক্য

AMARBOI.COM

তাই প্রায় একশ বছর সেটি নিয়ে কোনো আলোচনা হয় নি। শেষ পর্যন্ত 1998 সালে বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘেঁটে নূতন করে সত্য উদ্ঘাটন করা হলো। পৃথিবীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন (IEEE) আই ট্রিপল ইয়ের জার্নালে পুরো ইতিহাসটা খুঁটিনাটিসহ ছাপা হয়েছে। প্রথমবারের মতো স্বীকার করে নেয়া হয়েছে জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কৃত কোহেরার ব্যবহার করে মার্কোনি তার রেডিও যোগাযোগ করেছিলেন। তাই রেডিওর আবিষ্কারক এককভাবে মার্কোনি নন—রেডিওর আবিষ্কারক একাই সাথে আমাদের মুন্সীগঞ্জের বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু! বিষয়টি এখনো সব জায়গায় পৌঁছে নি, নূতন যুগ তথ্য বিনিময়ের যুগ, তাই শুধু সময়ের ব্যাপার যখন আমরা দেখব পৃথিবীর মানুষ রেডিও আবিষ্কারক হিসেবে মার্কোনির নাম উচ্চারণ করার আগে জগদীশচন্দ্র বসুর নাম উচ্চারণ করছে!

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু অনেক কিছুই করেছিলেন সবার আগে! সবাই কী জানে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সায়েন্স ফিকশান লিখেছিলেন তিনি? 1896 সালে তার লেখা প্রথম সায়েন্স ফিকশানটি প্রকাশিত হয়—শিরোনাম ছিল 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'!

মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবীর ইতিহাসে তার অবস্থানটি আবার খুঁজে বের করা সত্যিই বুঝি একটি নিরুদ্দেশের কাহিনী।

5. ন্যানোটেক

আমি যখন ক্যালিফোরনিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (সংক্ষেপে ক্যালটেক) কাজ করি তখন সেখানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রফেসর রিচার্ড ফাইনম্যান। পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু সে জন্যে তাকে আকর্ষণীয় বলছি না (কারণ তখন সেখানে কমপক্ষে আরো এক ডজন নোবেল পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানী ছিলেন!) তাকে আকর্ষণীয় বলছি তার আচার-আচরণের জন্যে। প্রাতিষ্ঠানিক বা গুরুত্ব বিষয়ে তার এলার্জির মতো ছিল—অথচ প্রচুর সময় কাটাতেন ছাত্রদের নিয়ে (ছাত্রদের অভিনীত নাটকে আমি তার মেথরের ভূমিকায় অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি।) হাসি-তামাশা করতেন, মজা করতেন এবং সারাক্ষণই নানা ধরনের পাগলামো করতেন। ক্যাফেটেরিয়ায় যোগ দেয়ার পরপরই পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রবেশ পথে একটা ছোট যন্ত্র সাজানো যন্ত্র চোখে পড়ল। নিচে লেখা রয়েছে যে প্রফেসর ফাইনম্যান বিশ্বাস করেন ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির এক ধরনের গুরুত্ব আছে তাই তিনি একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন—ক্ষুদ্র মোটর তৈরির প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী মোটরটা সেখানে রাখা আছে—সেটা এত ছোট যে খালি চোখে ভালো করে দেখা যায় না, সেটা দেখার জন্যে একটা মাইক্রোস্কোপ রাখা আছে। মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে সুইচ টিপে ধরলে দেখা যায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র মোটরটা পাঁই পাঁই করে ঘুরছে।

তারপর অনেক দিন পার হয়েছে, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির গুরুত্ব এতদিনে এতটুকু কমে নি বরং বেড়েছে। এখন যেসব ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে সেগুলো আসলে মাইক্রোস্কোপ দিয়েও দেখা যায় না। এই যন্ত্রপাতিগুলো তৈরি করার প্রযুক্তির নাম দেয়া হয়েছে ন্যানো টেকনোলজি, সংক্ষেপে ন্যানোটেক। মজার ব্যাপার হচ্ছে ন্যানোটেকের ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে দেখা যায় এটা নিয়ে প্রথম বক্তব্য রেখেছিলেন প্রফেসর রিচার্ড ফাইনম্যান—1959 সালে আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির এক সভায়, বক্তব্যের শিরোনামটি ছিল এরকম : তলানিতে প্রচুর জায়গা!

AMARBOI.COM

ন্যানো কথাটি আমরা আজকাল প্রায়ই শুনতে পাই, এবং শব্দটার যে আসলে অপব্যবহার হয় না তা নয়। তবে ন্যানো টেকনোলজি বোঝানোর সময় ন্যানো শব্দটা ঠিকভাবেই ব্যবহার হয়েছে। হাজার ভাগের এক ভাগ বোঝানোর জন্যে আমরা বলি মিলি (10^{-3})। যে রকম পিনের উপরের মাথাটার সাইজ এক মিলিমিটার। মিলিমিটারকে হাজার ভাগে ভাগ করলে হয় মাইক্রোমিটার (10^{-6}), আমাদের শরীরের লোহিত রক্তকণিকার আকার কয়েক মাইক্রোমিটার। মাইক্রোমিটারকে হাজার ভাগে ভাগ করলে হয় ন্যানোমিটার (10^{-9})। যখন কোনো কিছুর আকার ন্যানোমিটারের কাছাকাছি হয়ে যায় তখন সেটা সাধারণ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আর দেখা যায় না। তার কারণ সাধারণ মাইক্রোস্কোপ আলো দিয়ে কাজ করে আর দৃশ্যমান আলোয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ন্যানোমিটারের চার থেকে সাতশত গুণ বেশি বড়! যাদের আগ্রহ রয়েছে তাদের জন্যে বলা যায় ন্যানো থেকে হাজার গুণ ছোট হলে তাকে বলে পিকো (10^{-12}) এবং পিকো থেকে হাজার গুণ ছোট হলে তাকে বলে ফ্যামটো (10^{-15})। যদি কোনো যন্ত্র তৈরি করা হয় যার আকার 1 থেকে 100 ন্যানোমিটারের ভেতর তাহলে সেটাকে বলা হয় ন্যানো টেকনোলজি।

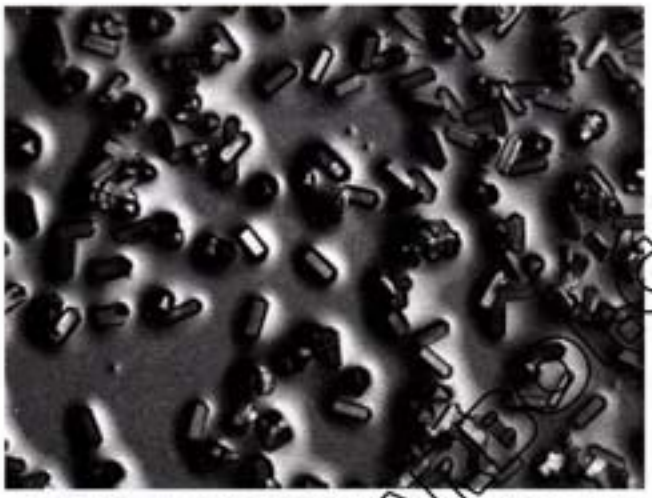

5.1 নং ছবি : ক্ষুদ্র মাইক্রোস্কোপ দিয়ে তোলা ভাইরাসের ক্রিস্টালের ছবি

বোঝাই যাচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি সহজ কোনো বিষয় নয় এবং বিজ্ঞানের কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখা দিয়ে ন্যানো টেকনোলজি গড়ে তোলা সম্ভব না! ন্যানো টেকনোলজি গড়ে উঠেছে একই সাথে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং অবশ্যই অনেকগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের সাহায্যে। যে জিনিস সাধারণ মাইক্রোস্কোপ দিয়েও চোখে দেখা যায় না বিজ্ঞানীরা সেটা কেমন করে তৈরি করেন সেটা নিঃসন্দেহে কৌতূহলের বিষয়। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি আধুনিক সিনথেটিক রসায়ন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে বিজ্ঞানীরা অণু-পরমাণু সাজিয়ে সাজিয়ে যে কোনো আকার গড়ে তুলতে পারেন। সেই 1999 সালেই কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটা নির্দিষ্ট লোহার পরমাণুর ওপর একটা নির্দিষ্ট কার্বন মনো অক্সাইডের অণু বসিয়ে তার ভেতর দিয়ে একটা বিদ্যুৎ ঝলক পাঠিয়ে সেটাকে পাকাপাকিভাবে সেখানে জুড়ে দিতে পেরেছিলেন। লরেন্স বার্কলে ল্যাবরেটরিতে কমপক্ষে তিনটা যন্ত্র রয়েছে যার আকার মাত্র কয়েক ন্যানোমিটার, কম্পিউটার ব্যবহার করে সেই যন্ত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়!

AMARBOI.COM

এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে তৈরি করা এই যন্ত্রগুলো শুধু যে ক্ষুদ্র তা নয়—অণু-পরমাণুর আকার হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের ধর্ম পরিচিত জগৎ থেকে অনেক ভিন্ন। যেমন আমরা কখনোই একটা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগি না যে হঠাৎ করে আমরা বুঝি দেওয়াল ফুঁড়ে অন্যদিকে চলে যাব! অণু-পরমাণুর জগতে সেটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা কারণ সেই জগৎটি আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে অনেক ভিন্ন, সেটা নিয়ন্ত্রণ হয় কোয়ান্টাম কেমানিক্স দিয়ে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুযায়ী একটা ইলেকট্রন প্রায় রুটিন মাফিক তার সামনে দাঁড়া করানো দেওয়ালের মতো বাধা ভেদ করে অন্য পাশে চলে যায়! তাই আমাদের পরিচিত জগতে যেটা খাঁটি বিদ্যুৎ নিরোধক ন্যানো টেকনোলজির জগতে সেটার ভিতর দিয়ে কম-বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে। আমাদের পরিচিত জগতে যেটা নিষ্ক্রিয় পদার্থ ন্যানো টেকনোলজির জগতে হঠাৎ করে সেটাই সক্রিয় হয়ে ওঠে, সোনা তার একটি উদাহরণ। পরিচিত জগতে সোনা একটা নিষ্ক্রিয় পদার্থ তাই সেটা কোনো কিছুর সাথে বিক্রিয়া করে না, হাজার বছরেও তার কোনো বিকৃতি হয় না। ন্যানো টেকনোলজির জগতে সোনা মোটেও নিষ্ক্রিয় নয়, সেটা অত্যন্ত সক্রিয় একটা অণু!

ন্যানো টেকনোলজির জগৎটা সবে মাত্র উন্মোচিত হতে শুরু করেছে কাজেই তার ভবিষ্যৎটা কী হবে সেটা কেউ খুব ভালো করে জানে না। অতীতে অনেক বার দেখা গেছে কোনো একটা প্রযুক্তিকে খুবই আশাব্যঞ্জক মনে হলেও শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তিগত সমস্যা এমন বাড়াবাড়ি পর্যায়ের থাকে যে সেটা শেষ পর্যন্ত আর সাফল্যের মুখ দেখে না। তার একটা উদাহরণ উচ্চ তাপমাত্রার সুপার কন্ডাক্টর, আশির দশকে সারা পৃথিবীতে এটা নিয়ে যে উচ্ছ্বাসের জন্ম দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেটা আর ধরে রাখা যায় নি। অনেক চেষ্টা করেও ব্যবহারযোগ্য উচ্চ তাপমাত্রার সুপার কন্ডাক্টর তৈরি করতে না পেরে পৃথিবীর প্রায় সব বিজ্ঞানী আর গবেষকই এটাকে পরিত্যাগ করেছেন। কাজেই ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে এখন পৃথিবীতে যে উচ্ছ্বাস রয়েছে সেটাকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা যাবে কী না সেটা নিয়ে অনেকের ভেতরেই খানিকটা দুর্ভাবনা আছে।

5.2 নং ছবি : ন্যানো টেকনোলজি দিয়ে তৈরি সম্ভাব্য গিয়ার

কোনো একটা প্রযুক্তির সাফল্য নির্ভর করে সেটা দিয়ে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী কিছু একটা তৈরি করার মাঝে। সে হিসেবে ন্যানো টেকনোলজি বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে, বেশ

কিছু জিনিস তৈরি হয়েছে যেটা মানুষ ব্যবহার করতে শুরু করেছে কিংবা ব্যবহার শুরু করতে পারবে এরকম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে যেসব জিনিস তৈরি হয়েছে তার মাঝে রয়েছে রৌদ্র প্রতিরোধক সান ক্রিন (যে ক্রিকেটাররা মুখে সাদা রং মেখে মোটামুটি ভয়ঙ্কর দর্শন হয়ে থাকেন সেই পাউডারটি!), নিজে থেকে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া কাচ, কোনোভাবেই কুঁচকে যায় না এরকম কাপড়, ভেতর থেকে কোনোভাবেই বাতাস বের হয়ে যাবে না এরকম টেনিস বল। এল. সি. ডি. মনিটর, কম্পিউটারের মাইক্রোপ্রসেসর কিংবা ক্যাপাসিটর।

উপরে যে জিনিসগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও ন্যানো টেকনোলজি দিয়ে আরেকটি অসাধারণ জিনিস তৈরি হয়েছে সেটাকে বলা হয় ন্যানো ফাইবার। এটি হচ্ছে কার্বনের পরমাণু দিয়ে তৈরি এক ধরনের টিউব, যেটার ব্যাস হয়তো মাত্র কয়েক ন্যানো মিটার কিন্তু দৈর্ঘ্য এক-দুই মিটার থেকে শুরু করে কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এই সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে যদি কোনো 'দড়ি' তৈরি করা যায় তাহলে সেটা ইস্পাত থেকে একশ গুণ শক্ত হবে কিন্তু ওজন হবে তার মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ্য।

বলাই বাহুল্য ওজন কম কিন্তু পরিচিত যে কোনো জিনিস থেকে শতগুণ শক্ত সেরকম অসাধারণ একটা তন্তু (Fiber) দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করা যায়, উদাহরণ দেওয়ার জন্যে টেনিস র‍্যাকেটের কথা বলা যায়, গাড়ির বডি কিংবা প্লেনের ফিউজলেজের কথাও বলা যায়। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ যে জিনিসটার কথা বলা যায় সেটা এখনো খানিকটা বিজ্ঞান এবং অনেকখানি কল্পবিজ্ঞান।

5.3 নং ছবি : কার্বনের ন্যানো ফাইবারের গঠন

মহাকাশ নিয়ে মানুষের কৌতূহল তাদের জন্মলগ্ন থেকে। মাত্র গত কয়েক দশকে মানুষ প্রথমবার পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে যুক্ত হয়ে মহাকাশে উড়ে বেড়িয়েছে। এখন পর্যন্ত যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে সেটি অনেক খরচসাপেক্ষ। হিসেব করে দেখানো যায় প্রতি কেজি ওজনের কোনো কিছুকে মহাকাশে পাঠাতে খরচ পড়ে প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার ডলার—যেটা প্রায় সোনার দামের কাছাকাছি, কাজেই মহাকাশে যাবার প্রযুক্তি মানুষের আয়ত্তের মাঝে এলেও সেটা এখনো সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কেমন করে সাধারণ মানুষ মহাকাশে যেতে পারে সেটা নিয়ে বিজ্ঞানী এবং কল্পবিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকে চিন্তা করে আসছেন এবং দুই দলই একমত হয়েছেন যে সেটা করা সম্ভব মহাকাশ লিফট দিয়ে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা

WARBOI.COM

করা খুবই সহজ—আমরা উঁচু দেয়ালে ওঠার জন্যে লিফট ব্যবহার করি, ঠিক সেরকম প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটার উঁচু একটা লিফট থাকবে এবং মহাকাশ পরিব্রাজকরা সেই লিফটে করে মহাকাশে উঠে যাবেন!

আমি জানি বেশিরভাগ পাঠকই ভুরু কুঁচকে বলছেন, "পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটার উঁচু একটা লিফট? পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ছয় গুণ?" স্বীকার করতেই হবে এই মুহূর্তে এটাকে বিজ্ঞান কল্পকাহিনী বলাই বেশি যুক্তিসঙ্গত—কিন্তু বিজ্ঞান কল্পকাহিনী বলাও সম্ভব হতো না যদি দেখা যেত পৃথিবীর কোনো প্রযুক্তি দিয়েই এরকম একটা লিফট তৈরি করা সম্ভব না! পৃথিবীর সাথে বেঁধে রাখা একটা মহাকাশ স্টেশন পৃথিবীর সাথে সাথে ঘুরছে—সেটা সম্ভব করার জন্যে যে শক্ত 'দড়ি' দরকার সেটা আগে ছিল না, ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে যে কার্বন ফাইবার বা কার্বন ন্যানো টিউব তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র সেগুলোও এই প্রচণ্ড শক্তিতে মহাকাশ স্টেশনকে ধরে রাখতে পারবে। ভবিষ্যতে কখনো এরকম মহাকাশ স্টেশন তৈরি করা এখন আর বিজ্ঞান কল্পকাহিনী নয়। যদি সত্যি সত্যি এই মহাকাশ লিফট তৈরি করা সম্ভব হয় তখন মহাকাশ অভিযানে যেতে খরচ হবে প্রতি কেজির জন্যে মাত্র দশ ডলার—সাধারণ মানুষও খুব সহজে সেই সুযোগ নিতে পারবে!

নূতন প্রযুক্তি সবসময়েই নূতন ভীতির জন্ম দেয়। কিছুদিন আগে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের কার্যক্রম শুরু করার সময় কিছু মানুষ সারা পৃথিবীতে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করে ফেলেছিল যে এই কলাইডারে যে শক্তির জন্ম দেবে সেই শক্তিতে তৈরি হবে ব্ল্যাক হোল এবং সেই ব্ল্যাক হোল সমস্ত পৃথিবীকে গিলে খেয়ে ফেলবে! এই আতঙ্ক এমন এক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে ভারতবর্ষের একটা কিশোরী সেটা আর সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছিল।

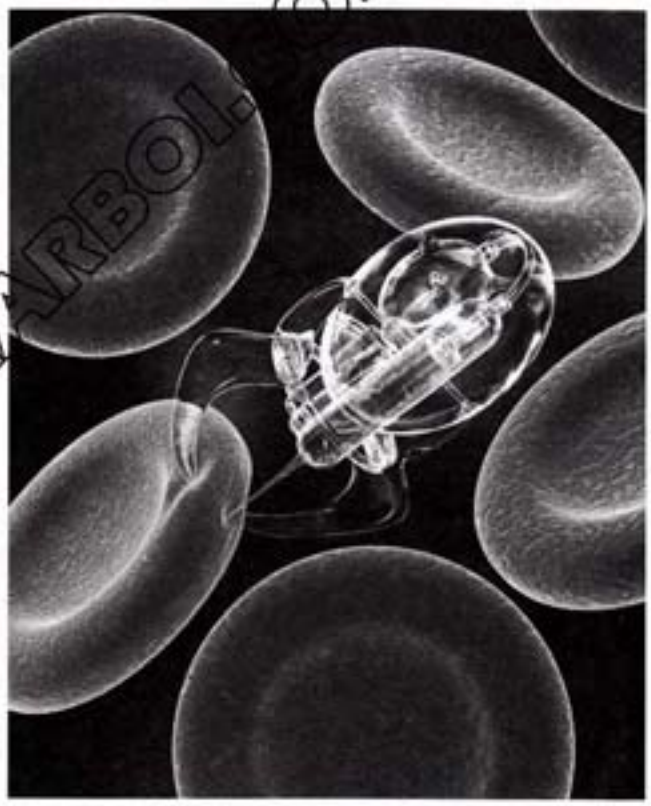

5.4 নং ছবি : ভবিষ্যতে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে তৈরি ক্ষুদ্র রবোট লোহিত কণিকাও মেরামত করতে পারবে বলে কল্পনা করা হয়

এ ধরনের আতঙ্ক ভিত্তিহীন—কারণ বিজ্ঞানীরা নূতন কোনো একটা প্রযুক্তি নিয়ে কাজ শুরু করার আগে সবসময়েই সেটা থেকে সম্ভাব্য বিপদগুলো কী হতে পারে সেটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন। তারা কখনোই এমন দায়িত্বহীন নন যে নিজের হাতে সারা পৃথিবীতে একটা মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি করে দেবেন।

কাজেই ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে কী বিপদ হতে পারে সেটা নিয়েও ভাবনা-চিন্তা চলছে। অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে আমাদের শরীরে, রক্তস্রোতে মিশে মস্তিষ্কে চলে গিয়ে শারীরিক বিপদ ডেকে আনা একটা অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য বিপদের আশঙ্কা। তবে যে বিপদটি চমকপ্রদ সেটা এরকম : ন্যানো টেকনোলজির এক পর্যায়ে তৈরি হবে ন্যানো রবোট, তারা নিজেরা নিজেদের তৈরি করে টেকনোলজির কাজে ব্যবহৃত হবে। হঠাৎ করে সেই ন্যানো রবোট যদি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে নিজেরা নিজেদের তৈরি করতে শুরু করে—পৃথিবীর যা কিছু আছে তার সবকিছু ধ্বংস করে তারা শুধু নিজেদের তৈরি করতে থাকে তাহলে দেখা যাবে এই পৃথিবীতে আর কোনো জীবিত প্রাণী নেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এটা বুঝি প্রাণহীন জগৎ কিন্তু আসলে এটা রাজত্ব করবে কোটি কোটি ন্যানো রবোট!

বিজ্ঞানীরা এরকম কল্পনা করেছেন—কিন্তু এটা শুধুই কল্পনা। কেউ যেন এটার কথা চিন্তা করে তাদের ঘুম নষ্ট না করেন, তার কারণ প্রযুক্তি নিয়ে অত্যাচারের দুর্ভাবনা করার আরো নানারকম কারণ রয়েছে!

AMARBOI.COM

6. নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে শক্তি ব্যবহারের ইতিহাস—এখানে শক্তি বলতে রাজনৈতিক শক্তি, সামাজিক শক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বলা হচ্ছে না, এখানে শক্তি বলতে বোঝানো হচ্ছে বিদ্যুৎ বা তাপ এ ধরনের শক্তি। পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যে জাতি যত উন্নত খোঁজ নিলে দেখা যাবে সেই জাতি তত বেশি শক্তি—আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করছে। বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়ার জন্যে জেনারেটর বসাতে হয়, জেনারেটর চালানোর জন্যে দরকার জ্বালানি। সেই জ্বালানির বেশিরভাগই হচ্ছে তেল আর গ্যাস। তেল

AMARBOI.COM

6.1 নং ছবি : নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের বিভিন্ন অংশ

কিংবা গ্যাস পোড়ালে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যায়, বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়ার অর্থ হচ্ছে "গ্রীন হাউস এফেক্ট", যার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে, মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া। আর যখন সত্যি সত্যি সেটা ঘটবে তখন সবার আগে বাংলাদেশের বিশাল অঞ্চল পানির নিচে ডুবে যাবে!

6.2 নং ছবি : ইউরেনিয়াম 235 নিউক্লিয়াস একটি নিউট্রনকে গ্রহণ করার পর ভেঙে গিয়ে শক্তির সাথে সাথে কয়েকটি নিউট্রনকেও মুক্ত করে

সেজন্য কেউ বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি করা বন্ধ করে দেবে না, যতদিন যাবে তত বেশি বৈদ্যুতিক শক্তি এই পৃথিবীতে তৈরি হতে থাকবে। তবে সবাই চেষ্টা করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড না বাড়িয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করতে, আর সেই তালিকায় সবার উপর হচ্ছে নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র। এই শক্তি কেন্দ্রে হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করা যায় কোনো কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ না করে।

এটুকু পড়ে একজনের ধারণা হতে পারে যে এখন সবারই উচিত অন্য কোনো শক্তি কেন্দ্র তৈরি না করে শুধুমাত্র নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র তৈরি করা। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটছে না, তার কারণ নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের পক্ষে যেরকম জোরালো যুক্তি আছে তার বিপক্ষেও ঠিক সেরকম জোরালো যুক্তি আছে। তার মাঝে সবচেয়ে কঠিন যুক্তিটি হচ্ছে নিউক্লিয়ার বর্জ্য দিয়ে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করার আশঙ্কা। নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র থেকে যে নিউক্লিয়ার বর্জ্য তৈরি হয় সেগুলো তেজস্ক্রিয় এবং এর তেজস্ক্রিয়তা কমে সহনীয় পর্যায়ে আসতে কমপক্ষে দশ হাজার বছরের প্রয়োজন। কাজেই নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র থেকে বের হয়ে আসা তেজস্ক্রিয় বর্জ্যকে কমপক্ষে দশ হাজার বৎসর কোনো একটা নিরাপদ জায়গায় বন্ধ করে রাখতে হবে। পৃথিবীর মানুষ এখনো কোনো কিছু তৈরি করে নি যেটা দশ হাজার বৎসর টিকে আছে—তাই আমরা জানি না যে ভয়ঙ্কর

AMARBOI.COM

তেজস্ক্রিয়গুলো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রাখা আছে সেগুলো কোনোভাবে বের হয়ে এসে আমাদের পরিচিত পৃথিবীটাকে একটা বিভীষিকাময় জগতে পাল্টে দেবে কী না। আমরা যেন আরাম-আয়েশে বেঁচে থাকতে পারি সেজন্যে কি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটা বিপদের মুখে ঠেলে দেবার অধিকার কী আমাদের আছে?

শুধু যে ভবিষ্যতের বিপদের ঝুঁকি তা নয়, এই মুহূর্তেও কিন্তু বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। অতি সাম্প্রতিককালে রাশিয়ার চেরনোবিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের থ্রি মাইল আইল্যান্ডে নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাশিয়ার চেরনোবিল শহরটিকেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হয়েছে, সেখান থেকে যে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য বের হয়েছে সেটা শুধু চেরনোবিল বা রাশিয়াতে নয় সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছে!

6.3 নং ছবি : নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে নিউক্লিয়ার বর্জ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ

তবে একথা সত্যি একটা প্রযুক্তিতে ঝুঁকি থাকে বলেই কিন্তু মানুষ কখনো সেই প্রযুক্তি ব্যবহার বন্ধ করে দেয় না। সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় গাড়ি এক্সিডেন্টে কিন্তু সে জন্যে আমরা কখনোই মানুষকে গাড়িতে ওঠা বন্ধ করতে দেখি না। একটা প্লেন দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ ভয়াবহ আতঙ্ক অনুভব করে। মাঝে মাঝেই প্লেন দুর্ঘটনা ঘটে, শত শত মানুষ মারা যায় কিন্তু তারপরেও সারা পৃথিবীর আকাশে প্রতি মুহূর্তে হাজার

হাজার প্লেন উড়ছে। ঠিক সেরকম নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে বিপদের ঝুঁকি আছে তারপরেও মানুষ নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র তৈরি করছে। নূতন নূতন প্রযুক্তি আবিষ্কার হচ্ছে আর মানুষ একটু একটু করে বিপদের ঝুঁকি কমিয়ে আনছে।

সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে প্রায় সাড়ে চারশত নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র আছে আর এই শক্তি কেন্দ্রগুলো পুরো পৃথিবীর শক্তির চাহিদার 15 শতাংশ পূরণ করে। কোনো কোনো দেশ নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রকে খুব আন্তরিকতার সাথে নিয়েছে। ফ্রান্স হচ্ছে সেরকম একটি উদাহরণ, তাদের দেশের বিদ্যুতের চাহিদার 77%-ই আসে নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র থেকে। আমাদের পাশের দেশ ভারত যদিও তাদের শক্তির চাহিদার মাত্র 2 শতাংশ নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র থেকে পায় কিন্তু তারপরেও সেটির একটি আলাদা গুরুত্ব আছে, কারণ তারা নিজেদের বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদদের দিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব এক ধরনের প্রযুক্তি গড়ে তুলেছে।

6.4 নং ছবি : রাশিয়ার চেরনোবিলে দুর্ঘটনার পর পুরো শহরটিকেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হয়

নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র কেমন করে কাজ করে সেটা নিয়ে অনেকের ভেতরেই এক ধরনের কৌতূহল আছে। আসলে এর মূল ব্যাপারটি সেই প্রাচীন স্টিম জেনারেটরের মতো। 6.1 নং ছবির মাঝামাঝি দেখানো হয়েছে একটা জেনারেটর যেটা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। জেনারেটর ঘোরানোর জন্যে রয়েছে টারবাইন, সেই টারবাইনটা ঘোরানো হয় উত্তপ্ত বাষ্প দিয়ে। উত্তপ্ত বাষ্প তৈরি করার জন্যে একটি বয়লার থাকে, সেই বয়লারের পানি ফোটানো হয় সরাসরি নিউক্লিয়ার রি-এক্টর থেকে আসা উত্তপ্ত পানি দিয়ে। নিউক্লিয়ার রি-এক্টরের ভেতর যে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হয় এই পানি সেই উত্তাপকে সরিয়ে আনে, যদি কোনো কারণে উত্তাপটুকু সরিয়ে আনা না হয় মুহূর্তের মাঝে নিউক্লিয়ার রি-এক্টরটা গলে যাবে।

কেউ যদি 6.1 নং ছবিটা একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তাহলে মোটামুটি অনুমান করে নেবে টারবাইন ঘোরানোর পর যে বাষ্পটুকু রয়ে যায় সেটাকে আবার পানিতে রূপান্তর করার জন্যে অনেকটুকু তাপ সরিয়ে নিতে হবে, সে জন্যে রয়েছে বিশাল কুলিং টাওয়ার। ছবি দেখে যে বিষয়টি নিয়ে একটু প্রশ্ন থেকে যাবে, সেটি হচ্ছে নিউক্লিয়ার রি-এক্টরের ভেতরে যে কন্ট্রোল

AMARBOI.COM

রডগুলো রয়েছে সেগুলো কী, আর সেটা কীভাবে নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের ভেতরে যে শক্তিটুকু তৈরি হয় সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সেটা বোঝার জন্যে আমাদের একটুখানি নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞান ঝালাই করে নিতে হবে। আমরা সবাই জানি সব কিছু তৈরি হয় পরমাণু দিয়ে আর পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। একটা পরমাণুর মোটামুটিভাবে পুরো ভরটুকুই থাকে নিউক্লিয়াসে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে পরমাণুর তুলনায় সেটা খুবই ছোট। (সেটা কত ছোট সেটা বোঝানোর জন্যে বলা যায় একটা মানুষকে যদি চাপ দিয়ে তার পরমাণুকে গুঁড়িয়ে নিউক্লিয়াসের মাঝে ঠেসে নিয়ে আসা যায় তাহলে সেই মানুষটিকে আর খালি চোখে দেখা যাবে না, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হবে!) কিছু কিছু মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসের একটা বিশেষত্ব আছে। এমনিতে সেটা মোটামুটি স্থিতিশীল কিন্তু যদি কোনোভাবে তার ভেতরে একটা নিউট্রন ঢুকিয়ে দেয়া যায় হঠাৎ করে সেটা অস্থিতিশীল হয়ে ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে পড়ে। (6.2 নং ছবি) শুরুতে নিউক্লিয়াসের যে ভর ছিল ভেঙে যাবার পর দেখা যায় সেই ভর কমে গেছে। যেটুকু ভর কমে গেছে সেই ভরটাই আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E = mc^2$ সূত্র অনুযায়ী শক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে।

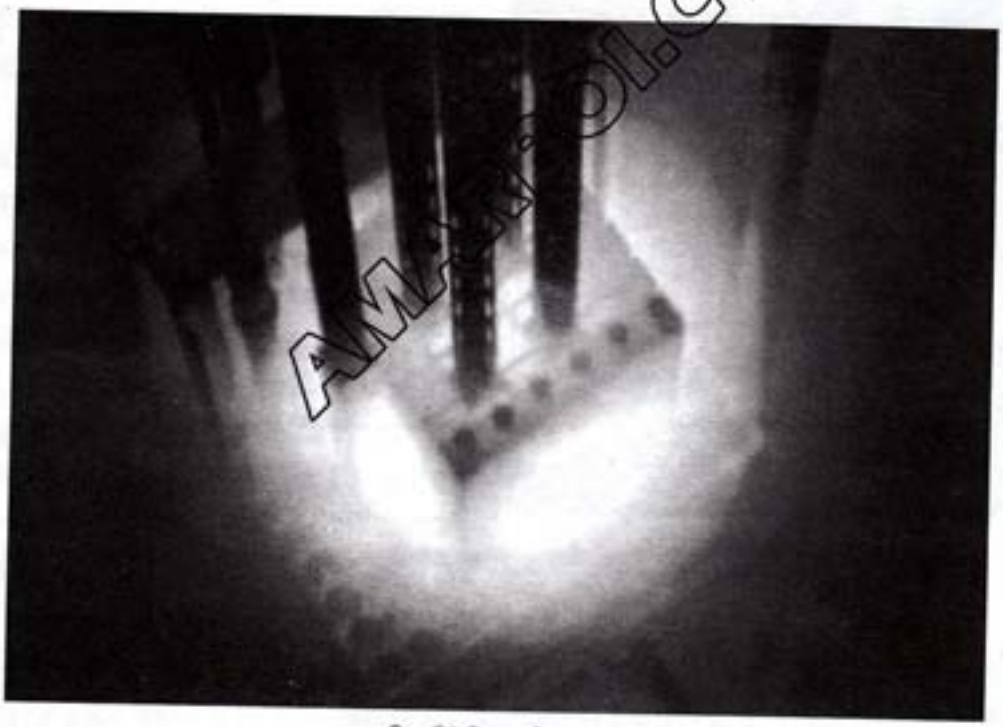

6.5 নং ছবি : নিউক্লিয়ার রি-এক্টরের ভেতরে

শুধুমাত্র এই ব্যাপারটা দিয়ে কিন্তু নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র বোঝা যাবে না, সেটা বোঝার জন্যে 6.2 নং ছবিটা আরেকটু ভালো করে দেখতে হবে। এই ছবিটাতে দেখানো হয়েছে নিউক্লিয়াসটা যখন ভেঙে যাচ্ছে তখন টুকরোগুলোর মাঝে কিছু নিউট্রনও আছে। যদি এই বাড়তি নিউট্রনগুলো অন্য নিউক্লিয়াসের ভেতর ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়া যায় তাহলে সেগুলোও ভেঙে নতুন শক্তি আর নতুন নিউট্রনের জন্ম দেবে, সেই নতুন নিউট্রন নতুন নিউক্লিয়াসে ঢুকে আরো নতুন নিউট্রনের জন্ম দেবে এবং এভাবে প্রক্রিয়াটা চলতেই থাকবে! সত্যি সত্যি যদি এই প্রক্রিয়াটা চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলে একে বলে চেইন রি-একশান। নিউক্লিয়ার রি-এক্টরের ভেতর এই চেইন রি-একশান চালু রাখতে হয়।

6.6 নং ছবি : নিউক্লিয়ার জ্বালানির ছোট প্যালেট

ব্যাপারটি যত সহজে বলা হলো আসলে সেটা করা এত সহজ নয়। প্রধান কারণ নিউক্লিয়ার শক্তি দিতে পারে এরকম নিউক্লিয়াসের সংখ্যা হাতেগোনা। সবচেয়ে পরিচিতটি হচ্ছে ইউরেনিয়াম 235। খনিতে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তার মাঝে বেশিরভাগ ইউরেনিয়াম 238, ইউরেনিয়াম 235 মাত্র 0.7 শতাংশ। নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে ব্যবহার করার জন্যে ইউরেনিয়াম 235-এর পরিমাণ বাড়িয়ে কমপক্ষে 2 থেকে 3 শতাংশ করতে হয় (নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর জন্যে সেটা হতে হয় 90 শতাংশ।)

AMARBOI.COM

কাজেই নিউক্লিয়ার রি-এক্টরের ভেতরে ইউরেনিয়াম 235 সমৃদ্ধ জ্বালানি রাখতে হয়। যখন চেইন রি-একশন শুরু হয় সেখান থেকে অচিন্তনীয় তাপ বের হতে শুরু করে। আমরা আগেই বলেছি চেইন রি-একশন চালু রাখার জন্যে নিউট্রনের সরবরাহ ঠিক রাখতে হবে। যদি কোনো কারণে নিউট্রন সরবরাহ কমে যায় তাহলে চেইন রি-একশান বন্ধ হয়ে যাবে। যারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন কন্ট্রোল রডগুলো কী! এগুলো আর কিছুই নয়, নিউট্রনকে শোষণ করতে পারে এরকম কোনো মৌল— ক্যাডমিয়াম হচ্ছে তার একটি উদাহরণ। কাজেই নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে শক্তি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা খুবই সহজ। ক্যাডমিয়ামের তৈরি কন্ট্রোল রডগুলো রি-এক্টরের যত ভেতরে ঢোকানো হবে, শক্তি তৈরি হবে তত কম। যত বাইরে আনা হবে শক্তি জন্ম হবে তত বেশি। ভুল করে কেউ যদি পুরোপুরি বাইরে নিয়ে আসে ঘটে যেতে পারে প্রচণ্ড বিপর্যয়—যেমনটি ঘটেছিল চেরনোবিলে!

7. কার্বন-ডাই-অক্সাইড : পৃথিবীর ভিলেন?

আমাদের বাতাসের শতকরা 99 ভাগ হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন (যথাক্রমে 78% ও 21%)। বাকি এক শতাংশের বেশিরভাগই হচ্ছে আর্গন নামের একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এরপর অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমাণ যে গ্যাসটির কথা বলা যায় সেটা হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। কিন্তু বাতাসে তার পরিমাণ এত কম (মাত্র 0.038%) যে সেটাকে ধর্তব্যের মাঝেই আনার কথা ছিল না। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসটি শুধু যে ধর্তব্যের মাঝে আনা হয়েছে তা নয় আমাদের বর্তমান পৃথিবীতে এই গ্যাসটি হচ্ছে সবচেয়ে আলোচিত একটি গ্যাস।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের নাম শুনেই বোঝা যায় যে এর মাঝে রয়েছে একটা কার্বনের এবং দুটো অক্সিজেনের পরমাণু। এটি বর্ণ এবং গন্ধহীন একটা গ্যাস। আমাদের নিশ্বাসের সাথে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের হয়ে আসে। বাতাসে যে ক্ষুদ্র পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড রয়েছে সেটা আমাদের জন্যে বিষাক্ত নয় কিন্তু পরিমাণে বেশি হলে সেটা রীতিমতো বিষাক্ত হতে পারে। এটা বাতাস থেকে ভারী তাই অব্যবহৃত কুয়া বা গর্তের নিচে এটা জমা হয়, না বুঝে অনেক মানুষ এরকম কুয়ায় নেমে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা পড়ে।

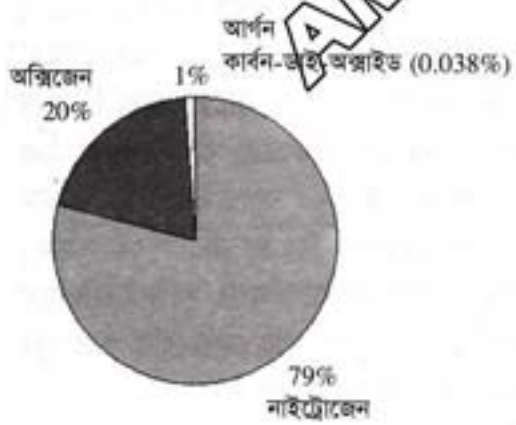

7.1 নং ছবি : বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ১ শতাংশ থেকেও অনেক কম

শুধু যে কুয়াতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায় তা নয়—কার্বন-ডাই-

AMARBOI.COM

অক্সাইডের কারণে একসাথে শতশত মানুষের মারা যাওয়ারও উদাহরণ আছে। আফ্রিকায় তিনটি হ্রদ রয়েছে যেগুলোর গঠন একটু বিচিত্র। হ্রদের নিচে রয়েছে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ এবং সেই জ্বালামুখ দিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের হয়ে নিচে জমা হতে থাকে। প্রাকৃতিক কোনো কারণে হঠাৎ হঠাৎ হ্রদের নিচ থেকে বিপুল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের হয়ে আসে। আগেই বলা হয়েছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাস থেকে ভারী—তাই পানি যেভাবে গড়িয়ে নিচু এলাকা প্লাবিত করে ফেলে, এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসও ঠিক সেভাবে কাছাকাছি নিচু জনপদকে "প্লাবিত" করে সব বাতাসকে সরিয়ে জায়গা দখল করে নেয়। এলাকার মানুষজন নিশ্বাস নিতে না পেরে দম বন্ধ হয়ে মারা যায়।

7.2 নং ছবি : আফ্রিকার একটি হ্রদ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ায় অনেক মানুষ ও প্রাণী প্রাণ হারিয়েছিল

এরকম ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ট্রাকে করে যাচ্ছিল, হঠাৎ করে দেখে ট্রাকের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রাকের ইঞ্জিন চলতেও অক্সিজেনের দরকার, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এসে বাতাসকে অপসারিত করে ফেলার কারণে সেখানে ইঞ্জিনটাকে চালু রাখার জন্যে কোনো অক্সিজেন নেই। কেন ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়েছে দেখার জন্যে ড্রাইভার নিচে নামতেই সে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে পড়ে গেল। ট্রাকের উপর যে দুজন বসে ছিল তারা ট্রাক থেকে নামে নি বলে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। বন্যার পানি যেরকম একটা উচ্চতায় এসে থেমে যায়, কার্বন-ডাই-অক্সাইড

গ্যাসও সেরকম একটা উচ্চতায় এসে থেমে গিয়েছিল। যারা সেই উচ্চতার ভেতর ছিল তারা সবাই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে, যারা উপরে ছিল তারা বেঁচে গেছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের "প্লাবন"-এর সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছিল আফ্রিকার হ্রদে, 1984 সালে এরকম একটা দুর্ঘটনায় এক হাজার থেকে বেশি মানুষ এবং অসংখ্য গবাদিপশু, পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ মারা গিয়েছিল।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে তুলনামূলকভাবে বেশ সহজেই (–80°C তাপমাত্রায়) কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইড করে ফেলা যায়, সেটাকে বলে ড্রাই আইস বা শুকনো বরফ। তার কারণ সাধারণত বরফ গলে প্রথমে তরলকে পাওয়া যায় কিন্তু ড্রাই আইস গলার পর সেটা তরল না হয়ে সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

7.3 নং ছবি : কলকারখানা থেকে বের হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস

আমাদের পৃথিবীর জন্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের একটা খুব বড় গুরুত্ব রয়েছে। পৃথিবীর সবুজ গাছ তাদের খাবার তৈরি করার জন্যে বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মাটি থেকে পানি আর সূর্যের আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। পদ্ধতিটির নাম সালোক-সংশ্লেষণ। এই সালোক-সংশ্লেষণ করে শুধু যে গাছ তার খাবার তৈরি করে তা নয়, সেটি "বর্জ্য" হিসেবে আমাদের জন্যে মহামূল্যবান অক্সিজেন গ্যাস ফিরিয়ে দেয়। পৃথিবীর বনাঞ্চল বা গাছ সেজন্যে আমাদের কাছে এত প্রয়োজনীয়।

গোড়াতে বলা হয়েছে যে বাতাসে খুব অল্প পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড রয়েছে—মজার ব্যাপার হলো এই পরিমাণটুকু কিন্তু স্থির নয়—এটি বাড়ে এবং কমে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড পানিতে অল্প পরিমাণ দ্রবীভূত হয়। বাতাসে এখন যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড আছে তার পঞ্চাশ গুণ পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত হয়ে আছে। পানিতে কী পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত হতে পারবে সেটা নির্ভর করে পানির তাপমাত্রার উপর। বেশি তাপমাত্রায় কম পরিমাণ দ্রবীভূত হয়— আমরা সেটা কোমল পানীয়ের বেলায় দেখেছি।

ARBOI.COM

কোমল পানীয়ের মাঝে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত করে রাখা হয়—সেটা যদি শীতল হয় তাহলে সেখানে বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে। তাপমাত্রা যদি বেড়ে যায় তাহলে কোমল পানীয় থেকে বুদ্বুদ হয়ে সেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের হয়ে আসে। আমরা যদি পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকাই তাহলে দেখব তুলনামূলকভাবে উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশি, কাজেই গাছের পরিমাণও বেশি। এই গাছগুলো বসন্তের শুরুতে বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে তার পরিমাণ খানিকটা কমিয়ে ফেলতে শুরু করে। শুধু তাই নয় পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ বেশি, উত্তর গোলার্ধে যখন বসন্তের শুরু দক্ষিণ গোলার্ধে তখন হেমন্তের শুরু, পানি তুলনামূলক একটু বেশি শীতল কাজেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড একটু বেশি দ্রবীভূত হয়ে থাকতে পারে। হেমন্তের শুরুতে গাছগুলো স্থবির, পাতাশূন্য হয়ে যায়—তখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নেয়া বন্ধ করে দেয় বলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। দক্ষিণ গোলার্ধের বিশাল সমুদ্রাঞ্চলে তখন বসন্তের শুরু হয়েছে, তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে তাই কার্বন-ডাই-অক্সাইডও দ্রবীভূত হচ্ছে কম।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড হচ্ছে গ্রীন হাউস গ্যাস। গ্রীন হাউসে যেরকম তাপ ধরে রাখার ব্যবস্থা থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসও সেরকম তাপ ধরে রাখতে পারে। আমাদের পৃথিবীর যে বায়ুমণ্ডল সেটা ভেদ করে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছায়। এই আলো পৃথিবীর বাতাসকে উত্তপ্ত করতে পারে না—এটা উত্তপ্ত করে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশকে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ আবার সেই উত্তাপের খানিকটা অংশ বিকীরণ করে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করে। অন্যভাবে বলা যায় পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ দৃশ্যমান আলো শোষণ করে ছেড়ে বিকীরণ করে ইনফ্রায়েড আলো। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস দৃশ্যমান আলোকে শোষণ করতে পারে না কিন্তু ইনফ্রায়েড আলোকে শোষণ করে ফেলে। তাই পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের বিকীরণ করে ছেড়ে দেয়া তাপশক্তি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে বাইরে চলে যেতে পারে না। এটা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাঝে আটকা পড়ে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে রাখে। এই পদ্ধতিটির জন্যে দিন এবং রাতে পৃথিবীর তাপমাত্রার মাঝে এক ধরনের সমতা আসে। তা না হলে দিনের বেলা পৃথিবীতে দুঃসহ গরম এবং রাতের বেলা কনকনে শীত নেমে আসত।

প্রকৃতি পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য করার জন্যে এরকম নানা ধরনের প্রক্রিয়া করে রেখেছে এবং লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সেটা এই পৃথিবীতে চলে আসছে। কিন্তু আমাদের খুব দুর্ভাগ্য পৃথিবীর অবিবেচক মানুষ বিংশ শতাব্দীতে হঠাৎ করে অনেক যত্ন করে গড়ে তোলা পৃথিবীর এই সমতাটুকু নষ্ট করে ফেলেছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস যেহেতু গ্রীন হাউস গ্যাস তাই বাতাসে এর পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার অর্থ বাতাসের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া। বাতাসের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার অর্থ পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া। পৃথিবীর উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুতে রয়েছে বিপুল পরিমাণ বরফের আস্তরণ। পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি একটুখানিও

AMARBOI.COM

বেড়ে যায়, আর মেরু অঞ্চলের বরফ যদি একটুখানিও গলে যায় তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে তখন পানির নিচে তলিয়ে যাবে পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল। যে হারে পৃথিবীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেড়ে যাচ্ছে তাতে আশঙ্কা করা হয় বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জায়গা হয় পানির নিচে তলিয়ে যাবে না হয় লোনা পানির প্রভাবে কৃষিকাজের অযোগ্য হয়ে যাবে।

7.4 নং ছবি : কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমাদের প্রয়োজন বনাঞ্চল

AMARBOI.COM

কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টিকে বলা হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বাংলায় বৈশ্বিক উষ্ণতা। বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই এই বিষয়টা নিয়ে চেঁচামেচি করে আসছিলেন। প্রাকৃতিক উপায়ে বাতাসে অনেক কার্বন-ডাই-অক্সাইড আসে, সেটাকে ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। ধারণা করা হয় পৃথিবীর বাতাসের শতকরা 40 অংশই আসে পৃথিবীর নানা আগ্নেয়গিরি থেকে। প্রকৃতি যেভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি করে ঠিক সেরকম সেটাকে শোষণ করারও ব্যবস্থা করে রেখেছে। সমুদ্র তার পানিতে বিশাল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত করে রাখে। কিন্তু পৃথিবীর অবিবেচক মানুষেরা কলকারখানা চালিয়ে, গাড়ি, জাহাজ, বিমান চালিয়ে প্রতিমুহূর্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের কাছে এখন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে যে পৃথিবীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ

ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন এই পৃথিবী বৈশ্বিক উষ্ণতার কবলে পড়তে যাচ্ছে। প্রথম দিকে ব্যবসায়ীরা, কারখানা ফ্যাক্টরির মালিকেরা এটা মানতে চায় নি—কিন্তু জাতিসংঘ থেকে শেষ পর্যন্ত একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত পুরো পৃথিবী এটা মেনে নিয়েছে। সবাই স্বীকার করছে এই মুহূর্তে সতর্ক না হলে সামনে মহাবিপদ!

পৃথিবীর মানুষ অবিবেচক হয়ে প্রকৃতি এবং পরিবেশকে ধ্বংস করেছে—আবার সেই পৃথিবীর মানুষই প্রকৃতি এবং পরিবেশকে উদ্ধার করার কাজে লেগে গিয়েছে। সারা পৃথিবীজুড়ে এখন "সবুজ আন্দোলন" শুরু হয়েছে, যার প্রধান একটা কাজ বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমানো। কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে সংক্ষেপে বলছে কার্বন, আর নূতন পৃথিবী এর পিছনে উঠেপড়ে লেগেছে!

কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছিল একটি নিরীহ প্রয়োজনীয় গ্যাস—কেমন করে জানি সে এখন হয়ে গেছে পৃথিবীর ভিলেন!

AMARBOI.COM

৪. একটি বিস্ময়কর বস্তু

যদি কখনো কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, কোনো জিনিস কঠিন, তরল কিংবা বায়বীয় কোনোটার ভেতরেই পড়ে না তাহলে সেই মানুষটির বড় ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাবার কথা। তার বিভ্রান্তি শতগুণে বেড়ে যাবে যদি আমরা তাকে বলি যে জিনিসটা আমাদের খুবই পরিচিত, আমরা প্রতিদিনই সেটা ব্যবহার করি। শুধু তাই নয়, জিনিসটা যে শুধু দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হয় তা নয় এটা দিয়ে যেরকম মহাকাশযানের জানালা তৈরি করা হয় ঠিক সেরকম ক্যান্সারের

AMARBOI.COM

৪.১ নং ছবি : কাচ দিয়ে তৈরি একটি অক্টোপাস

চিকিৎসা করা হয়। এটা দিয়ে মুহূর্তের মাঝে লক্ষ মাইল দূরে তথ্য পাঠানো হয় আবার আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রকে চোখের সামনে নিয়ে আসা যায়। এটা দিয়ে সবজি চাষ করা যায় আবার নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় বর্জ্যকে সামলে রাখা যায়। তালিকাটি আরো দীর্ঘ না করে অন্য কিছুও বলা যেতে পারে—এই অসাধারণ জিনিসটি যে শুধুমাত্র বর্তমান যুগের বড় বড় বিজ্ঞানীরা তাদের অতি আধুনিক ল্যাবরেটরি বা কলকারখানায় তৈরি করতে পারেন তা নয়, মানুষ হাজার হাজার বছর থেকে এটা তৈরি করে আসছে, যে কোনো প্রাচীন সভ্যতার মাঝেই এই জিনিসটির হদিস পাওয়া যায়।

কৌতূহলকে আরো না বাড়িয়ে আমরা জিনিসটার নাম বলে দিতে পারি, জিনিসটা হচ্ছে কাচ! মানুষ সেই প্রাচীনকাল থেকে কাচ তৈরি করতে জানে, কেমন করে কাচ তৈরি করা যায় তার সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতিটি খ্রিস্টের জন্মের 650 বছর আগে তৈরি করা হয়েছে। বালুকে প্রায় 2300 ডিগ্রি সেলসিয়াসে উত্তপ্ত করলেই সেটা কাচে পরিণত হয়। 2300 ডিগ্রি সেলসিয়াস আসলে অনেক তাপমাত্রা, খুব সহজে সেটা পাওয়ার কথা নয়। বালুর সাথে খানিকটা সোডা ($Na_2 CO_3$) মিশিয়ে নিলে সেটা 1500 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি তাপমাত্রাতেই কাচ তৈরি করা যেতে পারে। অনুমান করা হয় প্রাচীনকালে হয়তো কোনো মানুষ মরুভূমিতে বালুর ওপর আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটিয়েছে, হয়তো সেই বালুতে সোডা মেশানো ছিল, ভোরবেলা আগুন নেভাতে গিয়ে সেখানে স্বচ্ছ কাচ আবিষ্কার করে চমৎকৃত হয়েছে। কৌতূহলী হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তখন তারা কাচ তৈরি করা শিখে ফেলেছে!

AMARBOI.COM

8.2 নং ছবি : কাচের তৈরি অপটিক্যাল ফাইবার

শুরুতে বলা হয়েছে কাচ কঠিন, তরল বা বায়বীয় কোনোটাই নয়। ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক, আমাদের চারপাশের যে কাচ আমরা দেখি সেগুলোকে অবশ্যই আমরা কঠিন বস্তু হিসেবে দেখি। বিজ্ঞানীরা অন্য কথা বলেন, তারা বলেন কাচ (ইংরেজিতে glass) আসলে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর নাম নয়, কাচ হচ্ছে কোনো পদার্থের অণু-পরমাণুর একটি বিশেষ বিন্যাসের নাম। অণু-পরমাণু সঠিকভাবে বিন্যস্ত থাকলে আমরা সেটাকে কঠিন পদার্থ বলি, তরল পদার্থের অণু-পরমাণু পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যায়। অণু-পরমাণুর এই পুরোপুরি এলোমেলো বিন্যাসকে হঠাৎ করে যদি আটকে ফেলা যায় তখন সেটাকে বলে কাচ! কাজেই বাহ্যিক ব্যবহার দিয়ে বিবেচনা করলে কাচ অবশ্যই কঠিন পদার্থ কিন্তু যদি আমরা তার অণু-পরমাণুর বিন্যাসকে দেখি তাহলে আমরা দেখব সেটা মোটেও কোনো কঠিন পদার্থের বিন্যাস নয়—সেটা হুবহু একটা তরল পদার্থের বিন্যাস!

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানাভাবে কাচকে ব্যবহার করি। পানি খাবার জন্যে যেটা আমরা ব্যবহার করি সেটাকে আমরা কাচের ইংরেজি নাম গ্লাস বলেই ডাকি। আমাদের জানালায় কাচ। ঘরের দেওয়ালে যে ছবির ফ্রেম টানাই তার সামনে থাকে কাচ। আলমিরার দরজায় থাকে কাচ। চুল আঁচড়াই যে আয়নার সামনে সেটা কাচ, টেবিলের উপরে অনেক সময় থাকে কাচ, পেপার ওয়েটে থাকে কাচ। ওষুধের শিশি তৈরি হয় কাচ দিয়ে, টেলিভিশনের স্ক্রিনটা হচ্ছে কাচ, চোখে যে চশমা লাগাই তার লেন্সটাও তৈরি হয়েছে কাচ দিয়ে। দৈনন্দিন ব্যবহারে আমরা কোথায় কোথায় কাচ ব্যবহার করি এটা তার খুব ছোট একটা তালিকা, কেউ যদি আরেকটু সময় নিয়ে তালিকাটা তৈরি করে সেটা আরো অনেকগুণ লম্বা করা সম্ভব।

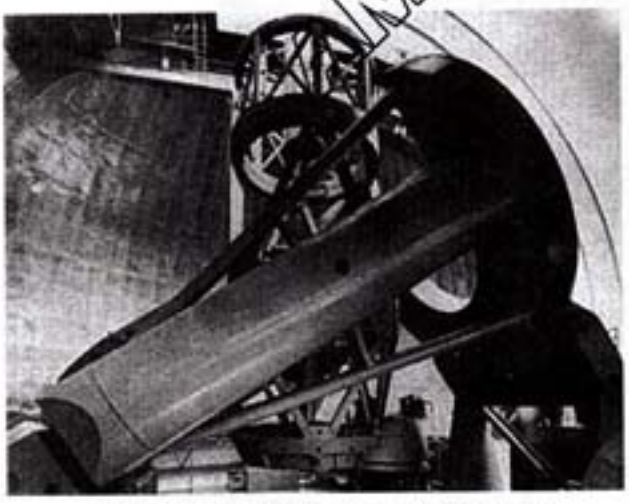

৪.3 নং ছবি : দুইশত ইঞ্চি ব্যাসের লেন্স দিয়ে তৈরি মাউন্ট পালামোরের টেলিস্কোপ

পৃথিবী থেকে একসময় মহাকাশে যে উপগ্রহ পাঠানো হতো সেটাকে আবার ফিরিয়ে আনা হতো না। মহাকাশযানে করে যখন মানুষ মহাকাশে যেতে শুরু করেছে তখন মহাকাশযানগুলোকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা শুরু হয়েছে। মহাকাশযানকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের সাথে ঘর্ষণ। মহাকাশযানগুলো ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল বেগে বায়ুমণ্ডলে ঢুকে, সেই প্রচণ্ড গতিতে ঢোকার সময় যে

AMARBOI.COM

ভয়ঙ্কর উত্তাপ তৈরি হয় তাতে মহাকাশযানটি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কথা! আকাশে যখন উল্কাপাত হয় তখন ঠিক সেই ব্যাপারটাই ঘটে! স্পেস শাটলের মতো মহাকাশযানগুলো যখন বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে তখন বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণের ভেতর দিয়ে তার গতি কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। সেজন্যে স্পেস শাটলের যে অংশটির সাথে বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণ হয় সেটা তৈরি করতে হয় সত্যিকারের তাপ নিরোধক বস্তু দিয়ে। সেজন্যে যে বস্তুকে বেছে নেয়া হয়েছে সেটি আসলে এক ধরনের কাচ। এটা তৈরি করার সময় অসংখ্য বাতাসের বুদ্বুদ ভেতরে আটকে রাখা হয়—বলা যেতে পারে এই ধরনের কাচের ভেতরে 90 শতাংশ থেকে বেশি হচ্ছে বাতাসের বুদ্বুদ। পৃথিবীতে সবচেয়ে চমকপ্রদ তাপ অপরিবাহী বস্তু হচ্ছে বাতাস (সেজন্যে লেপের তুলোয় বাতাস আটকে রাখা হয়, শীতের দিনে শরীরের তাপ যেন বেরিয়ে যেতে না পারে!)। কাজেই স্পেস শাটলকে প্রচণ্ড তাপের হাত থেকে রক্ষা করে বাতাস ঠেসে রাখে এই চমকপ্রদ কাচ!

দেখা গেছে কিছু কিছু ক্যান্সারের কোষকে একটু উচ্চ তাপে (45 ডিগ্রি সেলসিয়াস) ধ্বংস করে ফেলা যায় যদিও এই তাপমাত্রায় সুস্থ কোষ টিকে থাকতে পারে। কাজেই শরীরের তাপমাত্রা দীর্ঘ সময় 45 ডিগ্রিতে রেখে দেওয়া ক্যান্সারের একটা চিকিৎসা হতে পারত, সমস্যা হচ্ছে মানুষের শরীর উচ্চ তাপমাত্রায় থাকতে চায় না—আমরা লক্ষ করেছি গরমের সময় আমরা দরদর করে ঘামতে থাকি—সেটা হচ্ছে শরীরকে ঠাণ্ডা রাখার শরীরের নিজস্ব প্রক্রিয়া। কাজেই বিজ্ঞানীরা পুরো শরীরকে উচ্চ তাপমাত্রায় না রেখে শুধুমাত্র যে অংশে ক্যান্সার সেল রয়েছে সেই অংশকে উচ্চ তাপমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা একটা বিশেষ ধরনের কাচ তৈরি করেছেন যার ভেতরে রয়েছে ম্যাগনেটিক ক্রিস্টাল। সেগুলো ডাক্তারেরা ক্যান্সার টিউমারে ইনজেকশান করে ঢুকিয়ে দেন, তারপর বাইরে থেকে একটা পরিবর্তনশীল চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করলে ম্যাগনেটিক ক্রিস্টালগুলো কাঁপতে থাকে, সেখান থেকে তাপ সৃষ্টি হয়। সেই তাপ তখন ক্যান্সারের কোষগুলো ধ্বংস করতে থাকে। এই বিশেষ কাচ লোহা এবং ফসফেটের যে মিশ্রণ দিয়ে তৈরি হয় সেটা শরীরের কোনো ক্ষতি করে না, তাই সেটা শরীরের ভেতর থাকা নিয়ে কাউকে মাথাও ঘামাতে হয় না।

সাম্প্রতিককালে কাচের সবচেয়ে আলোচিত ব্যবহার মনে হয় ফাইবার অপটিক ক্যাবল। আমরা আমাদের দেশের সাবমেরিন সংযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন দুশ্চিন্তার মাঝে ছিলাম, এখন আমরা আন্তর্জাতিক ব্যাকবোনের সাথে সংযুক্ত হয়েছি। দেশের মানুষ এখন এই ক্যাবলের ভেতর দিয়ে সারা পৃথিবীতে তথ্য পাঠাতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তি এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে একটি অপটিকেল ফাইবার দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার বইয়ের সকল তথ্য পাঠানো সম্ভব! এই অপটিকেল ফাইবার আসলে খুবই সরু কাচের তন্তু। চুল থেকেও সরু সেই তন্তুর ভেতর দিয়ে তথ্যকে আলো হিসেবে পাঠানো হয় আর সেই তথ্য প্রায় আলোর গতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে। (কাচের প্রতিসরাঙ্ক 1.5-এর কাছাকাছি,

AMARBOI.COM

কাজেই কাচের ভেতরে আলোর গতি 1.5 গুণ কমে যায়) বিজ্ঞানীরা প্রথমবার যখন প্রথম ঠিক করলেন কাচের ভেতর দিয়ে আলো পাঠিয়ে তথ্য পাঠাবেন তখন সেখানে আলো শোষিত হয়ে যেত। শোষণের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে মাত্র 3 মিটার যেতে না যেতেই অর্ধেক আলো শোষিত হয়ে যেত। বিজ্ঞানীরা কাচকে পরিশোধন করতে করতে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে এসেছেন যে এখন আলোর অর্ধেক পরিমাণ শোষিত হতে 12 কিলোমিটার যেতে হয়! বিজ্ঞানীরা যখন কোনো কিছুর উন্নতি করেন সেটা হয় 10 বা 20 শতাংশ উন্নতি, 100 শতাংশ বা দুই গুণ উন্নতি করা রীতিমতো কঠিন। ফাইবার অপটিক ক্যাবলের আলো শোষণের উন্নতিটুকু সে হিসেবে একেবারেই লাগামছাড়া, যে উন্নতিটুকু করা হয়েছে সেটা এক, দুই বা দশ গুণ নয়, চার হাজার গুণ। পৃথিবীর ইতিহাসে সেরকম উদাহরণ খুব বেশি নেই।

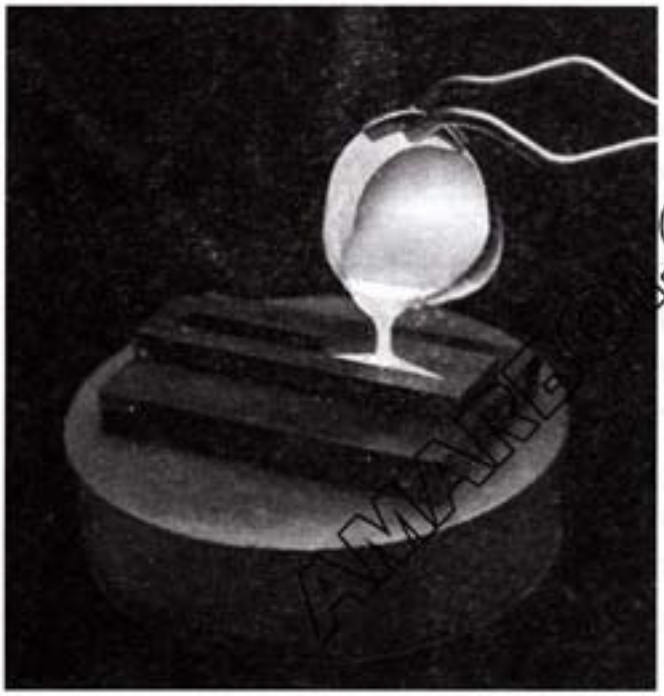

8.4 নং ছবি : অ্যারন ফসফেট দিয়ে তৈরি নূতন ধরনের কাচে নিউক্লিয়ার বর্জ্য রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে

আমাদের চোখের চশমার লেন্স হিসেবে যে রকম কাচ ব্যবহার করা হয় ঠিক সেরকম বড় বড় টেলিস্কোপের লেন্স তৈরি করার জন্যেও কাচ ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর যে কয়টি বড় টেলিস্কোপ রয়েছে তার মাঝে খুব বিখ্যাত টেলিস্কোপটি রয়েছে মাউন্ট পালামোরে। তার লেন্সের ব্যাস ছিল দুইশ ইঞ্চি, বিশাল সেই টেলিস্কোপটি রীতিমত একটি দর্শনীয় বস্তু! (আমার সেই টেলিস্কোপটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার ডিজাইন এত চমৎকার যে এক আঙুল দিয়ে এটাকে ঠেলে ঘোরানো সম্ভব!) এই টেলিস্কোপের লেন্সটি তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কর্নিং নামে একটি কোম্পানিকে। কাচ লাগিয়ে লেন্সটি ঢালাই করার পর সেটাকে ধীরে ধীরে শীতল হওয়ার জন্যে প্রায় দুই বছর সময় দেয়ার কথা। এক বছর পর একজন ইঞ্জিনিয়ার অধৈর্য হয়ে সেটা খুলে দেখার সময় লেন্সটা ফেটে যায়। কর্নিং ফ্যাক্টরিকে তখন দ্বিতীয়বার পুরো কাজটি করতে হয়েছিল। কর্নিং গ্লাসের মিউজিয়ামে সেই ফাটা লেন্সটি রাখা হয়েছে—তবে অধৈর্য সেই ইঞ্জিনিয়ারকে কী করা হয়েছে সেটি কোথাও লেখা নেই।

আমরা আজকাল গ্রীন হাউস এফেক্ট-এর কথা প্রায় সময়েই শুনে থাকি, ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়ায় আমাদের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়ে আসবে সেটা নিয়ে এখন সবার ভেতরে আতঙ্ক। "গ্রীন হাউস" শব্দটাতেই এক ধরনের ভীতি, কিন্তু মজার কথা হচ্ছে প্রকৃত গ্রীন হাউস কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ একটি ব্যাপার। শীতপ্রধান দেশে কাচের ঘর তৈরি করে তার ভেতর সাজি কিংবা ফুলের চাষ করা হয়। কাচের ঘর দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে, নিচে সেটা শোষিত হয়ে যখন আবার বিকীরণ করে তখন সেটা কাচ ভেদ করে যেতে পারে না, কাচের ঘরে আটকা পড়ে যায়। তাই বাইরে যখন প্রচণ্ড শীত, গ্রীন হাউসের ভেতর তখন থাকে আরামদায়ক উষ্ণতা!

যত দিন যাচ্ছে ততই নূতন নূতন কাচ তৈরি হচ্ছে। যে কাচটি নিয়ে এখন সবার ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা সেটা তৈরি হয় আয়রন ফসফেট দিয়ে। ধারণা করা হচ্ছে নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য মিশিয়ে যদি এই কাচ তৈরি করা হয় তাহলে এই বর্জ্যগুলো সেই কাচের ভেতর এমনভাবে আটকা পড়বে যে কখনোই সেখান থেকে বের হতে পারবে না। তখন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সংরক্ষণের পুরো ব্যাপারটি হবে অনেক সহজ—ব্যাপারটা দেখার জন্যে বিজ্ঞানী মহল বেশ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

কাচ নিয়ে এখনো গবেষণা হচ্ছে, আমরা নূতন কী দেখব এখনো জানি না—খাওয়া যায় এরকম কাচও তৈরি হয়েছে, পরা যায় এমন কাচ নিশ্চয়ই খুব দূরের ব্যাপার নয়!

AMARBOI.COM

9. বাঁশের ফুল

রাঙ্গামাটি বেড়াতে গিয়েছি, সেখানকার স্থানীয় মানুষদের সাথে কথা বলছিলাম—তাদের কাছ থেকে অত্যন্ত বিচিত্র একটা তথ্য জানতে পারলাম। তারা বলছেন, এই বছর বাঁশের ফুল এসেছে এবং সেটা একটা মহাদুর্যোগের সংকেত। আমরা ফুলকে সবসময়ই সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করি, তাই বাঁশের ফুল কেমন করে মহাদুর্যোগের সংকেত হতে পারে সেটা চট করে বুঝতে পারছিলাম না, তাই তারা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন।

9.1 নং ছবি : বাঁশের ফুল হবার পর ফলের জন্ম দিয়ে বাঁশ গাছ মরে যায়

বাঁশ পঞ্চাশ বছর পর একবার ফুল দেয়। সেই ফুল থেকে ফল হয় এবং ফল দেয়ার পর সেই বাঁশ মরে যায়। ব্যাপারটা ঘটে পঞ্চাশ বছর পর পর, শেষবার ঘটেছিল ১৯৫৪ সালে, তাই এই বছরটা আবার সেই সময়। পাহাড়ি অঞ্চলে যেখানে বাঁশ জন্মায় সেখানে সবাই দেখছে বাঁশে ফুল আসতে শুরু করেছে, কিছুদিনেই সেখানে ফল হবে তারপর বাঁশগুলো মরে যাবে। বাঁশগুলো মরে গেলেই শেষ হয়ে যাবে না, মৃত্যুর আগে তারা শেষ যে ফলগুলো দিয়ে গেছে সেই ফলের বিচি থেকে জন্ম নেবে নূতন বাঁশ গাছ। আগামী পঞ্চাশ বছর সেই বাঁশ গাছ বেঁচে থাকবে—বাঁশঝাড়

AMARBOI.COM

থেকে জন্ম নেবে নূতন বাঁশ গাছ, তারপর আরও পঞ্চাশ বছর পর আবার ফুল হবে, সেই ফুল থেকে ফল হয়ে আবার সব বাঁশ মরে যাবে। শত শত বৎসর থেকে এটা ঘটে আসছে।

যারা পাহাড়ি মানুষ তারা নানাভাবে বাঁশের উপর নির্ভর করে থাকে, হঠাৎ করে সেই বাঁশ যদি উজাড় হয়ে যায় তাহলে তাদের ওপর দুর্যোগ নেমে আসতেই পারে। কিন্তু রাঙ্গামাটির স্থানীয় মানুষেরা যে মহাদুর্যোগের কথা বলছিলেন সেটা এই বাঁশের উজাড় হয়ে যাওয়া নয়, সেটা অন্য একটা মহাদুর্যোগ।

তারা বললেন, বাঁশের ফুল থেকে যে ফল হয় সেটা ইঁদুরের খুব প্রিয় একটা খাবার। তাই ইঁদুর খুব শখ করে এই ফলগুলো খায়। আর এই ফল খাওয়ার সাথে সাথে তাদের ভেতর একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটে—হঠাৎ করে তারা ব্যাপকভাবে বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। দেখতে দেখতে লক্ষ লক্ষ ইঁদুরের জন্ম হয়। সেই ইঁদুরের আকার-আকৃতিও অস্বাভাবিক, অনেক বড় এবং খানিকটা হিংস্র, তারা দল বেঁধে এদিক-সেদিক আক্রমণ করতে শুরু করে। রাতারাতি তারা একটা ফসলের ক্ষেত খেয়ে শেষ করে ফেলে। সংখ্যায় এই ইঁদুর এত বেশি যে তাদেরকে প্রতিরোধ করার কোনো উপায় নেই। স্থানীয় মানুষ খুব সঙ্গত কারণেই ইঁদুরের এই ভয়াবহ আক্রমণের নাম দিয়েছে ইঁদুরের বন্যা। সেই ইঁদুরের বন্যায় ফসল নিঃশেষ হয়ে যায়—তখন আসে দুর্ভিক্ষ। মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়। এই ভয়াবহ দুর্যোগ কমপক্ষে তিন-চার বছর থাকে, তারপর খুব ধীরে ধীরে সবকিছু আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

9.2 নং ছবি : বাঁশের ফুল আর ফল ইঁদুরের খুব প্রিয় খাবার

বাঁশের ফলে কী এমন বিষ থাকে যার কারণে হঠাৎ করে তাদের এমন বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে সেটা তারা আমাদের বলতে পারলেন না কিন্তু তারা দিব্যি দিয়ে বললেন কথাটি সত্যি। শুধু যে ইঁদুরের বংশ বৃদ্ধি হয় তা নয়, পাহাড়ের বন মোরগ যখন বাঁশের ফলের বিচিগুলো খায় তাদেরও বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। যখনই বাঁশের ফল হয়, তখনই পাহাড়ে বন মোরগের সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যায় ইঁদুরের মতোই!

আমি রাঙ্গামাটি থেকে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। স্থানীয় মানুষ যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো তারা পরিবারের বয়োবৃদ্ধদের কাছে শুনেছেন, কিছু কিছু ব্যাপার হয়তো নিজেও দেখেছেন, তার কিছু সত্যি, কিছু হয়তো অতিরঞ্জন, কিছু হয়তো আসলে সত্যি নয়। ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান করে আমি যেটুকু জানতে পেরেছি তার বড় অংশই অত্যন্ত বিচিত্র।

প্রথমত সব বাঁশই যে পঞ্চাশ বছর পর ফুল দিয়ে মারা যায় সেটা সত্যি নয়, কিছু কিছু বাঁশ আছে যারা হয়তো প্রতি বছরই ফুল দেয়। তবে এটা সত্যি প্রায় পঞ্চাশ বছরের যে কথাটি আছে বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি কিংবা ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম এই এলাকার বাঁশের জন্যে সেটা সত্যি। যারা খবরের কাগজ পড়েন তারা সবাই মিজোরাম এলাকার সশস্ত্র

AMARBOI.COM

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কথা জানেন। ভারতবর্ষে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর থেকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যুদ্ধ করে আসছে এবং ভারতবর্ষের জন্যে সেটা অনেক বড় একটা সমস্যা। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে সেটা শুরু হয়েছে বাঁশের ফুলের কারণে।

মিজোরাম এলাকার মানুষের দীর্ঘদিন থেকে বাঁশের সাথে বসবাস। তারা অনেকদিন থেকে এই বাঁশের ফুলের কথা এবং তার সাথে সাথে শুরু হওয়া মহাদুর্যোগের কথা জানে, 1908 সালে তারা দুর্ভিক্ষের মাঝে পড়েছিল এবং 1958 আসার আগেই তারা জানে আবার তারা এই বিপদের মাঝে পড়বে। আগে পরাধীন দেশে ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকে কিছু পায় নি কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে তারা ভেবেছিল সরকার নিশ্চয়ই তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। আগে থেকেই তারা সরকারকে জানিয়ে রেখেছিল যে সামনে দুর্যোগের সময় আসছে, যখন সব বাঁশ মরে যাবে এবং হিংস্র ইঁদুরের আক্রমণে তারা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে—সন্তানের মুখে তুলে দেবার জন্য একটা শস্য কণাও থাকবে না! ভারতবর্ষের সরকার মিজোরাম অঞ্চলের অধিবাসীদের কথা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিল। সত্যি সত্যি যখন সেই মহাদুর্যোগ নেমে এলো তখন ভারতবর্ষ সরকারের সেটা সামলানোর ক্ষমতা থাকল না—অসংখ্য মানুষ মারা গেল দুর্ভিক্ষে। ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ মিজোরামবাসী তখন হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে এক দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করে দিল, যার জের এখনো ভারতবর্ষের সরকারের টানতে হচ্ছে।

AMARBOI.COM

9.3 নং ছবি : মিজোরামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাঁশের ফুল ও ইঁদুরের বন্যা থেকে

যে বিষয়টি বিচিত্র সেটি হচ্ছে বাঁশের ফুল হওয়ার সময়ে ইঁদুরের বংশ বৃদ্ধির ব্যাপারটি। এটি সত্যি কিন্তু ঠিক কেমন করে হয় সেটা খুব স্পষ্ট নয়, এর নানা রকম ব্যাখা আছে। বাঁশ ঘাস প্রজাতির গাছ, ধান বা গমের গাছও সে রকম। ধান এবং গমের গাছের বিচি আমরা ভাত এবং আটা হিসেবে খুব শখ করে খাই, কাজেই বাঁশ গাছের ফলও যে প্রাণীকুল শখ করে খাবে সেটি বিচিত্র কী? বাঁশের ফল এভোকাডোর মতো অত্যন্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ। তাই ইঁদুর যখন সেটা খায় তখন সে সত্যিকার অর্থে মোটা-তাজা হয়ে যায়। এমনিতে ইঁদুর হয়তো বছরে দুই-তিন বার বাচ্চা দেয়, কিন্তু মোটা-তাজা হওয়ার কারণে তাদের বাচ্চা জন্মানোর সংখ্যা বেড়ে যায়। দেখা গেছে বছরে তারা আট বার পর্যন্ত বাচ্চা দিতে শুরু করে। কাজেই দেখতে দেখতে ইঁদুরের সংখ্যা একেবারে ভয়াবহভাবে বাড়তে শুরু করে।

ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে যাবার আরও একটা কারণ থাকতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বাচ্চা জন্মানোর পর পুরুষ ইঁদুর নিজেরাই তাদের বাচ্চাদের খেতে শুরু করে—মা ইঁদুর চেষ্টা-চরিত্র করে তার যে কয়টি সন্তানকে বাঁচাতে পারে সেটাই ইঁদুরের বংশধারাকে কোনোমতে টিকিয়ে রাখে। যখন একসাথে হাজার হাজার বাঁশে ফুল ফুটে আর সেই ফুল থেকে ইঁদুরের জন্যে অত্যন্ত সুস্বাদু আর পুষ্টিকর ফল জন্মাতে শুরু করে তখন হঠাৎ করে ইঁদুরের খাবারের অভাব মিটে যায়, বাঁশের ফল খেয়ে পেট ভরা থাকে বলে নিজের সন্তানদের খেয়ে শেষ করার প্রয়োজন থাকে না। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় যখন অল্প কয়টি ইঁদুরের বাচ্চা টিকে থাকত এখন প্রায় সবগুলো টিকে থাকে, সেটা হয় প্রায় ডজন হিসেবে। সেগুলো বড় হয়ে দেখতে দেখতে বাচ্চা দেয়া শুরু করে আর হঠাৎ করে দেখা যায় শুধু ইঁদুর আর ইঁদুর।

9.4 নং ছবি : লক্ষ লক্ষ ইঁদুরকে মেরেও ইঁদুরের বন্যাকে থামানো যায় না

ইঁদুরের বন্যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে ইঁদুর নিধনের একটা চেষ্টা করা হয়। মাঝে মাঝে সরকার থেকে ঘোষণা দেয়া হয় ইঁদুর মেরে তার লেজ কেটে জমা দিলে প্রতি লেজের জন্যে

AMARBOI.COM

নগদ টাকা দেয়া হবে, সেই উৎসাহে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর মারাও হয় কিন্তু তার পরেও ইঁদুরের বন্যাকে সামাল দেয়া যায় না। প্রকৃতির নিজস্ব উপায়ে সেটা যখন কমে আসে মানুষ তখনই রক্ষা পায় তার আগে নয়।

অনেকেই মনে করেন বাঁশের ফুল থেকেই যখন সমস্যা এবং সবাই যখন বহু আগে থেকেই জানে কবে এই ফুল ফুটবে তখন আগে থেকে বাঁশগুলো কেটে ফেললেই হয়। তাহলে বাঁশগুলো ব্যবহার করা যাবে, সাথে সাথে ফুল, ফল এবং ইঁদুরের সমস্যাও থাকবে না। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এটা আসলে সমাধান নয় এবং সত্যি কথা বলতে কী এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা প্রস্তাব। বাঁশের ফুল হবার আগেই বাঁশ গাছকে কেটে ফেলা একটা হত্যাকাণ্ডের মতো, নিজের অজান্তেই আমরা তখন বাঁশের এই প্রজাতিকে নির্বংশ করে ফেলব। গর্ভবতী হলেই যদি কোনো প্রাণীকে মেরে ফেলা হয় তাহলে সেই প্রাণী কী টিকে থাকতে পারে? এটাও অনেকটা সে রকম।

ইঁদুরের বন্যায় ফসলের খুব ক্ষতি হয় বলে পাহাড়ি জনপদের মানুষকে বলা হয় এই সময়টাতে এমন ফসল লাগাতে ইঁদুর যেটা খুব অপছন্দ করে। সেরকম ফসল হচ্ছে হলুদ এবং আদা। দেখা গেছে হলুদ এবং আদার তীব্র গন্ধে ইঁদুর শত হস্ত দূরে থাকে—খেয়ে নষ্ট করার তো কোনো প্রশ্নই আসে না।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আমি কোথাও বাঁশের ফুল আর ফলের সাথে বন মোরগের বংশবৃদ্ধির সম্পর্কটা বের করতে পারি নি। আমাদের স্থানীয় মানুষেরা যেহেতু এটি বলেছেন নিশ্চিতভাবেই এর মাঝে সত্যতা আছে, আর সত্যতা যদি থাকে তার ব্যাখ্যাটিও খুঁজে বের করতে হবে। ইঁদুরের বংশবৃদ্ধির যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে বন মোরগের বেলায় সেটা কী খাটে? যদি না খাটে তাহলে কি অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে?

আমার দেশের কোনো বিজ্ঞানী এই ব্যাখ্যাটা খুঁজে বের করবেন আমি সেই আশায় দিন গুনছি।

AMARBOI.COM

10. বার্ড ফ্লু

মানুষের যে রকম ফ্লু হয়, পাখিদের সে রকম ফ্লু হয় আর সেই ফ্লুয়ের নাম বার্ড ফ্লু। মানুষের ফ্লু আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে নিই না, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যার এক-দুই বার ফ্লু হয় নি। দুই-চার দিন নাক দিয়ে পানি ঝরেছে, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হাঁচির সাথে গা ম্যাজ ম্যাজ করেছে, দুই-চারটা এসপিরিন খেয়ে নিজে থেকে ভালো হয়ে গেছে। মানুষের ফ্লু নিয়ে যদি আমরা ব্যস্ত না হই তাহলে পাখির ফ্লু নিয়ে আমরা এত ব্যস্ত কেন? হাঁস-মুরগি কবে থেকে মানুষ থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল?

AMARBOI.COM

10.1 নং ছবি : 1918 সালে পৃথিবীর এক শতাংশ মানুষ ফ্লুয়ের কারণে মারা গিয়েছিল

বিষয়টা বোঝার জন্যে আমাদের ব্যাপারটা আরেকটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে। ফ্লু হয় একধরনের ভাইরাসের কারণে। ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে কিছু হলে আমরা আমাদের শরীরকেই তার সাথে যুদ্ধ করতে দিই, শরীর যখন যুদ্ধ করে ভাইরাসকে পরাজিত করে তখন আমাদের খুব বড় একটা লাভ হয়, আমাদের শরীরে সেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্যে এক ধরনের এন্টিবডি তৈরি হয়ে যায়। সেই এন্টিবডির কারণে সেই ভাইরাস আমাদের শরীরে ভবিষ্যতে আর কখনো বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। একবার চিকেন পক্স হলে তাই আর দ্বিতীয়বার চিকেন পক্স হয় না। যদি দ্বিতীয়বার হয়েও যায় সেটা হয় খুব নিরীহ এক ধরনের চিকেন পক্স। ফ্লুটাও হয় ভাইরাস থেকে আর কোটি টাকা দামের প্রশ্ন হলো একবার ফ্লু হলেও তো আরো অনেকবার ফ্লু হতে পারে—তার কারণটা কী? ফ্লুয়ের জন্যে শরীরে কেন এন্টিবডি তৈরি হয় না? এর কারণটা খুব চমকপ্রদ। ফ্লুয়ের ভাইরাস খুব ধুরন্ধর প্রকৃতির ভাইরাস—তারা প্রতিনিয়ত তাদের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে, কাজেই আমাদের শরীর তার সাথে তাল মিলিয়ে থাকতে পারছে না। আমাদের শরীরকে খুব সতর্কভাবে এন্টিবডি তৈরি করতে হয়—যেটা শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় কোনো কারণে তার বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি করে ফেললে আমরা মহাবিপদে পড়ে যাই। শরীরকে শুধুমাত্র ক্ষতিকর জিনিসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি করতে হয় আর কোনটা ক্ষতিকর সেটা বোঝার জন্যে শরীরের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে। ভাইরাসের বাইরের প্রোটিনের আবরণ দিয়ে তারা সেটা চিনতে পারে। ফ্লুয়ের ভাইরাসের একটা চমকপ্রদ ক্ষমতা রয়েছে, তারা যখন একজন মানুষকে আক্রান্ত করে তখন সেখানে একটুখানি চেহারা পরিবর্তন করে ফেলতে পারে (সত্যি করে বলতে হলে বলা যায় বাইরের প্রোটিনের গঠনটুকু), তাই আমাদের শরীরের প্রতিষেধক নূতন ফ্লুয়ের ভাইরাস দেখতে পেলে একটু বিভ্রান্ত হয়ে যাই। প্রতিবার যে ভাইরাসটা আসে সেটাকে নূতন একটা ভাইরাস হিসেবে বিবেচনা করে—তাই মানুষ অসংখ্যবার ফ্লু দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে।

তবে বিষয়টাকে যত খারাপ ভাবা হচ্ছে সেটা আসলে তত খারাপ না। আমাদের শরীর ফ্লুয়ের বিরুদ্ধে আমাদের নিষ্কপট দিতে পারছে না। কথাটুকু সত্যি কিন্তু যেটুকু দিচ্ছে সেটাও কিন্তু কম নয়। আমরা ফ্লুকে ভয়ঙ্কর রোগ হিসেবে বিবেচনা করি না, কারণ এর কারণে খুব বেশি মানুষের মৃত্যু হয় না। কিন্তু যে মানুষের শরীরে কোনো ধরনের ফ্লুয়ের এন্টিবডি নেই তাদের জন্যে এটা ভয়ঙ্কর একটা রোগ। শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা যখন তাদের শরীরে করে এই ভাইরাস আদিবাসীদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, তখন আদিবাসীদের জনপদের পর জনপদ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

ফ্লুয়ের ভাইরাসে আট টুকরো RNA আছে, যদি মানুষের শরীর দুটি ভিন্ন RNA দিয়ে আক্রান্ত হয় তাহলে RNAগুলো নিজেদের ভেতরে তাদের অংশ বিশেষ দেয়া-নেয়া করতে পারে—তার কারণে নূতন যে ভাইরাসটা তৈরি হয় সেটা আগেরটা থেকে ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। সাধারণত নূতন ভাইরাসগুলো আগেরটা থেকে খুব বেশি ভিন্ন হয় না, তবে মাঝে মাঝে

AMARBOI.COM

তার ব্যতিক্রম ঘটে যেতে পারে। হঠাৎ করে এমন একটা ফ্লু ভাইরাসের জন্ম হতে পারে যেটা পুরোপুরি ভিন্ন, আমাদের শরীর যেটার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত নয়। যার ফলাফল হবে ভয়ঙ্কর—যে রকম হয়েছিল 1918 সালে। পৃথিবীর 98 শতাংশ মানুষ এই ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল, 28 শতাংশ মানুষের ফ্লু হয়েছিল এবং তাদের ভেতর 3 শতাংশ মানুষ মারা গিয়েছিল। মানুষের মৃত্যু হয়েছিল প্রায় 40 মিলিয়ন বা চার কোটি। 1918 সালের হিসেবে সেটা ছিল পুরো পৃথিবীর এক শতাংশ মানুষ। যে কোনো হিসেবে এই সংখ্যাটি অচিন্তনীয়।

AMARBOI.COM

10.2 নং ছবি : ফ্লুয়ের ভাইরাস

এতক্ষণ আমরা মানুষের ফ্লুয়ের কথা বলছিলাম, এবারে বার্ড ফ্লুয়ের মাঝে ফিরে আসতে পারি। এটি সত্যি কথা যে বার্ড ফ্লু হচ্ছে বার্ড বা পাখিদের অসুখ তাই এই অসুখটা এক পাখি থেকে অন্য পাখিদের মাঝে ঘুরে বেড়ানোর কথা। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি ফ্লুয়ের ভাইরাস হচ্ছে ধুরন্ধর প্রকৃতির ভাইরাস, এটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার সময় খানিকটা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এই পরিবর্তনটুকু নিয়েই ভয়। কে জানে একটু-আধটু পরিবর্তন হয়ে হঠাৎ করে না পাখিদের ফ্লু মানুষের ফ্লু হয়ে যায়! মানুষের শরীর মানুষের ফ্লুয়ের জন্যে প্রতিষেধক তৈরি করে রেখেছে কিন্তু পাখির ফ্লুয়ের জন্যে তো কোনো প্রতিষেধক নেই, তাই

হঠাৎ করে বার্ড ফ্লু যদি মানুষকে সংক্রমণ করতে পারে তাহলে মানুষ একেবারেই অসহায়। এই মুহূর্তে পৃথিবীর মানুষ যে বার্ড ফ্লু নিয়ে ব্যতিব্যস্ত সেটার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে H5N1, এটা মানুষের মাঝে সংক্রামিত হতে পারে। 1997 সালে এটা হংকংয়ে 18 জন মানুষকে আক্রান্ত করেছিল, তার মাঝে ছয়জনই মারা গিয়েছিল। মানুষের শরীর এই ভাইরাসের জন্যে প্রস্তুত নয়, তাই আমরা সাধারণ ফ্লুকে যেভাবে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিই এই H5N1 ভারাইসকে সেভাবে তুড়ি দিয়ে ওড়াতে পারব না। জানুয়ারি 2009 পর্যন্ত সময়টিতে সারা পৃথিবীতে 270 জন বার্ড ফ্লু দিকে আক্রান্ত হয়েছিল এবং মারা গেছে 164 জন, সংখ্যাটি হচ্ছে শতকরা ষাট জন। যে রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ষাট জন সেই রোগটি একটি ভয়ঙ্কর রোগ—মানুষকে সেই রোগকে ভয় পেতে হয়। পৃথিবীর মানুষ তাই বার্ড ফ্লুকে ভয় পায়।

10.3 নং ছবি : বার্ড ফ্লুয়ের ভাইরাস

তবে এখানে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে, সেটি হচ্ছে এই বার্ড ফ্লু রোগটি ছড়ায় কেমন করে? 1918 সালে যে ফ্লুটি পৃথিবীর 98 শতাংশ মানুষকে আক্রান্ত করেছিল সেটি ছড়িয়েছে একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষের মাধ্যমে। বার্ড ফ্লু ছড়ায় একটি পাখি থেকে একটা মানুষের মাঝে—তাই 1997 সালে বার্ড ফ্লুয়ের মহামারি বন্ধ করার জন্যে হংকংয়ে 12 লক্ষ মুরগিকে মেরে ফেলতে হয়েছিল। আমরা সব জায়গাতেই তাই দেখি বার্ড ফ্লু দেখা গেলে সেটা যেন ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্যে সব হাঁস-মুরগিকে মেরে ফেলা হয়। অত্যন্ত নিষ্ঠুর একটা প্রক্রিয়া কিন্তু আর কিছু করার নেই।

10.4 নং ছবি : বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ বন্ধ করার জন্যে হংকংয়ে ১২ লক্ষ মুরগিকে মেরে ফেলা হয়েছিল

সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা কিন্তু নিশ্বাস বন্ধ করে আছেন—এই বার্ড ফ্লুয়ের দুটি

AMARBOI.COM

খুব মারাত্মক বিশেষত্ব আছে—এক. এটি যখন মোরগ-মুরগিকে আক্রান্ত করে তখন খুব দ্রুত নূতন নূতন রূপে দেখা দেয়। এরকম একটি নূতন রূপ কখন আরো ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে কেউ জানে না। দুই. এটা যতই পরিবর্তন হচ্ছে মনে হচ্ছে ততই স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্যে আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। বার্ড ফ্লু পাখিদের জন্যে খুব ভয়ঙ্কর রোগ হলেও মানুষের জন্যে ভয়ঙ্কর নয়, কারণ এই রোগের সংক্রমণ হওয়া কঠিন। যেহেতু এটা হাঁস-মুরগি থেকে আসে তাই এর ঝুঁকি বেশি যারা পোলট্রি ফার্মে কাজ করে তাদের—সাধারণ মানুষের বলতে গেলে কোনো

10.5 নং ছবি : পরিযায়ী পাখি এক দেশ থেকে অন্য দেশে বার্ড ফ্লুর ভাইরাস নিয়ে যেতে পারে

ঝুঁকি নেই। যেহেতু এটা খাবারের ভেতর দিয়ে আসে না তাই বার্ড ফ্লু আক্রান্ত হাঁস-মুরগি খেয়ে কেউ এই রোগে আক্রান্ত হবে তারও সে রকম আশঙ্কা নেই। বিশেষজ্ঞরা তবুও অবশ্যি সবসময়েই বলেন হাঁস-মুরগি বা ডিম খুব ভালো করে রান্না করে খেতে। এখন পর্যন্ত দেখা গেছে যেসব মানুষেরা বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছেন তারা সবাই পোলট্রি ফার্মের কর্মী, সেটা একমাত্র ভরসার কথা। একটি হাঁস বা মুরগি থেকে একজন মানুষ আক্রান্ত হলে সেখান থেকে মানুষকে রক্ষা করার একটা উপায় আছে। একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষ যদি আক্রান্ত হয় তাহলে কিন্তু যে মহামারি শুরু হবে তার থেকে মানুষকে রক্ষা করা খুব সহজ নয়। 1918 সালে পৃথিবীর 98% মানুষ সংক্রমিত হয়েছিল, এখন যদি হয় তাহলে কত মানুষ সংক্রমিত হবে

কেউ কী অনুমান করতে পারে? আগে এক দেশ থেকে অন্য দেশে একজন মানুষের যেতে দীর্ঘ সময় লাগত কাজেই সেই মানুষের কাঁধে ভর করে বার্ড ফ্লুকেও এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে সময় লাগত বেশি। জেট বিমানের যুগে এখন কয়েক ঘণ্টায় এক দেশের মানুষ অন্য দেশে যায়, কাজেই এরকম একট ভাইরাস কয়েকদিনে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। যদি তার থেকে শতকরা ষাট জন মারা যায় তখন কী হবে?

আশার কথা সেটি এখনো ঘটে নি, বার্ড ফ্লু এখনো একজন মানুষ অন্য মানুষকে দিতে পারে নি। ভাইরাসটি হাঁস-মুরগির ভেতর দিয়ে রূপ পরিবর্তন করে সেরকম একটা ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সেই ধুরন্ধর ভাইরাসের সেই ভয়ঙ্কর এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করার চেষ্টা করছেন।

দেখা যাক কে জেতে।

AMARBOI.COM

11. অন্য রকম খাওয়া-দাওয়া

যাদের ঘেন্না একটু বেশি তাদের এই লেখাটা পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই—লিখতে গিয়ে আমারই একটু গা গুলিয়ে আসছিল, অন্যদেরও তাই হতে পারে।

এমন কী হতে পারে যে, সকালে সবাই নাস্তা করতে বসেছে। সবার সামনেই একটা খালি প্লেট, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ সবাই তাদের খালি প্লেটে হড়হড় করে বমি করে দিল, তারপর হাতে চামচ নিয়ে মহাউৎসাহে সবাই সেটা খেতে শুরু করে দিল? (আমার সতর্কবাণী না শুনে যারা একটু পড়ে ফেলেছেন এবারে নিশ্চয়ই তাদের পড়া বন্ধ করে ফেলার কথা) শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু এই ব্যাপারটা কিন্তু সবসময়ই ঘটছে। খুব বিচিত্র কোনো প্রাণী কালেভদ্রে এটা করছে তা নয়, এটাই হচ্ছে তাদের জীবনধারা। সেই প্রাণীটি আমাদের চারপাশে ঘুরঘুর করছে, হয়তো এই মুহূর্তেই সেটা কারো মুখের কাছে ভন ভন করছে। কারণ এই প্রাণীটি হচ্ছে মাছি। হ্যাঁ, আমাদের সুপরিচিত মাছি।

AMARBOI.COM

11.1 নং ছবি : মাছিকে নিয়মিতভাবে খেতে হয় নিজের বমি

এরকম অত্যন্ত কুৎসিত বদঅভ্যাসের জন্যে মাছির উপরে রাগ করে লাভ নেই। আসলে বেচারা মাছিদের যদি বলে দেয়া হয় তাদের এই বদঅভ্যাস ত্যাগ করে পৃথিবীর অন্য সব প্রাণীদের মতো ভদ্রভাবে খেতে হবে তাহলে তারা সবাই না খেয়ে মারা যাবে, কারণ তাদের আর অন্য কোনোভাবে খাওয়ার উপায় নেই। মাছিদের মানুষের মতো দাঁত নেই,

ব্যাঙের মতো কামড় দেয়ার মুখ নেই, মশার মতো রক্ত শুষে খাবার হুল নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তারা কঠিন কোনো খাবার খেতে পারে না। তাদের খেতে হয় তরল খাবার। মাছিরা যে খাবার খেতে পছন্দ করে সেটা তো তরল নয়। আমরা নিজের চোখেই দেখেছি একটা মরা ইঁদুরের উপর ভন ভন করছে, সেখান থেকে উড়ে আসছে জন্মদিনের কেকে, সেখান থেকে রাস্তার পাশে সাজিয়ে রাখা জিলাপির উপর—তারা কোথায় নেই? মাছি যেহেতু শক্ত খাবার খেতে পারে না তাই তারা যেটা খেতে চায় তার উপর হড়হড় করে বমি করে দেয়, পেটের ভেতর থেকে যে তরলটা বের হয়ে আসে সেটাতে শক্ত খাবার গলে একটা তরল স্যুপের মতো তৈরি হয়। মাছি তখন মহাউৎসাহে সেই তরল চেটেপুটে খায়। কাজেই আমরা যদি মাছিদের নিজের বমি চেটেপুটে খাওয়ার বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করতে বলি এই বেচারারা না খেতে পেরে মারা যাবে।

AMARBOI.COM

11.2 নং ছবি : অনেক মা পাখি তাদের পেট থেকে খাবার উগলে বের করে বাচ্চা পাখিদের খাওয়ায়

মাছির খাওয়ার অভ্যাসটি আমাদের জন্যে তত গুরুতর নয়, তার চাইতে অনেক বেশি গুরুতর তাদের আঠালো এবং রোমশ পা! মিষ্টির দোকানে গিয়ে কোন মিষ্টিটা খেতে ভালো

হবে বোঝার জন্যে আমরা সবকিছু পা দিয়ে টিপে টিপে দেখি না—মাছিরা দেখে। তাদের পায়ে সূক্ষ্ম যে লোম রয়েছে সেটা দিয়েই তারা বুঝতে পারে কোনটা তারা খেতে পারবে কোনটা খেতে পারবে না! আমরা নিজেরাই দেখেছি মাছি খাবার ব্যাপারে মোটেও খুঁতখুঁতে নয়—ঝোলা গুড় তারা যে রকম পছন্দ করে মরা ইঁদুর ঠিক সেরকম পছন্দ করে। তারা যেখানেই বসে সেখানেই তাদের পাটা ঘষে আসে আর সেই পায়ে তখন সেই জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ জীবাণু লেগে যায়। বিজ্ঞানীরা মাছি ধরে তার শরীরে লেগে থাকা জীবাণুগুলো গুনে দেখেছেন যে সাধারণ একটা মাছির গায়ে সাড়ে বারো লক্ষ জীবাণু থাকে! কাজেই আমরা যখন রাস্তার পাশে বসে ফুচকা খাই এবং ফুচকার উপর বসে থাকা মাছিটাকে হাত দিয়ে উড়িয়ে দেই তখন কী কখনো কল্পনা করেছি যে মাছিটি শুধু আমার ফুচকার উপর বমি করে দেয় নি—তার শরীরে ঝুলে থাকা সাড়ে বারো লক্ষ জীবাণুর কয়েক লক্ষ জীবাণু ঝেড়ে রেখে চলে গেছে?

নিজের বমি নিজে খেয়ে ফেলাটা খুব ঘেন্নার ব্যাপার কিন্তু তার চাইতেও সেটা অনেক বেশি ঘেন্নার যখন সেটা নিজে না খেয়ে অন্য কাউকে খাইয়ে দেয়া হয়। আমরা আমাদের পরিচিত কাউকে সেটা করতে দেখি না কিন্তু পাখি মহলে এটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। ঘুঘু, ফিঞ্চ বা বক রুটিন মাফিক তাদের বাচ্চাদের মুখে পেটের ভেতর থেকে খাবার উগলে দেয়। সিগাল পাখি আরেকটু খবিস ধরনের, তারা বাচ্চার মুখে না দিয়ে বাসার ভেতরে খাবার উগলে দেয়, চারিদিকে সেটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, পাখির বাচ্চারা মহাআনন্দে সেটা খুঁটে খুঁটে খায়।

আমরা যদি বিষয়টাকে একটু বৈজ্ঞানিকভাবে দেখি তাহলে এটাকে আর এত ঘেন্নার মনে হবে না, মোটামুটি একটা কার্যকর পদ্ধতি বলেই মনে হবে। ডিম ফুটে যখন পাখির বাচ্চার জন্ম হয় তখন তার থাকে প্রচণ্ড ক্ষুধা, মা পাখির তখন তার বাচ্চাদের খাওয়াতে খাওয়াতেই গলদঘর্ম হয়ে যেতে হয়। পাখির বাসায় বাচ্চার খাবার রাখার জন্যে তো আর ফ্রিজ বা কেবিনেট নেই, তাই তাদের জন্যে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে নিজের পেটের ভেতর রেখে দেয়া। পাখির বাচ্চা যখন খাবার জন্যে ব্যস্ত হবে তখন বাইরে উড়ে গিয়ে খুঁজে খুঁজে পোকামাকড়, কেঁচো ধরে আনা থেকে অনেক সহজ পেটের ভেতর জমা করে রাখা খানিকটা খাবার উগলে দেয়া।

পাখিরা যে প্রক্রিয়ায় তাদের বাচ্চাদের পেটের ভেতর থেকে খাবার বের করে খাওয়ায় তার একটা গাল ভরা বৈজ্ঞানিক নাম আছে, সেটা হচ্ছে রিগার্গিটেশান—উচ্চারণ করতেই দাঁত ভেঙে যাবার অবস্থা। সত্যি কথা বলতে পাখিরা যখন তাদের বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্যে রিগার্গিটেশান করে তখন খাবারটা পাকস্থলী থেকে আসে না। এটা আসে গলার কাছে খাবার জমা রাখার একটা ঝোলা থেকে, এই ঝোলার নাম হচ্ছে ক্রপ। যে খাবারটা এখানে থাকে সেটা হজম হয় না, তাই মা পাখি তার বাচ্চা পাখিদের বারবার সেটা খাওয়াতে পারে! সন্তানের জন্যে মা-বাবা অনেক কষ্ট করতে প্রস্তুত সেটা মানুষই হোক আর পাখিই হোক—একই ব্যাপার।

AMARBOI.COM

পাখির রিগার্গিটেশান আমরা দৈনন্দিন জীবনে খুব একটা দেখি না, তার কারণ পাখিরা থাকে বনে-জঙ্গলে, গাছের উপরে। আমাদের চারপাশে যেসব পোষা জন্তু থাকে তাদের মাঝে আমরা অবশ্যই আরেকটা জিনিস দেখেছি সেটা হচ্ছে জাবর কাটা। অলস মানুষকে ঢিলেঢালাভাবে বসে থাকতে দেখলে আমরা কৌতুক করে বলি, "মানুষটা জাবর কাটছে"! আসলে জাবর কাটা গরু ছাগল ভেড়া উট হরিণ এরকম তৃণভোজী প্রাণীদের দৈনন্দিন কাজ। একটা গরু দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে প্রায় নয় ঘণ্টাই জাবর কাটে।

কিন্তু জাবর কাটা ব্যাপারটা কী? ভদ্র মানুষের ভাষায় সেটা হচ্ছে নিজের বমি নিজে চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া আর বৈজ্ঞানিক ভাষায় সেটা হচ্ছে রুমিনেন্ট বা চর্বিতচর্বণ। গরু-ছাগলকে যারা ঘাস খেতে দেখেছে তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে তাদের ভেতর ধীরেসুস্থে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবার কোনো আগ্রহ নেই, দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে সবুজ ঘাস পেটে কোনোভাবে ঠেসে ঢোকাতে পারলেই যেন তারা খুশি। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ঘাস ছিঁড়ে তারা কিন্তু সরাসরি পেটে ঢোকায় না! তাদের পাকস্থলী আমাদের মতো নয়, সেটা চার ভাগে বিভক্ত! গরু মাঠেঘাটে ঘাস কামড়ে ছিঁড়ে তার পাকস্থলীর একেবারে প্রথম অংশ রাখে। সেই অংশটার নাম হচ্ছে রুমেন। এই রুমেনকে বলা যেতে পারে একটা ভয়ঙ্কর জায়গা কারণ সেটা গিজগিজ করছে নানারকম জীবাণু আর প্রোটোজোয়া দিয়ে। রুমেনের এক ফোঁটা রসের ভেতর রয়েছে দশ বিলিয়ন অণুজীব—পৃথিবীর পুরো মানব সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ! এই অণুজীবগুলো ঘাসের মতো একটা "অখাদ্য" জিনিসকে ভেঙেচুরে হজম করার একটা পর্যায়ে নিয়ে যায়। গরু-ছাগল যখন অবসর পায় তখন রুমেন থেকে ঘাস বের করে মুখে এনে চিবাতে থাকে। চিবিয়ে চিবিয়ে সেটাকে তুষ করে দিয়ে আবার সে তার পেটে পাঠিয়ে দেয়—এভাবে ধাপে ধাপে তার খাওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকে

11.3 নং ছবি: গরু-ছাগল তাদের পাকস্থলীর প্রথম অংশ রুমেনে রাখে সেটাকে বের এনে জাবর কাটে।

AMARBOI.COM

খাওয়ার এই নানা রকম পদ্ধতি যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে আমার মনে হয় সবচেয়ে বিচিত্র হচ্ছে তারা মাছের খাওয়ার স্টাইল। সত্যি কথা বলতে কী সমুদ্রের বেলাভূমিতে পড়ে থাকা নিরীহ তারা মাছ বা স্টার ফিশের খাওয়ার প্রক্রিয়াটাই যে শুধু বিচিত্র তা নয়, এই প্রাণীটাই বিচিত্র। কেউ যদি স্টার ফিশকে বর্ণনা করতে চায় তাহলে তার বর্ণনাটা হবে এরকম : এর কোনো মাথা নেই, মগজও নেই। সাধারণত পাঁচটা বাহু কিন্তু কোনো আঙ্গুল

নেই। বাহুর নিচে কোনো পা নেই—কিন্তু রয়েছে পায়ের পাতা। পায়ের পাতার সংখ্যা একটি দুটি নয়—হাজারখানেক। বাহুগুলোর ঠিক মাঝখানে রয়েছে দাঁতহীন একটা মুখ এবং সেই মুখ দিয়ে খাওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত বিচিত্র! যখন দরকার পড়ে তখন পুরো পাকস্থলীটাই সে বের করে ফেলে খাবার জন্যে! একজন মানুষ যদি খাবার টেবিলে বসে ওয়াক করে তার পুরো পাকস্থলীটাই উগলে বের করে নিয়ে আসত সরাসরি খাবারটা সেখানে রেখে আবার পাকস্থলীটা গিলে ফেলত তাহলে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার হতো কেউ কল্পনা করতে পারবে?

11.4 নং ছবি : সবচেয়ে বিচিত্রভাবে খাবার খায় যে স্টার ফিশ

স্টার ফিশ বা তারা মাছ কিন্তু এটাই নিয়মতিভাবে করে। ঝিনুক তার খুব প্রিয় খাবার। কখনো ঝিনুক পেলে সে তার বাহুগুলো দিয়ে সেটাকে জড়িয়ে ধরে। তার বাহুর নিচে যে হাজার খানেক পা আছে সেগুলো দিয়ে ঝিনুকের খোলসটাকে চুষে ধরে সে তখন ঝিনুকটাকে খোলার চেষ্টা করে। খুব বেশি নয় অল্প একটু খুলতে পারলেই সেই ফুটো দিয়ে সে তার পাকস্থলীটা ঝিনুকের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। স্টার ফিশের পাকস্থলীর জারক রস ঝিনুকের ভেতরকার নরম শরীরটাকে প্রায় হজম করে ফেলে—হজম হওয়া অংশটুকু পাকস্থলীতে ঢুকিয়ে পাকস্থলীটা আবার সুড়ুৎ করে স্টার ফিশ নিজের ভেতর নিয়ে নেয়। ভাগ্যিস আমাদের সেভাবে খেতে হবে না, তাহলে কী সমস্যাই না হতো!

অন্য প্রাণীদের খাওয়া নিয়ে আমরা কত রকম সমালোচনা করে ফেলছি, সেই প্রাণীগুলোও যদি আমাদের মতো সমালোচনা করতে পারত তাহলে তারা আমাদের খাওয়ার পদ্ধতি নিয়ে না জানি কী সমালোচনাই না করত! মা পাখি হয়তো তাদের বাচ্চাদের বলত—"তোমরা কী ভদ্র, আমরা তোমাদের খাইয়ে দিই তোমরা খাও! মানুষের বাচ্চা কী ভয়ঙ্কর—সরাসরি মায়ের শরীরে লেপটে থাকে, চুষে চুষে মায়ের দুধ খেয়ে ফেলে! কী ভয়ঙ্কর!"

ভাগ্যিস আমরা পাখির কথা শুনতে পাই না!

AMARBOI.COM

12. খাদ্য যখন রক্ত

আমি যখন বেল কমিউনিকেশন্সে কাজ করি তখন আমার একজন সহকর্মী ছিল ভিয়েতনামের যুদ্ধ ফেরৎ। একদিন গল্প করতে করতে বলল, "একবার ভিয়েতনামের জঙ্গলে হারিয়ে গেছি—দু'দিন থেকে খাওয়া নেই। তখন একটা গরুকে পেলাম। পেটে ভয়ংকর খিদে তাই গরুর গলার একটা রগ কেটে চুমুক দিয়ে খানিকটা রক্ত খেয়ে নিলাম।" আমি বললাম, "সর্বনাশ! কী বলছ তুমি?" সে বলল, "এত অবাক হবার কী আছে? রক্ত খুব ভালো খাবার, অনেক প্রোটিন।"

কথাটি সত্যি, রক্তে অনেক প্রোটিন। প্রোটিন ছাড়াও রক্তে ধাতব মৌল লোহা থাকে। এই লোহা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে লাল রঙ ধারণ করে বলে রক্তের রং লাল। কোনো কোনো প্রাণীর রক্তে লোহার বদলে থাকে তামা আর তামা যখন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তখন তার রং হয় নীল। গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া এবং কিছু কিছু মাকড়সার রক্ত এরকম, তার রং নীল। কীটপতঙ্গের রক্তে কোনো ধাতব মৌল থাকে না বলে তাদের রক্ত বর্ণহীন। তেলাপোকা থেঁতলে গেলে যে সাদা বস্তুটা বের হয়ে আসে সেটাই হচ্ছে তার সাদা রঙের রক্ত। তাই সব রক্তই যে লাল সেটা কিন্তু সত্যি নয়।

আমার ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরৎ সহকর্মীর রক্ত খাওয়ার গল্পটা বাড়াবাড়ি মনে হলেও সেটা কিন্তু পুরোপুরি অবিশ্বাস্য নয়। আফ্রিকার মাসাই সম্প্রদায় গরুর কোনো একটা ধমনি থেকে রক্ত ঝরিয়ে তার সাথে দুধ মিশিয়ে নিয়মিতভাবে খায়। খাবার হিসেবে সেটা চমৎকার!

মানুষ রক্ত খাচ্ছে চিন্তা করলেই আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে কিন্তু কিছু কিছু প্রাণীর মূল খাবারই হচ্ছে রক্ত। এর মাঝে রয়েছে উকুন, ছারপোকা, এঁটেল পোকা এবং জোঁক।

কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে অনেক মানুষই জোঁককে খুব ভয় পায়, জোঁকের কথা শুনলেই ভয়ে, আতঙ্কে এবং ঘৃণায় তাদের সারা শরীর রি-রি করে ওঠে। কিন্তু কেউ কী জানে একসময় জোঁক ছিল সর্বরোগের চিকিৎসা? জোঁক চিকিৎসার পদ্ধতি হিসেবে এতই জনপ্রিয় ছিল যে 1864 সালে শুধুমাত্র ফ্রান্সেই 2 থেকে 3 কোটি জোঁক ব্যবহার করা হয়েছিল! কেন

AMARBOI.COM

করবে না? জোঁকের ইংরেজি হচ্ছে Leech আর এটা হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় চিকিৎসকের একটা অত্যন্ত প্রাচীন প্রতিশব্দ, যার মানে এক সময় জোঁক ছিল চিকিৎসক।

পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ছয়শ ভিন্ন ধরনের জোঁক রয়েছে, জোঁক একেবারে ছোট কয়েক মিলিমিটার থেকে শুরু করে এক হাত পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। জোঁকের গঠন খুবই সহজ-সরল—একটা হচ্ছে মুখ যেদিক দিয়ে খাবার ঢোকে অন্যটা হচ্ছে বহির্গমন পথ! দুটিই আবার চুষনির মতো, শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারে। জোঁকের চোয়াল তিনটি। সেই তিন চোয়ালে থাকে তিন পাটি দাঁত। কোনো কিছু কামড়ে ধরে যখন সে দাঁত দিয়ে কাটে তখন কাটাটুকু হয় ইংরেজি Y-এর মতো। জোঁকের লালা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময় বস্তুর একটি, সেটা নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। যখন সে কোনো প্রাণীর চামড়া কামড়ে ধরে রক্ত খাবার জন্যে সেটা কেটে ফেলে সেই প্রাণী কিন্তু মোটেও ব্যথা পায় না। তার কারণ জোঁকের লালায় যে রাসায়নিক দ্রব্য আছে সেটা হচ্ছে ব্যথা নিরাময়কারী, শুধু তাই নয় রক্তের প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্যে সেই লালায় রক্ত যেন জমাট না বাঁধে সেই জিনিসও রয়ে গেছে! জোঁক রক্ত খেয়ে আক্ষরিক অর্থে ঢোল হয়ে যায়। একটা জোঁক তার শরীরের ওজন থেকে প্রায় নয় গুণ বেশি রক্ত খেয়ে ফেলতে পারে। রক্ত খাওয়া শেষ হবার পর জোঁক তার কামড় ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যায়। ভালো করে এক পেট খাবার পর তার সেগুলো ধীরেসুস্থে হজম করতে হয়। রক্ত খুব পুষ্টিকর খাদ্য তাই একবার ভালো করে খেলে জোঁকদের প্রায় কয়েক মাস কিছু খেতে হয় না। (জোঁকের তুলনায় আমরা মানুষেরা নেহায়েতই অগোছালো প্রজাতি—দিনে অন্তত তিন বার না খেলে আমাদের ভালোই লাগে না!)

12.1 নং ছবি : আফ্রিকার মাসাই সম্প্রদায় গরুর ধমনি কেটে রক্ত বের করে দুধের সাথে মিশিয়ে খায়

AMARBOI.COM

জোঁক একই সাথে নারী এবং পুরুষ। নারী দেহে যা থাকা দরকার এবং পুরুষ দেহে যা থাকা দরকার দুটোই তাদের আছে। যখন তাদের সন্তান জন্ম দেবার সময় হয় তখন একটি জোঁক অন্য জোঁককে জড়িয়ে ধরে একজনের ডিম্বাণুকে অন্যের শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত করে দেয়। তারপর একটা ছোট গুটলির মতো জায়গায় ডিম পেড়ে কোথাও রেখে দেয়। সেই ডিম ফুটে জোঁকের বাচ্চারা বের হয়ে আসে।

12.2 নং ছবি : উকুন, ছারপোকা, এঁটেল পোকা এবং জোঁকের মূল খাবার হচ্ছে রক্ত

AMARBOI.COM

জোঁক নিশ্বাস নেয় তার শরীর দিয়ে। যে সকল জোঁক পানিতে থাকে তারা পানি থেকে অক্সিজেন নেয়, তাই পানিতে অক্সিজেন কমে গেলে তাদের উপরে উঠে আসতে হয়। নিম্নচাপের সময় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন একটু কমে আসে বলে জোঁকেরা তখন উপরে ভেসে আসে। প্রাচীন আবহাওয়াবিদরা অনেক সময় এই জোঁকদের দেখে আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করত।

তেলতেলে, পিছলে, আঠালো, কিলবিলে জোঁকের জন্য সাধারণ মানুষের ঘেন্নার শেষ নেই, চুষে খাওয়া, শোষণ করা এই ধরনের নেতিবাচক শব্দ তৈরি করতে হলে জোঁকের নামটাই সবার আগে জুড়ে দেয়া হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকে জোঁককে চিকিৎসার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। ধারণা করা হয় এটা শুরু হয়েছিল আমাদের এই উপমহাদেশ থেকে। প্রাচীন পৃথিবীতে এই উপমহাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরু ধন্বন্তরীর

12.3 নং ছবি : প্রায় তিন হাজার বছর থেকে জোঁককে চিকিৎসার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে

কাহিনীতে এক হাতে রয়েছে মধু অন্য হাতে জোঁক। প্রাচীন চীনা ছবিতে চিকিৎসার জন্যে জোঁক ব্যবহারের উদাহরণ আছে। গ্রিক এবং রোমান সভ্যতাতেও চিকিৎসার জন্যে জোঁকের ব্যবহার করা হয়েছে। এত হাজার হাজার বছর থেকে যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে তার মাঝে নিশ্চয়ই কিছুটা হলে সত্যতা রয়েছে এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও সেটা কিন্তু স্বীকার করে নিয়েছে।

আগে যেরকম সকল রোগের চিকিৎসায় জোঁক ব্যবহার করা হতো এখন সে রকম নয়! চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন শরীরের ভেতর কী হয় না হয় তার সবকিছু আরও ভালোভাবে জানে তাই জোঁককে সত্যিকার সমস্যা সমাধানে লাগাতে পারে। এরকম একটি সমস্যা হচ্ছে অস্ত্রোপচারে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনঃস্থাপন। 1985 সালে যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন শহরে পাঁচ বছরের একটা ছোট বাচ্চার কান একটা কুকুর কামড়ে আলাদা করে ফেলেছিল। ডাক্তাররা দীর্ঘ সময় ধরে অস্ত্রোপচার করে তার কাটা কানটি পুনঃস্থাপন করেছিল—কিন্তু সমস্যা হলো অন্য জায়গায়! রক্ত সঞ্চালনের জন্যে ধমনি শিরা যতটুকু সম্ভব জোড়া দেয়ার চেষ্টা করা হলেও সেটা ঠিক করে কাজ করে না। ছিন্নভিন্ন ধমনি, শিরা-উপশিরাগুলো থাকে দুর্বল এবং তার ভেতর দিয়ে রক্ত সঞ্চালন হতে চায় না। কাজেই সেখানে রক্ত এসে জমা হয়, সেগুলো কোথাও যেতে পারে না। বস্টনের হাসপাতালের সার্জনেরা তখন বাচ্চার কানে কয়েকটা জোঁক লাগিয়ে দিলেন। ক্ষুধার্ত জোঁকগুলো জমা হয়ে থাকা রক্ত থেকে ক্ষতস্থানটাকে রক্ষা করে দিল। শুধু তাই নয়, জোঁকগুলো রক্ত টেনে নিচ্ছিল বলে সেখানে রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছিল তাই ক্ষতস্থানটা আরোগ্য লাভ করল অনেক দ্রুত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে অস্ত্রোপচারের পর ডাক্তাররা জোঁক পেলেন কোথায়? তারা কী তাদের অফিসের একজনকে পাশের ডোবায় পাঠিয়ে দিলেন জোঁক খুঁজে আনার জন্যে? সেই মানুষটি কী এঁদো ডোবায় পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জোঁক ধরার জন্যে? যখন জোঁক ধরল তখন টেনে সেটাকে ছুটিয়ে দৌড়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলো? আসলে এ রকম কিছু করার প্রয়োজন হয় না, কারণ চিকিৎসায় ব্যবহার করার জন্যে জোঁক কিনতে পাওয়া যায়। বর্তমান বাজার মূল্যে একটা হৃষ্টপুষ্ট (কিন্তু ক্ষুধার্ত) জোঁকের দাম সাত থেকে আট ডলার (প্রায় পাঁচশ টাকা!) চিকিৎসার জন্যে যে জোঁক ব্যবহার করা হয় সেগুলো খুব বড় নয়, তাই একটা জোঁক দিয়ে হয় না। পুরো চিকিৎসা প্রক্রিয়া শেষ করতে গোটা পঞ্চাশেক জোঁক

12.4 নং ছবি : বর্তমান বাজারে চিকিৎসার জন্যে প্রতিটি জোঁক বিক্রি হয় সাত থেকে আট ডলারে

AMARBOI.COM

লেগে যায়। জোঁক একবার ভালো মতোন রক্ত খেয়ে নিয়ে পরের তিন-চার মাস পর্যন্ত কিন্তু খেতে হয় না বলে একটা জোঁককে বারবার ব্যবহার করা যায় না!

চিকিৎসার কাজে জোঁকের ব্যবহার আবার নূতন করে শুরু হতে যাচ্ছে—এটা আসলে বিচিত্র কিছু নয়। মানুষ অনেক কিছুই প্রাণিজগৎ থেকে শিখেছে—কিছু কিছু কাজ এই প্রাণীগুলো মানুষের আধুনিক যন্ত্রপাতি থেকেও অনেক ভালোভাবে করে—কাজেই সেই প্রাণীগুলো ব্যবহার করতে দোষ কোথায়?

মানুষের শরীরের কোথাও যখন পচন ধরে যায় তখন অস্ত্রোপচার করে সেটা পরিষ্কার করা খুব সহজ নয়। তার চাইতে অনেক কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে মাছির ডিম ঢুকিয়ে দেয়া—সেই ডিম থেকে (লার্ভা) কৃমি বের হয়ে, সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে সেগুলো বেছে বেছে পচা মাংস খেয়ে একসময় মাছি হয়ে উড়ে বের হয়ে যায়! বর্ণনা শুনে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যিই এটা করা হয়—মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করা সত্যিকার ডাক্তাররাই করেন। এই মাছির ডিমও কিনতে হয়—রীতিমতো পয়সা খরচ করে!

আমাদের চারপাশের পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, সাপ, ব্যাঙ, কেঁচো, জোঁক যে কত মূল্যবান সেটা যেন কেউ ভুলে না যাই!

AMARBOI.COM

13. এইডস এবং একটি মহাদেশের অপমৃত্যু

1981 সালে এইডস রোগটিকে চিহ্নিত করার পর থেকে এখন পর্যন্ত এই রোগটিতে আড়াই কোটি মানুষ মারা গেছে (25 million)। পৃথিবীর ইতিহাসে এখন এটাকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মহামারীগুলোর একটি বলে বিবেচনা করা হয়। যে ভাইরাসের কারণে এই রোগটি হয় তার নাম এইচ.আই.ভি (HIV)—2007 সালে এই ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন কোটি। যার অর্থ বর্তমান পৃথিবীতে প্রতি দুশো মানুষের মাঝে একজন তার রক্তে এইচ.আই.ভি. বহন করে যাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে পৃথিবীতে এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে ব্যাপারটা জেনে-শুনেও আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না।

ভাইরাস এমনিতে অনেকটা প্রাণহীন জড় পদার্থের মতো। জীবিত প্রাণীর ভেতর আশ্রয় নিলে এটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। ভাইরাস আকারে খুবই ছোট, সাধারণ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এদের দেখা যায় না। এইচ.আই.ভি ভাইরাস তুলনামূলকভাবে একটু বড় হলেও রক্তের যে লোহিত কণিকার মাত্র ষাট ভাগের এক ভাগ। ভাইরাসদের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নেয়ার কোনো উপায় নেই—যদি থাকত তাহলে এইচ. আই. ভি. ভাইরাস নিশ্চয়ই থাকত সবার উপরে। জীবজগতের হিসেবে যে প্রাণী যত বেশি দিন যত বেশি জায়গায় টিকে থাকতে পারবে সে তত সফল, সেই

13.1 নং ছবি : এইডস রোগে এখন পর্যন্ত আড়াই কোটি মানুষ মারা গেছে

AMARBOI.COM

হিসেবে এইচ.আই.ভি. অত্যন্ত সফল কারণ সে একেবারে আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে। একটা ভাইরাস যদি তার বাহনকে খুব দ্রুত শেষ করে ফেলে তাহলে তাকে ব্যবহার করে খুব বেশি দূর যেতে পারে না—যেমনটি হয়েছে এবোলা ভাইরাসের বেলায়। পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাইরাস হচ্ছে এবোলা ভাইরাস, এটা দিয়ে আক্রান্ত রোগী আক্ষরিক অর্থে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, শরীরের প্রতিটি বিন্দু দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়ে অত্যন্ত দ্রুত মারা যায়। এ কারণে এবোলা ভাইরাস বেশি দূর যেতে পারে না। সেই হিসেবে এইচ.আই.ভি. অত্যন্ত "বুদ্ধিমান", একজন মানুষকে সংক্রমণ করার পর সে প্রায় দশ বছর সময় নেয় মানুষটি শেষ করার প্রক্রিয়া শুরু করতে। এই দশ বছর মানুষটি প্রায় সুস্থ-সবল মানুষের মতো থাকে, নিজের শরীরে ভাইরাসটি বহন করে এবং সে অন্যদের শরীরে সেটা ছড়িয়ে দেবার সুযোগ পায়। ভাইরাসটি কীভাবে ছড়াবে সে ব্যাপারেও এইচ. আই. ভি. অত্যন্ত সুবিবেচক—সর্দি-কাশির মতো বাতাসের ভেতর দিয়ে কিংবা এবোলা ভাইরাসের মতো স্পর্শের ভেতর দিয়ে ছড়ায় না। এইচ.আই.ভি. ভাইরাস ছড়ানো রীতিমতো কঠিন। একজন সুস্থ মানুষ যদি এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত মানুষের থেকে ভাইরাসটি নিতে চায় তাকে তার জন্যে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হবে, হয় তার সাথে দৈহিক মিলন করতে হবে কিংবা রক্ত নিতে হবে। এর মাঝে প্রকৃতি একটু নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে ফেলেছে—কারণ একজন শিশু সন্তান এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ খেয়েও সেটা পেয়ে যেতে পারে। যেহেতু এইচ.আই.ভি.-এর কোনো ভ্যাক্সিন নেই কিংবা এইডসের কোনো চিকিৎসা নেই তাই এই কৌশলী ভাইরাসকে পরাস্ত করার একটাই উপায়, তার সংক্রমণকে বন্ধ করা। কাজটা সহজ নয় কারণ পৃথিবীতে অসচেতন বা অবিবেচক মানুষের অভাব নেই। তারা অনেক সময় জেনেশুনে এবং অনেক সময় না জেনেই এই কৌশলী ভাইরাসটিকে অন্য মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

13.2 নং ছবি : মোটামুটি গোলাকার এইচ.আই.ভি. সরাসরি টি-সেলকে আক্রমণ করে

আমি যে এই ভাইরাসটিকে কৌশলী ভাইরাস বলছি তার একটা কারণ আছে, এটা কীভাবে কাজ করে শুনলে হতভম্ব হয়ে যেতে হয়। মোটামুটি গোলাকার এই ভাইরাসটি আমাদের শরীরে ঢুকে সোজাসুজি রোগ প্রতিরোধ করার যে কাষ আছে (T cell) সেগুলোকে

আক্রমণ করে। সাধারণভাবে মনে হতে পারে ভাইরাসটা এই কোষগুলোকে আক্রমণ করে তাদের ধ্বংস করার জন্যে, আসলে সেটি সত্যি নয়। ভাইরাসগুলো অত্যন্ত কৌশলে কোষগুলোর দেওয়ালে মিলে গিয়ে ভেতরে তার দুটি আর.এন.এ.-এর টুকরো ঢুকিয়ে দেয়। (আমাদের জীবনের নীল নকশা থাকে ক্রোমোজমের ডি.এন.এ.-এর ভেতরে, ডি.এন.এ.তে দুটো সারি থাকে, তার একটা সারির একটা অংশকে বলে আর.এন.এ.) শুধু যে আর.এন.এ.কে ঢুকিয়ে দিয়েই সে কাজ শেষ করে তা নয়, সেই দুটি আর.এন.এ.কে প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয় মালমশলা ঢুকিয়ে দেয়। কোষের ভেতরে ঢুকেই তারা তাদের কাজ শুরু করে দেয় সেই আর.এন.এ.কে ব্যবহার করে তারা তার দুটি অবিকল কপি তৈরি করে। সেই অবিকল কপি দুটো একত্র হয়ে ডি. এন. এ. তৈরি করে। এরপর তারা যে কাজটি করে তার কোনো তুলনা নেই, তারা নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজমে গিয়ে তার আসল ডি.এন.এ. কেটে দুই ভাগ করে সেখানে নিজেকে জুড়ে দেয়। এইচ.আই.ভি. তখন সেই মানুষটার রোগ প্রতিরোধ কোষের একটা অংশ হয়ে যায়। সেই কোষ তখন তার অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্মের সাথে সাথে এইচ.আই.ভি ভাইরাসের আর.এন.এ. তৈরি করতে থাকবে। সেই আর.এন.এ. কোষের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে পূর্ণাঙ্গ এইচ.আই.ভি. ভাইরাস তৈরি করে মুক্ত হয়ে বের হয়ে যায়। রোগ প্রতিরোধকারী সেই কোষ শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে—তাই আমরা দেখতে পাই এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত মানুষের রোগ প্রতিরোধকারী কোষ (T cell)-এর সংখ্যা কমে আসছে। এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত মানুষের শরীরের অবস্থা বোঝার জন্যে ডাক্তাররা প্রথমেই এই কোষগুলোর সংখ্যা গুনে দেখেন। রক্তে এর সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে কমে এলেই মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই কমে আসে। তখন এইডসের সূত্রপাত হয়।

AMARBOI.COM

এইডস AIDS হচ্ছে ইংরেজি Acquired Immune Dificiency Syndrome শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি করা একটা শব্দ—নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই রোগে মানুষ তার প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। শরীরে এইচ.আই.ভি. থাকলে বছর দশেক পর তার শরীরের টি-সেলের সংখ্যা যখন খুব কমে আসে তখন এইডস দেখা দেয়। এইডস দেখা দেবার পর মানুষ খুব বেশি সময় বাঁচে না, নয় মাস থেকে এক বছরের ভেতর সে মারা যায়। যেহেতু তার রোগ প্রতিরোধের কোনো ক্ষমতা নেই তখন রাজ্যের যত রোগ-শোক আছে তাকে আক্রমণ করে। শরীরের ভেতরেই যে সব রোগ ঘাপটি মেরে ছিল, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যে বেশি সুবিধে করতে পারছিল না, হঠাৎ করে সেই রোগগুলোই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে মানুষটি যক্ষ্মা, নিমোনিয়া, মেনিনজাইটিস, ডায়রিয়া বা এরকম কোনো একটা রোগে মারা যায়।

এইডস রোগটি কোথা থেকে এসেছে, তার ভাইরাস এইচ.আই.ভি. কেমন করে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে সেটা নিয়ে বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের কৌতূহলের শেষ নেই। এটা নিয়ে নানা

ধরনের ধারণা প্রচলিত আছে। বলাই বাহুল্য অনেকগুলো ধারণার মাঝে একটি হচ্ছে পাপীদের শাস্তি দেওয়ার জন্যে খোদার দেয়া একটি গজব! তবে বিজ্ঞানীরা এই মুহূর্তে যে ধারণাটি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে ভাবছেন সেটি হচ্ছে এটি শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষের কাছে এসেছে। শিম্পাঞ্জির শরীরে যখন এই ভাইরাসটি ছিল তখন কিন্তু এটি মোটামুটি একটা নিরীহ ভাইরাস হিসেবেই ছিল। ধারণা করা হয় আফ্রিকার ক্যামেরুনে কোনো একজন শিকারি শিম্পাঞ্জিকে শিকার করার সময় তার শরীরে কোনো একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়ে সেখানে শিম্পাঞ্জির শরীরে থাকা ভাইরাসটির সংক্রমণ হয়। মানুষের শরীরে এসে ভাইরাসটি নিজেকে খানিকটা পরিবর্তন করে নিয়ে যে রূপটি গ্রহণ করে সেটাই হচ্ছে ভয়ঙ্কর এইচ.আই.ভি.। ধারণা করা হয়, 1955-60-এর মাঝে এইডস আক্রান্ত প্রথম মানুষটি ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয়, যদিও রোগটি কী সেটা ডাক্তারেরা তখনো অনুমান করতে পারেন নি। বহু দেশ এবং বহু মানুষ ঘুরে এটা শেষ পর্যন্ত যখন উন্নত মানুষের দেশে এসে হানা দেয় তখন সবার টনক নড়তে শুরু করে—1981 সালে এটাকে মহামারি বিবেচনা করে ঘোষণা দেয়া হয়। ফরাসি এবং আমেরিকান বিজ্ঞানীরা 1983 এবং 1984 সালে প্রথমবার এই ভাইরাসটিকে শনাক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেন। বিজ্ঞানীদের কোন্দল মেটানোর জন্যে 1986 সালে আন্তর্জাতিকভাবে এটার নূতন নাম দেয়া হয় Human Immunodeficiency Virus সংক্ষেপে এইচ.আই.ভি. (HIV)—যে ফরাসি বিজ্ঞানীরা এইচ.আই.ভি. আবিষ্কার করেছেন 2008 সালে তাদের নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

এইচ.আই.ভি. একটা ভাইরাস এবং এইডস একটি রোগ কিন্তু এর পিছনে বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শোকগাথাটি লুকিয়ে আছে। উন্নত বিশ্ব তাদের দেশে এইডসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে। এটি রক্ত দেয়ার মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে তাই সেসব দেশে সব রক্তই প্রথমে এইচ.আই.ভি.-এর জন্যে পরীক্ষা করে নেয়া হয়। এটা দৈহিক মিলনের ভেতর দিয়েও ছড়াতে পারে তাই সেখানেও ঝুঁকি নেয়া হয় না। মায়ের দুধ খেয়ে সন্তানের শরীরে এইচ.আই.ভি. যেতে পারে তাই মা'দের সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়। যে সমস্ত মানুষ

13.3 নং ছবি : বিজ্ঞানীদের ধারণা শিম্পাঞ্জিদের থেকে এইচ.আই.ভি. মানুষের মাঝে এসেছে

AMARBOI.COM

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করে, ড্রাগ নেবার সময় একে-অন্যের সিরিঞ্জ ব্যবহার করে তারাই এখন অবিবেচক হিসেবে এই ভাইরাসটি সীমিত আকারে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশে এটি সম্পূর্ণ অন্য একটি ব্যাপার। সারা পৃথিবীতে এখন তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি মানুষের শরীরে এইচ.আই.ভি. ভাইরাস—তার মাঝে দুই থেকে আড়াই কোটি মানুষ হচ্ছে আফ্রিকার। সারা পৃথিবীর এইচ.আই.ভি. বহনকারী মানুষের 65 শতাংশই হচ্ছে আফ্রিকার। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে এমন কিছু দেশ আছে যেখানে প্রতি তিনটি মানুষের মাঝে একজন এইচ.আই.ভি. বহন করে। যদিও এইচ.আই.ভি. সংক্রমণের প্রায় দশ বছর পর পূর্ণাঙ্গ এইডস দেখা দেয় তারপরেও সেই সব দেশে মৃত্যু এসে হানা দিয়েছে। অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, হাসপাতালে, বাড়িতে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। এখানে মৃত্যু এসে হানা দেয় একজন মানুষের পূর্ণ জীবনের ঠিক মাঝখানে তাই সেখানে লক্ষ লক্ষ অনাথ শিশু—তাদের দেখার কেউ নেই। সেই অনাথ শিশুদের একটা বড় অংশ নিজেরাই এইচ.আই.ভি. বহন করছে, কারো কারো এইডস হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ শিশু এর মাঝে এইডসে মারা গিয়েছে। কর্মক্ষম মানুষ কমে আসায় দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ছে, পুরো সমস্যাটা এখন চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই মহাদেশটির কী হবে কেউ জানে না।

এতক্ষণ আফ্রিকার এইডস নিয়ে যে কথাগুলো বলা হলো সেগুলো আসলে ভূমিকা মাত্র—সত্য কথাটা এখনো বলা হয় নি। সত্য কথাটি আরো অনেক ভয়ঙ্কর—সেটি হচ্ছে আফ্রিকার এই দেশগুলো এখনো এই সমস্যাটিকে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়। রাজনৈতিক নেতা, সামাজিক কর্মী, সুশীল সমাজ সবাই জানে যে এটা ঘটে নি। সাউথ আফ্রিকার মতো একটা উন্নত দেশও এটাকে অস্বীকার করে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে সেই দেশে এইডস কথাটি কেউ মুখে উচ্চারণ করে না, কারো ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ হিসেবে "এইডস" শব্দটি লেখা হয় না। এইডস হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত মারা যায় যক্ষ্মা, নিমোনিয়া, গণরিয়া এরকম পরিচিত রোগে, কাজেই সেটাকেই মৃত্যুর কারণ হিসেবে দেখা হয়। এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ বা এইডস-এর যেহেতু সত্যিকার চিকিৎসা বা ভেক্সিন নেই তাই এটাকে থামানোর একটাই উপয়, সেটা হচ্ছে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলা। আফ্রিকাতে সেই নিয়ম-কানুনগুলোর কথা কেউ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে না, কেউ তার চেষ্টাও করে না,

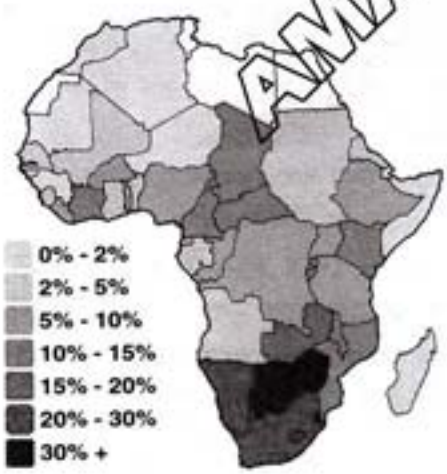

13.4 নং ছবি : সারা পৃথিবীর এইচ.আই.ভি. বহনকারী মানুষের ৬৫% রয়েছে আফ্রিকায়

AMARBOI.COM

কাজেই সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো সচেতনতা নেই। নিজের অজান্তেই তারা তাদের অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন দিয়ে একে-অন্যকে এই ভয়াবহ ভাইরাসটি দিয়ে যাচ্ছেন। 2004 সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আফ্রিকার প্রথম মহিলা ওয়াংগারি মাথাই পুরস্কার পাওয়ার পরের দিনই বলেছিলেন, এইচ.আই.ভি. বানর থেকে এসেছে তিনি সেটা বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন এইচ.আই.ভি. পশ্চিমা শক্তি যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে তৈরি করেছে এবং এর কারণে এখন আফ্রিকার কালো মানুষ অসহায়ভাবে মারা যাচ্ছে।

AMARBOI.COM

13.5 নং ছবি : আফ্রিকার মানুষ এখনো এইডস রোগটিকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়

ওয়াংগারি মাথাইয়ের কথা বিজ্ঞানী মহল হয়তো মেনে নেবে না—কিন্তু এটি কেউ অস্বীকার করবে না যে উন্নত বিশ্ব যেভাবে আফ্রিকা নামের মহাদেশটিকে সবার চোখের সামনে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করতে দিচ্ছে সেটি যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করে হত্যা করার থেকে কোনো অংশেই কম অপরাধ নয়।

14. মানবদেহের ডিজাইন সমস্যা

যারা আড্ডা দিতে পছন্দ করেন তারা নিশ্চয়ই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন—মানুষ সমালোচনা করতে ভারি পছন্দ করে। পৃথিবীর অনেক মানুষই হচ্ছেন কঠিন সমালোচক, তারা ভালো কিছুর প্রশংসা করা থেকে তার ভেতর থেকে খুঁত বের করে তার নিন্দা করার মাঝে অনেক বেশি আনন্দ খুঁজে পান। যারা খবরের কাগজে লেখালেখি করেন তাদের বেশিরভাগই ছিদ্রান্বেষী এবং নিন্দুক। যে কোনো বিষয়ের দোষ খুঁজে বের করে তারা সেটা নিয়ে হা-হুতাশ করেন। মানুষকে সুযোগ দেয়া হলে তারা কী পরিমাণ সমালোচনা করতে পারে তার একটা উদাহরণ দেয়া যাক।

এই সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে চমকপ্রদ জিনিসটি হচ্ছে মানুষ, আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় মানবদেহ। মানুষকে যদি এই মানবদেহকে নিয়ে সমালোচনা করতে দেয়া হয় তারা কী থতমত খেয়ে যাবে নাকী সমালোচনা করতে পারবে?

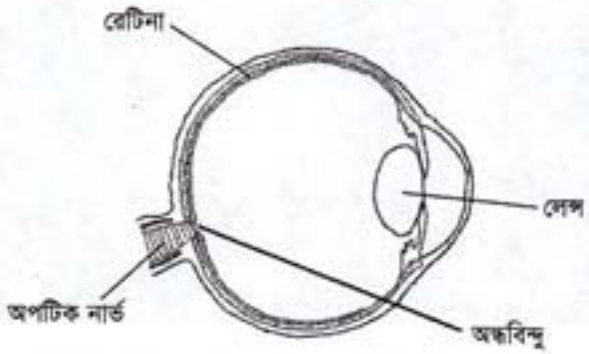

14.1 নং ছবি : চোখের লেন্সের ভিতর দিয়ে আলো চোখের রেটিনাতে এসে পড়ে

অবশ্যই পারবে, বয়োসন্ধিতে পৌঁছেছে এ রকম একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেই সে অবধারিতভাবে মেয়েদের শরীরের ডিজাইনটি নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করবে। সন্তান জন্ম দেয়ার প্রস্তুতি হিসেবে তার দেহ যেভাবে প্রতি মাসে একবার প্রস্তুতি নেয় এবং গর্ভধারণ না হলে প্রস্তুতি পর্বটি যেভাবে পরিত্যাগ করে তার প্রক্রিয়াটি পছন্দ করার কোনো কারণ নেই। একটা

AMARBOI.COM

বয়সে পৌঁছানোর পর সব মেয়েই পুরুষ এবং নারীর দেহের ডিজাইনের বৈষম্য নিয়ে অভিযোগ করে থাকে।

মেয়েদের অভিযোগ করার আরো বিষয় আছে। শুধুমাত্র মেয়েরা সন্তান ধারণ করতে পারে এবং তাই শুধুমাত্র মেয়েদেরই জন্ম দেয়ার প্রক্রিয়াটির ভেতর দিয়ে যেতে হয়। প্রক্রিয়াটি কষ্টকর এবং আমরা "গর্ভ যন্ত্রণা" বলে সে জন্যে একটি শব্দ পর্যন্ত আবিষ্কার করে রেখেছি।

14.2 নং ছবি : বাম চোখ বন্ধ করে ডান চোখ দিয়ে কালো বৃত্তটির দিকে তাকিয়ে চোখটি ছবিটির কাছাকাছি আনতে থাকলে এক সময় হঠাৎ করে ক্রসটি অদৃশ্য হয়ে যাবে

সন্তান জন্ম দেয়ার প্রক্রিয়াটি খুব যন্ত্রণাদায়ক তার কারণ নবজাতক শিশুর মাথা তুলনামূলকভাবে বড়। মায়ের জন্ম দেয়ার জন্যে তার শরীরে যে পথটুকু রয়েছে, একটা শিশুর মাথা কেন তার থেকে বড় হতে গেল? কেন শিশুর মাথা আরেকটু ছোট হলো না, তাহলেই তো সন্তান জন্ম দেয়ার যন্ত্রণাটুকু মায়েদের সহ্য করার প্রয়োজন হতো না? এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের একটা থিওরি রয়েছে, তারা মনে করেন এক সময়ে শিশুদের মাথা তুলনামূলকভাবে ছোটই ছিল এবং জন্ম দেবার প্রক্রিয়াটি এত যন্ত্রণাদায়ক ছিল না। কিন্তু মানুষ বলতে গেলে হঠাৎ করেই বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে, তাই তাদের মস্তিষ্ক হঠাৎ করে বড় হয়ে ওঠে, বিবর্তনের মাধ্যমে মায়ের শরীর সেটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জন্ম দেবার পথটুকু এখনো বড় করে উঠতে পারে নি।

মানবদেহের সমালোচকদের সমালোচনা করার জন্যে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হচ্ছে চোখ। মানুষের চোখের মতো সংবেদনশীল এবং সূক্ষ্ম কিছু কেউ কখনো তৈরি করতে পারবে না, চোখের মতো সুন্দর এবং বুদ্ধিদীপ্ত কিছুর উদাহরণও কেউ দিতে পারবে না, তাহলে মানুষ চোখের সমালোচনা করে কেমন করে? তাদের যুক্তি নেই তা নয়—চোখের রেটিনার দিকে তাকালেই মানুষ একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাবে। চোখের

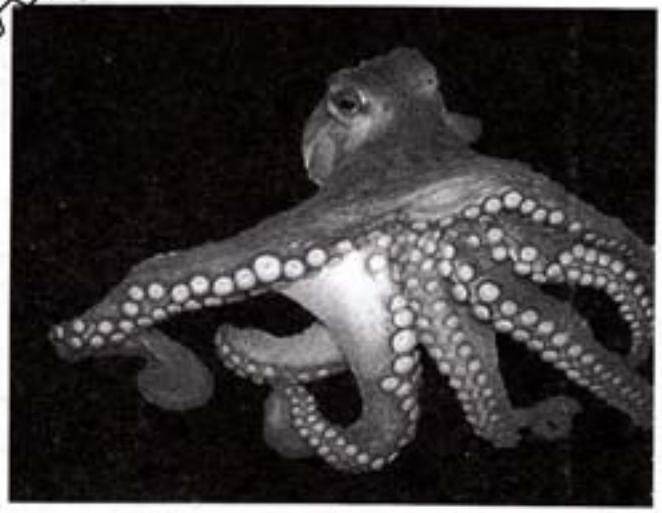

14.3 নং ছবি : অক্টোপাসের চোখের ডিজাইন মানুষের চোখের ডিজাইন থেকে ভালো

AMARBOI.COM

লেন্সের ভেতর দিয়ে (14.1 নং ছবি) আলো চোখের পিছনের রেটিনাতে এসে পড়ে। রেটিনার থেকে আলোর সংকেতগুলো নার্ভের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে পৌছায়। বিজ্ঞানী না হয়েও সবাই অনুমান করতে পারবে যে রেটিনার মাঝে নিশ্চয়ই আলো সংবেদন কোষ রয়েছে। এই কোষ থেকে আলোর সংকেতগুলো মস্তিষ্কে নিয়ে যায় নার্ভ। এখন কথা হচ্ছে, আলো সংবেদন কোষগুলোর সাথে নার্ভের সংযোগটা কীভাবে হওয়া উচিত? আলো সংবেদন কোষগুলো থাকবে উপরে, তার নিচে থাকবে নার্ভ। নার্ভ যদি উপরে থাকে তাহলে সমস্যা দ্বিমুখী; প্রথমত, কোষগুলোর উপর সেগুলো যদি ছড়িয়ে থাকে, তার ভেতর দিয়ে রক্তের প্রবাহ হয় তাহলে সেটা আলোর উপর প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে, আলোকে এই নার্ভগুলো ভেদ করে আলো সংবেদন কোষে পৌছাতে হবে। দ্বিতীয়ত, নার্ভগুলোকে একত্র করে সেটাকে রেটিনা ভেদ করে পিছনে পৌছাতে হবে। কাজেই কারো যদি চোখকে ভালো করে ডিজাইন করতে হয় তাহলে অবশ্য অবশ্যই তার আলো সংবেদন কোষগুলো রাখতে হবে উপরে, নার্ভগুলো রাখতে হবে নিচে। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, মানুষের চোখে রেটিনার নিচে নয় রেটিনার উপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে নার্ভ। সেই নার্ভগুলো একত্র হয়ে একটা বিন্দুতে রেটিনাকে ভেদ করে পিছনে যায়। যে বিন্দুতে সেটা রেটিনাকে ভেদ করে তার নাম অন্ধবিন্দু, কারণ সেখানে আলো পড়লেও কিছু দেখা যায় না। চোখে যে সত্যিই অন্ধ বিন্দু বলে একটা অংশ আছে সেটা খুব সহজ পরীক্ষা করে দেখা যায় (14.2 নং ছবি) এই অংশে আলো পড়লেও সেটি দেখা যায় না।

মানবদেহের সমালোচকরা তাই চোখের সমালোচনা করেন খুব কড়াভাবে, বিশেষ করে মানুষের চোখের যে ডিজাইন সমস্যা আছে। সেই সমস্যাটি কিন্তু কিছু কিছু প্রাণীর চোখে সমাধান করা হয়েছে। যেমন অক্টোপাস বা স্কুইড তাদের চোখে কিন্তু আলো সংবেদন কোষ উপরে নার্ভগুলো নিচে—ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত ছিল।

14.4 নং ছবি : মানুষের আক্কেল দাঁত খুব কম সময়েই সোজা হয়ে বের হতে পারে, বেশির ভাগ সময়েই সেটা বাঁকা

চোখের মতোন এমন চমকপ্রদ একটা জিনিসের সমালোচনা যদি করা হয় তাহলে সমালোচকরা আক্কেল দাঁতের কেন সমালোচনা করবে না? সেটা তারা করতেই পারে কারণ আমরা সবাই কখনো না কখনো এই আক্কেল দাঁতের সমস্যায় ভুগেছি। মানুষের মুখের ভেতর আক্কেল দাঁত ঠিকভাবে গজানোর জায়গা নেই—মুখের এক্সরে নিলে অবধারিতভাবে দেখা যায় সেটা বাঁকা হয়ে বের হচ্ছে, মাড়ি ভেদ করে বের হতে পারছে না এবং এ নিয়ে যন্ত্রণার কোনো শেষ নেই। মানুষ যদি তার আক্কেল দাঁতের মতো সহজ একটা বিষয়ের সমস্যা সমাধান করতে না পারে তাহলে আরো কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান কেমন করে করবে?

কঠিন একটা সমস্যা হতে পারে মানুষের এপেনডিক্স। আমরা সবাই নিশ্চয়ই কখনো না কখনো আমাদের পরিচিত মানুষের এপেন্ডিসাইটিস অপারেশনের কথা শুনেছি। আমাদের বৃহদন্ত্রের শুরুতে ছোট একটা টিউবের মতো এই অংশটার মানুষের শরীরে কোনো কাজই নেই। মাঝে মাঝে হঠাৎ সেটার ইনফেকশান হয়ে যায়, মানুষ যন্ত্রণায় গড়াগড়ি করতে থাকে এবং পেট কেটে সেই এপেন্ডিক্সটাকে ফেলে দেয়া ছাড়া তখন কোনো আর গতি থাকে না। আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে যখন এপেন্ডিক্সটাতে ইনফেকশান হয়ে সেটা ফেটে যায়, তখন সাথে সাথে অপারেশন না করলে রোগীকে বাঁচানো কষ্টকর হয়ে যায়। যে জিনিসটার কোনোই ব্যবহার নেই—যার একমাত্র কাজ হচ্ছে হঠাৎ করে ইনফেকশান হয়ে মানুষের জীবনে একটা বিপদ ঘটানো, সেটাকে পেটের ভেতর রেখে দেয়ার পিছনে যুক্তি কোথায়? সমালোচকরা যদি এর সমালোচনা করে তাহলে তাদের কী দোষ দেয়া যায়?

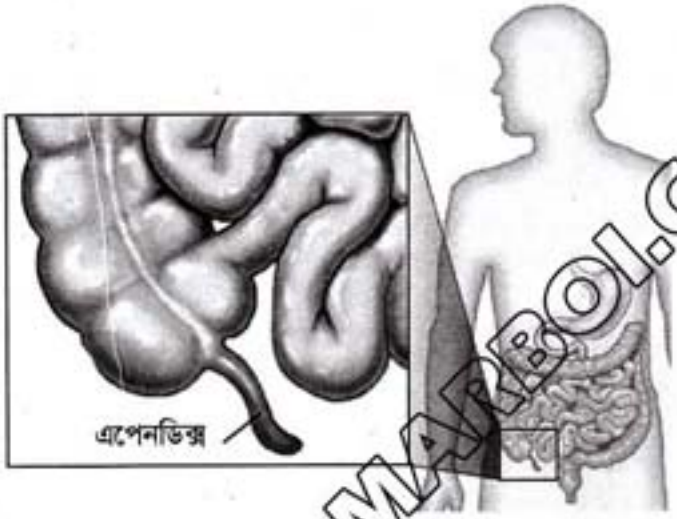

14.5 নং ছবি : মানুষের এপেন্ডিক্সটি কেন আছেই ইনফেকশান হয়ে যন্ত্রণা দেবার জন্যে

মানুষ দু'পায়ে দাঁড়াতে পারে কিন্তু মজার ব্যাপার হলো হিসেব কষে দেখা গেছে মানুষের শরীরের যেটুকু ওজন সেটা তাদের দুই পায়ের হাড়ের সংযোগের জন্যে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। সত্যি কথা বলতে কী, যদি পা দুটি না হয়ে চারটি হতো তাহলে মোটামুটিভাবে ওজনটা ঠিক করে ভাগ করে দেয়া যেত। নিতম্বের যে অংশে পায়ের হাড় এসে সংযোগ দেয় সেই অংশের ক্ষয় মানুষের খুব পরিচিত একটা সমস্যা।

মানুষের হাঁটুর ডিজাইনটাও শরীরের জন্যে পর্যাপ্ত নয়। এখানেও বলা যায় দুটি হাঁটু না হয়ে চারটি হাঁটুতে মানুষের ওজন ছড়িয়ে দিলে হাঁটুর সমস্যা অনেক কম হতো। হাঁটু ছাড়াও কনুই, পায়ের পাতা, পেট এবং বিশেষ করে পুরুষ এবং মহিলাদের মূত্রনালিকে নিয়ে সমালোচকরা অনেক কঠিন কঠিন সমালোচনা করে থাকেন। সেগুলোর সবগুলোকে নিয়ে আলোচনা করলে বিশাল এক মহাভারত লিখতে হবে।

সেই মহাভারত লেখার যে খুব একটা প্রয়োজন আছে তা কিন্তু নয় কারণ সমালোচকদের এই সব সমালোচনাই বিজ্ঞানীরা যে মেনে নিয়েছেন তা কিন্তু নয়। তাদের অনেকেই যুক্তি

AMARBOI.COM

দেখান যে একটা ডিজাইনকে এত সহজে খারাপ বা ভুল ডিজাইন বলা ঠিক নয়। যেটাকে আপাতদৃষ্টিতে বিচিত্র বা উদ্ভট মনে হয় সেটা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিচিত্র বা উদ্ভট নাও হতে পারে। যেমন যে মানুষটি জীবনে কখনো বাইসাইকেল দেখে নি তাকে যদি একটা ছোট বাচ্চাদের ট্রাইসাইকেল আর সত্যিকারের বাইসাইকেল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় কোন ডিজাইনটা ভালো। একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় যে তারা ছোট বাচ্চাদের ট্রাইসাইকেলের ডিজাইনটাকে বেছে নেবে, তারা কল্পনাও করতে পারবে না যে আসলে দুই চাকার বাইসাইকেল অনেক দক্ষ এবং সুশৃঙ্খল যন্ত্র। কাজেই কখনোই একটা ডিজাইনকে এত সহজে খারাপ ডিজাইন বলার আগে সেটাকে আরো অনেক খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

প্রচলিত বিশ্বাস যে সবকিছুই এসেছে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে। একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে টিকে থাকার জন্যে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে প্রাণী জগৎ নিজেদের পরিবর্তন করে নিয়েছে কিংবা নিচ্ছে। অনেক জায়গাতেই আমরা রয়েছি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ঠিক মাঝখানে, তাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের হিসেব মিলছে না। অনেক সময়েই পরিবেশের সাথে টিকে থাকার জন্যে কোনো একটা সমাধান বলতে গেলে জোর করে চলে এসেছে যেটাকে এখন মনে হয় খাপছাড়া বা অগোছালো।

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, যারা ধর্ম দিয়ে বিজ্ঞান বোঝার চেষ্টা করেন তারা কিন্তু মানুষের শরীরের ডিজাইনে ত্রুটির বিষয়টি মানতেই চান না, তাদের ধারণা সেটা মেনে নিলে ধর্মটাকে খাটো করে দেখা হয়। তাই তারা এই বিষয় নিয়ে ক্রমাগত চেঁচামেচি করে যাচ্ছেন—বিতর্কটা তাই জমে উঠেছে বেশ ভালোভাবেই।

AMARBOI.COM

15. ঈশপের সেই কাক

পাখিদের জন্যে আমাদের এক ধরনের স্নেহ আছে। কী চমৎকারভাবে তারা ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, তাদের গায়ে কত বিচিত্র রং। গাছের ডালে পাখি যখন কিচিরমিচির করে ডাকে আমরা তখন সাগ্রহে এবং সস্নেহে তাদের দিকে তাকাই।

কিন্তু কাক? সর্বনাশ! আমরা কাককে কেউ দুই চোখে দেখতে পারি না। কাকও পাখি কিন্তু পাখির জন্যে রাখা এতটুকু স্নেহ কাকের কপালে জোটে না। কেন জুটবে? তাদের কালো কুৎসিত গায়ের রং, কর্কশ গলার আওয়াজ। কা কা করে ডেকে তারা কান ঝালাপালা করে দেয়। আচার-আচরণ মোটেও সুবিধে নয়। রাজ্যের নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করায় তাদের কোনো ক্লান্তি নেই, উচ্ছিষ্ট খাবার কিংবা মরা ইঁদুর—কোনো কিছুতেই তাদের অরুচি নেই। এ রকম একটা প্রাণীর জন্যে বুকের ভেতর কী ভালোবাসা জন্মানো যায়? কেউ কী কাকদের সম্পর্কে একটি ভালো কথাও বলতে পারবে?

15.1 নং ছবি : পশু-পাখিদের মাঝে পাখি খুব বুদ্ধিমান

সত্যি কথা বলতে কী কাকদের সম্পর্কে একটি ভালো কথা পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীরাই বলে থাকেন, আর সেটি জানার পর আমার ধারণা আমরা

AMARBOI.COM

সবাই কাককে একটু অন্য চোখে দেখব। সেটি হচ্ছে কাকদের অস্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা! হ্যাঁ, শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু কাকদের বলা হয় পাখিদের আইনস্টাইন!

ইংরেজতে "বার্ড-ব্রেইন" বলে একটা কথা চালু আছে, বোকা ধরনের মানুষদের বুদ্ধি নিয়ে খোঁটা দিতে হলে এই কথাটা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে পাখিরা কিন্তু মোটেও বোকা নয়। পাখিদের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে মানুষের মাঝে এক ধরনের ভুল ধারণা ছিল, তার কারণ বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করার জন্যে সবসময়ই প্রাণীটির কোনো কিছু ধরার জন্যে হাত বা হাতের কাছাকাছি কোনো ধরনের অঙ্গ আছে সেটা ধরে নেয়ার দরকার হতো—যদি কোনো কিছু ধরতেই না পারল তাহলে সে বুদ্ধির পরীক্ষাটা দেবে কেমন করে? কিন্তু পাখিদের সেই সৌভাগ্য নেই। তাদের হাত নেই—হাতের জায়গায় তাদের রয়েছে পাখা—সেই পাখা মেলে আকাশে ওড়া যায় কিন্তু কিছু ধরা যায় না। কোনো কিছু ধরার জন্যে তাদের ব্যবহার করতে হয় তাদের ঠোঁট, সেগুলো তো আর আঙ্গুলের মতো নয়, সেগুলো শক্ত, অনমনীয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে শারীরিক এত অসুবিধে নিয়েও কিন্তু বুদ্ধির পরীক্ষায় পাখি অনেক এগিয়ে আছে।

AMARBOI.COM

15.2 নং ছবি : কাক সামাজিক পাখি তাই দল বেঁধে থাকতে পছন্দ করে

প্রাণীরা মস্তিষ্কের যে অংশটুকুকে তাদের বুদ্ধিমত্তার জন্যে নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম সেরেব্রাল করটেক্স। যে প্রাণীর সেরেব্রাল করটেক্স যত বড় তার বুদ্ধিমত্তা তুলনামূলকভাবে তত বেশি। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে পাখিদের সেরেব্রাল করটেক্স খুবই ছোট, বলতে গেলে নেই—তাহলে তাদের বুদ্ধিমত্তাটা আসছে কোথা থেকে? 1960 সালে স্ট্যানলি কব নামে একজন নিউরোলজিস্ট আবিষ্কার করলেন পাখিরা বুদ্ধিমত্তার জন্যে তাদের মস্তিষ্কের এমন একটা অংশ ব্যবহার করে যেটা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নেই! শুধু তাই না, দেখা গেছে যে পাখির মস্তিষ্কে এই অংশটা যত বড় সেই পাখি তত বুদ্ধিমান এবং অবাক হবার কিছু নেই কাক (এবং কাক জাতীয় পাখিদের) মস্তিষ্কের এই অংশটুকু পাখিদের মাঝে সবচেয়ে বড়!

15.3 নং ছবি : ছিপ দেখে মাছ ধরার পাখি ক'টি মাছ ধরেছে সেটি গুনতে পারে

বুদ্ধিমত্তার হিসেব-নিকেশ করার সময় শরীরের সাথে মস্তিষ্কের ওজনের তুলনা করা হয়, যে প্রাণী যত বুদ্ধিমান শরীরের তুলনায় তার মস্তিষ্কের ওজন তত বেশি। বলাই বাহুল্য এই হিসেবে সবচেয়ে এগিয়ে আছে মানুষ এবং মানুষের কাছাকাছি শিম্পাঞ্জি, ওরাংউটান, বানর জাতীয় প্রাণী। তারপরেই আসে ডলফিন এবং তিমি মাছ। (তিমিকে মাছ বলা হয়েছে কিন্তু সেটি আসলে মোটেই মাছ নয়। তিমি কিংবা ডলফিন দুটোই স্তন্যপায়ী প্রাণী।) পাখিদের মস্তিষ্কের ওজন তাদের শরীরের তুলনায় ডলফিন, তিমি কিংবা প্রায় মানুষের মতো! কাজেই পাখির বুদ্ধি যে অন্য দশটা প্রাণী থেকে বেশি হবে তাতে অবাক হবার কী আছে?

মানুষের বুদ্ধিমত্তা কেমন করে মাপতে হয় সেটি বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে জানেন—কিন্তু অন্য প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা মাপার জন্যে তারা সেই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করতে পারেন না। তাই

পাখিদের বুদ্ধিমত্তা মাপার জন্যে তারা পাখিদের কিছু কিছু বিশেষ ধরনের কাজ করার ক্ষমতা আছে কি না সেটা বের করার চেষ্টা করছেন।

সে রকম একটা ক্ষমতা হচ্ছে গোনার ক্ষমতা। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখেছেন পাখি গুনতে পারে। কাক যদিও পাখিদের মাঝে সবচেয়ে বুদ্ধিমান কিন্তু গোনার বেলায় তারা সবচেয়ে এগিয়ে নেই, তারা তিন পর্যন্ত গুনতে পারে। টিয়া পাখি গুনতে পারে পাঁচ পর্যন্ত। চীনা জেলেরা মাছ ধরার জন্যে পানকৌড়ি ধরনের পোষা পাখি ব্যবহার করে, সেই পাখিগুলো পরপর সাতটা মাছ ধরে আনলে অষ্টম মাছটা জেলেরা পাখিটাকে খেতে দেয়। দেখা গেছে পাখিগুলো নিজেরাই তার হিসেব রাখে। সাতটা মাছ ধরে আনার পর অষ্টম মাছটা তাদের খেতে না দেয়া পর্যন্ত তারা পানিতে নামে না, রীতিমতো ঝগড়াঝাঁটি করে।

বুদ্ধিমত্তার আরেকটা পরিমাপ হচ্ছে শেখার ক্ষমতা। বেশিরভাগ প্রাণী তাদের সহজাত প্রবৃত্তি ব্যবহার করে বেঁচে থাকে—পাখিরা কিন্তু শিখতেও পারে। পাখির বাচ্চারা বেঁচে থাকার অনেক কায়দা-কানুন তাদের মা-বাবার কাছ থেকে শেখে! শক্ত কোনো ফল ভেঙে ভেতরের শাঁস বের করার জন্যে উপর থেকে শক্ত পাথরে ফেলে দেয়া পাখিদের জন্যে খুব সাধারণ একটা কাজ। জাপানের ব্যস্ত রাস্তায় মাঝে মাঝে মজার একটা দৃশ্য দেখা যায়। শক্ত খোসার বাদাম, যেটা ঠোঁট দিয়ে ভাঙা যায় না, কাকেরা সেগুলো ব্যস্ত রাস্তায় ফেলে রাখে। চলন্ত গাড়ির চাকার নিচে সেগুলো ভেঙ্গে যায়, তারপর ট্রাফিকের লাল বাতি জ্বলার পর যখন সব গাড়ি থেমে যায় তখন কাকেরা ছুটে গিয়ে সেই বাদামগুলো খেতে শুরু করে! যার অর্থ তারা শুধু যে তাদের জানা পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে তা নয়, নূতন নূতন বুদ্ধিও বের করে কাজে লাগাতে শুরু করে।

15.4 নং ছবি : কাক তার বাঁকা করে কাচের সরু গ্লাসের ভেতর থেকে খাবার বের করে আনছে

বুদ্ধিমত্তার আরেকটা পরিমাপ হচ্ছে ভাষা। যে প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা যত বেশি তার ভাষা তত সহজ। পাখিদের কিচিরমিচির শুনে আমাদের সন্দেহ হতে পারে যে সেগুলো বুঝি নেহায়েতই অর্থহীন চেঁচামেচি কিন্তু গবেষকরা বলেন অন্য কথা। পাখিরা একে-অন্যের

সাথে রীতিমতো কথা বলে যোগাযোগ করতে পারে। পাখিরই মিষ্টি গান গাওয়ার ক্ষমতা আছে, সেই গান তারা অন্য পাখিদের আকর্ষণ করার জন্যে ব্যবহার করে। কাকের কর্কশ কা কা শব্দ মোটেও গানের মতো নয় এবং সেটা শুনলে আমরা দূর দূর করে তাদের তাড়িয়ে দেই, কিন্তু কেউ কী জানে যে পাখির জগতের রীতিমতো এই কাকের রীতিমতো একটা ভাষা আছে। ডুয়িট চ্যাম্বারলিন নামে এক বিখ্যাত কাকবিশারদ বহু বছর গবেষণা করে কাকের ভাষার 23টি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। এই 23টি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝায়, কাজেই কাক যদি এই শব্দগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করে তাহলে রীতিমতো তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

দেখা গেছে বুদ্ধিমান প্রাণীরা দল বেঁধে সামাজিক পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে। পাখিদের বেলায় এটা সত্যি—তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে শীতকালের পাখি! শীতের সময় শীতল দেশের পাখিরা দল বেঁধে উড়ে উড়ে আমাদের দেশে চলে আসে। এই হাজার হাজার মাইল উড়ে আসার সময় পাখিরা যে শৃঙ্খলা দেখায় তার কোনো তুলনা নেই। দল বেঁধে থাকা পাখিদের মাঝে কাক যে একেবারে এক নম্বর সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কেউ যদি আমার কথা অবিশ্বাস করে তাহলে তাকে বলব কোনোভাবে একটা কাককে জ্যান্ত অবস্থায় ধরে ফেলতে, তাহলে সেই কাককে উদ্ধার করার জন্যে সারা শহরের যত কাক রয়েছে সবাই ছুটে এসে তারস্বরে চিৎকার করা শুরু করবে, তাদের আপনজনকে ছুটিয়ে নেয়ার জন্যে এমন কাণ্ড শুরু করবে যে তার থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় নেই!

একটা প্রাণী যখন বুদ্ধিমত্তায় উপরের দিকে থাকে তখন কিন্তু শুধু খাওয়া আর বংশবৃদ্ধিতে তারা সন্তুষ্ট থাকে না, তারা আনন্দও করতে চায়। আনন্দ করার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে খেলা—এবং পাখিরা প্রায় সময়েই নিজেরা নিজেরা খেলে। একটা ঢালু জায়গায় ছোট বাচ্চারা এসে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ত, একটা কাক গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটা লক্ষ করল। তারপর যখন কেউ নেই তখন দেখা গেল কাকটা একটা টিনের কৌটা এনে সেই ঢালু জায়গায় ছেড়ে দিচ্ছে—সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবার

15.5 নং ছবি : ঈশপের সেই কাকের গল্প সত্যি হলেও অবাক হবার কিছু নেই

AMARBOI.COM

পর কাকটা আবার উপরে তুলে এনে ছেড়ে দিচ্ছে, টিনের কৌটাটা তখন আবার গড়িয়ে পড়ছে। হাত নেই বলে সেই কাক হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে পারে নি কিন্তু যারা দেখেছে তারা সেই আনন্দটুকু সত্যিই অনুভব করতে পেরেছে!

পাখিদের বুদ্ধিমত্তার যতগুলো উদাহরণ আছে তার মাঝে সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণটি তৈরি করেছে ল্যাবরেটরিতে পোষা একটি কাক, তার নাম হচ্ছে বেটি। বুদ্ধিমত্তার নানা পরীক্ষা করার কারণেই কী না কে জানে, বেটির বুদ্ধির কোনো তুলনা নেই। তার বুদ্ধির পরীক্ষা করার জন্যে একটা কাচের সরু গ্লাসের ভেতর আরেকটা কৌটা রাখা হলো, তার উপরে একটা আংটার মতো রয়েছে। গ্লাসটা একটু গভীর তাই কাক ঠোঁট দিয়ে আংটাটা নাগাল পায় না, নানাভাবে চেষ্টা করেও সে হাল ছেড়ে দিল না। খুঁজে পেতে এক টুকরো তার নিয়ে এসে সেটা মুখে লাগিয়ে আংটাটা টেনে তোলার চেষ্টা করল—কিন্তু সোজা তার আংটাতে আটকানো যায় না, চেষ্টা করে কোনো লাভ হলো না।

তখন বেটি নামের কাকটি যে কাজ করল সেটি অবিশ্বাস্য, তারটার এক মাথা এক জায়গায় আটকে চাপ দিয়ে সেই অংশটা বড়শির মতো বাঁকিয়ে ফেলল। তারপর ঠোঁট দিয়ে বড়শির মতো অংশটা নিচে নামিয়ে সেটা দিয়ে আংটাটা ধরে টেনে বের করে আনল! পুরো ঘটনার ভিডিওটা ইন্টারনেটে আছে, কেউ যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে সেটা নিজের চোখে দেখতে পারে।

আমরা সবাই কলসির তলায় একটুখানি পানি এবং তৃষ্ণার্ত কাকের সেই গল্পটি পড়েছি যেখানে তৃষ্ণার্ত কাক কলসির ভেতর পাথরের টুকরো ফেলে পানিটাকে উপরে নিয়ে এসে সেই পানি খেয়েছে। আমরা এতদিন জানতাম এটা ঈশপের কাল্পনিক গল্প।

এখন বিজ্ঞানীরা ভাবছেন এটা হয়তো কাল্পনিক গল্প নয়। ঈশপ হয়তো আসলেই এরকম কিছু একটা দেখেছিলেন!

AMARBOI.COM

16. স্কিতজোফ্রেনিয়া

শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটি সত্যি যে প্রতি একশত মানুষের মাঝে একজন স্কিতজোফ্রেনিয়াতে আক্রান্ত হয়। একজন মানুষ যখন তার শৈশব শেষ করে যৌবনে প্রবেশ করে সাধারণত তখন এটি দিয়ে আক্রান্ত হয়। পুরুষ আর মহিলারা প্রায় সমান সমানভাবে আক্রান্ত হলেও একজন পুরুষ সাধারণত আগে এবং আরো কঠিনভাবে আক্রান্ত হয়। স্কিতজোফ্রেনিয়া নামটি কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু সারা পৃথিবীতে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ এটিতে ভুগছে। স্কিতজোফ্রেনিয়া শব্দটির অর্থ খণ্ডিত মন, একজনের মনকে খণ্ডিত করে কখনো কখনো দ্বৈত ব্যক্তিত্ব দেখা যায়—এটি সেই বিষয় নয়। এখানে খণ্ডিত মন বলতে বোঝানো হচ্ছে বাস্তব জগৎ থেকে মনকে খণ্ডিত করে নিয়ে আসা, যেখানে চিন্তা ভাবনাগুলো হয় এলোমেলো, পরিচিত জগৎটাকে মনে হয় দুর্বোধ্য এবং অনুভূতিগুলো হয় সঙ্গতিহীন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমাকে প্রায় নিয়মিতভাবেই কোনো না কোনো ছাত্রছাত্রীর সাথে মুখোমুখি হতে হয় যাদের মানসিক জগৎটুকু অন্যরকম, প্রায় সময়েই তারা অজানা আতঙ্কে ভুগে, বিনা কারণেই গভীর বিষাদে ডুবে থাকে, নিদ্রাহীন যন্ত্রণাকাতর রাত কাটায়। কাউকে কাউকে শুধুমাত্র বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করা যায়, কাউকে কাউকে ডাক্তারের কাছে নিতে হয়,

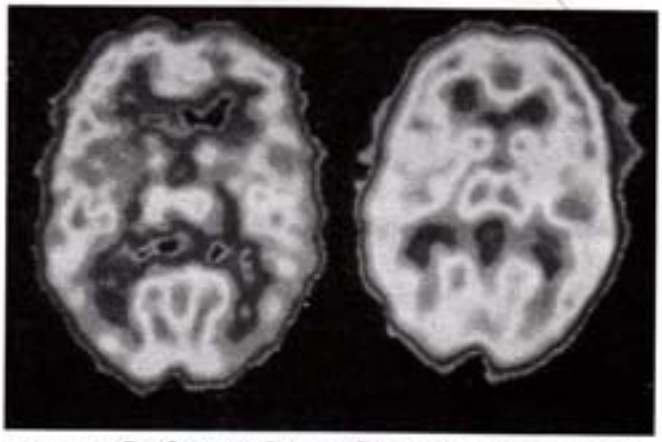

16.1 নং ছবি : স্কিতজোফ্রেনিয়ার রোগীদের মস্তিষ্কের পজিট্রন এমিশান টমগ্রাফির ছবি (ডান) সাধারণ মানুষের ছবি (বাম) থেকে ভিন্ন

AMARBOI.COM

মানসিক চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হয়। আমি নিশ্চিত, সাহস করে আমাদের কাছে আসে না কিন্তু ভেতরে ভেতরে গভীর মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে এরকম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব নয়। মানসিক বিষাদ, অস্থিরতা বা ডিপ্রেশন যদি সর্দি-কাশির সাথে তুলনা করি তাহলে স্কিতজোফ্রেনিয়া হচ্ছে ক্যান্সার বা এইডসের মতো ভয়াবহ একটা বিষয়।

এলোমেলো চিন্তার বিষয়টা একজন স্কিতজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত মানুষের কথা শুনলেই বোঝা যায়। তাদের কথাবার্তা হয় অসংলগ্ন, একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে কথার মাঝখানে তারা অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করতে পারে। এমন কী একটা বাক্যের মাঝখানেই আরেকটা বাক্য বলতে শুরু করে দেয়। সাধারণ মানুষের একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে যেটা আমরা সবাই জানি কিন্তু আলাদা করে ভেবে দেখি নি। একটা ভিড়ের মাঝে যখন অনেক মানুষ কথা বলছে তার মাঝেও আমরা একটা নির্দিষ্ট মানুষের সাথে কথা বলতে পারি কারণ আমাদের মস্তিষ্ক অসংখ্য মানুষের কথাবার্তার মাঝে থেকে শুধু নির্দিষ্ট মানুষের কথাটুকু বের করে আনতে পারে। দেখার মাঝেও সেটা হতে পারে, সামনে অনেক কিছু থাকলেও আমরা যেটা দেখতে পাই শুধু সেটার দিকে মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখতে পারি। যারা স্কিতজোফ্রেনিয়ায় ভুগে তারা অনেক সময় এটা করতে পারে না, নির্দিষ্ট একটা বিষয়ে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। তুচ্ছ একটা বিষয় তাদের মনোযোগ সরিয়ে নিতে পারে কাজেই তাদের চিন্তাগুলো হয়ে যায় পুরোপুরি অসংলগ্ন। আমরা যে রকম সহজে আমাদের চারপাশের ভুবনটুকু দেখতে পারি, শুনতে পারি বা অনুভব করতে পারি স্কিতজোফ্রেনিয়া সেরকম দেখতে, শুনতে বা অনুভব করতে পারে না। তাদের শুধু যেটুকু দেখা, শোনা বা অনুভব করার কথা তার বাইরেও আরো অনেক জঞ্জাল দেখতে হয়, শুনতে হয় বা অনুভব করতে হয়।

16.2 নং ছবি : স্কিতজোফ্রেনিয়া রোগীর আঁকা ছবিতেই তাদের মানসিক অবস্থাটি ফুটে ওঠে

স্কিতজোফ্রেনিকদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন অংশ সম্ভবত তাদের উপলব্ধির জগৎটুকু। চারপাশের অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় তথ্য তারা যে শুধু ছেঁকে সরাতে পারে না তাই নয় একই সাথে তারা অনেক কিছু দেখে বা শুনে যেটা আসলে নেই। অদৃশ্য কেউ হয়তো অনবরত তাদেরকে কিছু একটা বলতে থাকে, সেটি আরো ভয়ঙ্কর হয়ে যায় যখন সেই কণ্ঠস্বরটি তাকে নিষিদ্ধ কিছু করার জন্যে প্ররোচনা দিতে থাকে। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা কল্পনা করা

BARBOI.COM

কঠিন, আমরা মাঝে মাঝে যে দুঃস্বপ্ন দেখি এগুলো অনেকটা সেরকম। ঘুম থেকে জেগে উঠে আমরা সেই দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে পারি, যারা স্কিতজোফ্রেনিয়াতে ভোগে তারা কখনো সেটা থেকে মুক্তি পায় না কারণ তারা সেটা দেখে জেগে থাকতেই।

স্কিতজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তদের অনুভূতিগুলোও হয় বিচিত্র। কারো মৃত্যু সংবাদের মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা শুনে তারা হাসতে শুরু করে দিতে পারে, কোনো কারণ ছাড়াও তারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। আবার ঠিক তার উল্টোটাও ঘটতে পারে, জগৎ সংসারের আনন্দ-দুঃখ-বেদনার ঘটনাগুলো হয়তো তাদের স্পর্শ করে না। পুরোপুরি ঔদাসীন্যে তারা নিশ্চল হয়ে বসে থাকে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কেন স্কিতজোফ্রেনিয়া হয় সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেন নি। ধারণা করা হয় একটি মাত্র বিষয়কে এর জন্যে দায়ী করা যাবে না। কেউ কেউ হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনার চাপে রাতারাতি স্কিতজোফ্রেনিক হয়ে যায়, আবার অনেকের বেলায় সেটা ঘটে খুব ধীরে ধীরে। যদি হঠাৎ করে কেউ স্কিতজোফ্রেনিক হয়ে যায় তাহলে তার আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা বেশি, ধীরে ধীরে সেটা ঘটলে তার আরোগ্য লাভের সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে আসে। অনেক ধরনের ঘটনা বা পরিবেশের চাপে একজন মানুষ স্কিতজোফ্রেনিক হতে পারে কিন্তু ধারণা করা হয় তার মাঝে জেনিটিক ব্যাপারগুলোর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এরকম বিশ্বাসের পেছনে কারণ রয়েছে, আগেই বলা হয়েছে প্রতি একশ জনের ভেতরে একজন স্কিতজোফ্রেনিক হতে পারে কিন্তু পরিবারে বাবা-মা বা ভাইবোনদের স্কিতজোফ্রেনিয়া থাকলে সংখ্যাটি দশগুণ বেড়ে যায়, তখন দশ জনের ভেতর একজনের স্কিতজোফ্রেনিয়া হতে পারে। যদি দুজন ভাইবোন যমজ হয় (যারা দেখতে এক রকম) তখন তাদের জিনগুলো হয় শতভাগ এক রকম, তখন একজন স্কিতজোফ্রেনিক হলে অন্যজনের স্কিতজোফ্রেনিয়া হওয়ার আশঙ্কা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। শুধুমাত্র এই কারণ থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে নিশ্চয়ই আমাদের কোনো একটি জিন থাকে যেটি একজনকে স্কিতজোফ্রেনিক করে তুলতে পারে। বিজ্ঞানীরা সেই জিনটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু এখনো সেটি খুঁজে বের করতে পারেন নি।

16.3 নং ছবি : মানসিক হাসপাতালে স্ট্রেট জ্যাকেটে আবদ্ধ একজন স্কিতজোফ্রেনিয়ার রোগী

তবে যে ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যমজ ভাই বা যমজ বোনদের একজনের স্কিতজোফ্রেনিয়া থাকলে অন্যদের স্কিতজোফ্রেনিয়া হবার আশঙ্কা কিন্তু শতকরা একশ ভাগ নয়, এটি হচ্ছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। যদি স্কিতজোফ্রেনিয়া হবার আশঙ্কা শুধুমাত্র জেনিটিক হতো তাহলে যমজ ভাই বা বোনের একজনের স্কিতজোফ্রেনিয়া হলে অন্যজনেরও নিশ্চিতভাবে স্কিতজোফ্রেনিয়া হয়ে যেত। সেটি হয় না—তার থেকে আমরা ধারণা করতে পারি যে একজন মানুষের স্কিতজোফ্রেনিয়া হবার পেছনে তার পরিবেশ অনেকখানি দায়ী। সেই পরিবেশ একটি দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্ন বলে স্কিতজোফ্রেনিয়া হবার আশঙ্কাও এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্ন হতে পারে। আমাদের মতো দেশে খুব ভালো পরিসংখ্যান নেই, যেসব দেশে পরিসংখ্যান নেয়া হয় তাদের কিছু তথ্য 16.1 নং তালিকায় দেখানো হয়েছে, সেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো দেশের পরিবেশ নিশ্চিতভাবেই অন্য কোনো দেশ থেকে নাটকীয়ভাবে ভিন্ন।

তালিকা : 16.1

স্কিতজোফ্রেনিয়া হবার ঝুঁকি (শতকরা)

	পরিবারে একজনের স্কিতজোফ্রেনিয়া আছে	যমজ ভাই/বোনদের একজনের স্কিতজোফ্রেনিয়া আছে
জাপান	13	50
ডেনমার্ক	10	43
ফিনল্যান্ড	10	47
জার্মানি	10	65
যুক্তরাজ্য	4	42

AMARBOI.COM

জন্মগতভাবে স্কিতজোফ্রেনিয়া হবার কোনো একটি জিন নিয়ে বড় হবার সাথে সাথে চারপাশের পরিবেশ কোনো একজন মানুষকে এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় ঠেলে দিতে পারে। পরিবেশ দূষণ নিশ্চিতভাবেই তার জন্য অনেকাংশে দায়ী। যুক্তরাজ্যে একটা কথা প্রচলিত ছিল "হ্যাট নির্মাতার মতো পাগল" (Mad as a hatter), কারণ দেখা গিয়েছিল যারা হ্যাট তৈরি করে তাদের মাঝে এক ধরনের মানসিক রোগের জন্ম নেয়। আসল কারণটা বোঝা গেছে অনেক পরে, যখন জানা গেছে সেই হ্যাট নির্মাতারা ঠোঁট দিয়ে হ্যাটের কিনারাগুলো ভিজিয়ে নিত এবং সেখানে থাকত সিসা। কাজেই সিসা দিয়ে তাদের মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বিষাক্ত হয়ে যেত। কাজেই এটা হয়তো খুবই স্বাভাবিক যে আমাদের পরিবেশে

16.4 নং ছবি : এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডে যে ম্যাড হ্যাটারের গল্প আছে তার পেছনের কারণ হচ্ছে সিসার বিষক্রিয়া

কোনো বিষাক্ত পদার্থ ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজের অজান্তে আমরা সেগুলো গ্রহণ করে আমাদের ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝে ঠেলে দিচ্ছি।

স্কিতজোফ্রেনিয়া মানসিক সমস্যাগুলোর মাঝে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সমস্যা তাই সেটা নিয়ে গবেষণাও হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি বের হয়েছে যেটা দিয়ে বাইরে থেকেই মস্তিষ্কের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখা সম্ভব। দেখা গেছে একজন স্কিতজোফ্রেনিক মানুষ যখন অদৃশ্য কোনো মানুষের কণ্ঠ শোনে তখন তার মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশে তুমুল যজ্ঞদজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। স্কিতজোফ্রেনিক মানুষের মৃত্যুর পর তার মস্তিষ্কের টিস্যু বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে সেখানে বিশেষ এক ধরনের নিউরোট্রান্সমিটারের জন্যে গ্রাহকের সংখ্যা ক্ষেত্রবিশেষে প্রায় ছয় গুণ বেশি। এই নিউরোট্রান্সমিটারের প্রভাব কমিয়ে দেবার ওষুধ দিয়ে অনেক সময়েই স্কিতজোফ্রেনিয়া আক্রান্তদের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা আর অস্থিরতা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

16.5 নং ছবি : আজকাল স্কিতজোফ্রেনিয়া রোগীদের চিকিৎসার জন্যে অত্যন্ত কার্যকর ওষুধ বের হয়েছে

গর্ভবতী মায়েদের অসুখ-বিসুখের সাথেও স্কিতজোফ্রেনিয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়। গর্ভ ধারণের পর মায়েদের ফ্লু হলে সেটা কোনোভাবে সন্তানদের স্কিতজোফ্রেনিয়া হবার আশঙ্কাকে বাড়িয়ে দেয়। চারপাশের পরিবেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে জানলেও ঠিক বিশেষ ধরনের একটা ঘটনা বা সামাজিক অবস্থা এরকম একটি বৈকল্য ঘটিয়ে দিতে পারে সে ব্যাপারে কোনো বিজ্ঞানী এখনো একমত হন নি। ধারণা করা হয় সামগ্রিক একটা ব্যাপার এর জন্যে দায়ী, বিচ্ছিন্ন একটি বা দুটি বিষয় নয়।

আমাদের সবারই মাঝে মাঝে অকারণে মন খারাপ হয়। কখনো কখনো আমরা শুধু শুধু একজনকে কোনো কিছু নিয়ে সন্দেহ করি, কোনো কোনো সময় আমরা কিছু একটা বুঝতে ভুল করে ফেলি বা অসংলগ্ন কথা বলে ফেলি। কিন্তু আমরা কখনোই স্কিতজোফ্রেনিকদের ভয়ঙ্কর আতঙ্ক অনুভব করি না, কেউ একজন আমাদের খুন করে ফেলবে সেই ভয়ে অস্থির হয়ে যাই না বা অদৃশ্য কোনো মানুষ আমাদের সাথে কথা বলে না। কোনো দুঃসংবাদ শুনে আমরা আনন্দে অট্টহাসি শুরু করে দিই না। তাই দুর্ভাগা স্কিতজোফ্রেনিকদের জন্যে আমরা সবসময়েই গভীর এক ধরনের সমবেদনা অনুভব করি—বিজ্ঞানীরা তাই এই রহস্যময় বিষয়টি বোঝার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। একবার সেটি বুঝে গেলে হয়তো সেটি অপসারণ করা যাবে, সেটাই আমাদের আশা।

তথ্যসূত্র : Psychology David G. Myers

17. মনোবিজ্ঞানের বিখ্যাত কিছু পরীক্ষা

মানুষের মন বড় বিচিত্র একটা বিষয়—এটা বোঝা খুব সহজ নয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এটা প্রায় সময়েই "কমন সেন্স" দিয়ে বোঝা যায় না। যেমন ধরা যাক যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে একজন মানুষ আত্মহত্যা করার জন্যে সাততলা বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে আছে, আরেকজন মানুষ তাকে দেখতে পেলে কী করবে? বোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা হবে যে মানুষটি চেষ্টা করবে সাততলা বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটিকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করতে। 1981 সালে কিছু মনোবিজ্ঞানী এটা নিয়ে গবেষণা করে খুবই বিচিত্র একটা বিষয় আবিষ্কার করেছেন। তারা দেখেছেন যদি আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক মানুষটিকে দেখে শ'তিনেক মানুষ থেকে বেশি মানুষ ভিড় করে এবং যদি সময়টা সন্ধেবেলার দিকে হয় তাহলে সম্মিলিত মানুষ আত্মহত্যাটাকে থামানোর চেষ্টা করবে না। উল্টো সবাই মিলে লোকটাকে ছাদ থেকে লাফ দেবার জন্যে প্ররোচিত করতে থাকবে! আমি জানি ব্যাপারটাকে মোটেও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না—কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা এ ধরনের অনেকগুলো ঘটনা বিশ্লেষণ করে এটাই জানতে পেরেছেন! মানুষ এককভাবে একরকম ব্যবহার করে, যখন একসাথে অনেক মানুষ থাকে তখন হঠাৎ করে তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র পাল্টে সম্মিলিত মানুষের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা চরিত্র ফুটে ওঠে।

17.1 নং ছবি : স্ট্যানলি মিলগ্রাম এবং তার বিখ্যাত ইলেকট্রিক শক দেওয়ার যন্ত্র

মানুষের মন বোঝার জন্যে মনোবিজ্ঞানের বেশ কিছু চমকপ্রদ পরীক্ষা করা হয়েছে। 1956 সালে সলোমন এশের

AMARBOI.COM

এরকম একটা পরীক্ষা এখন খুব সুপরিচিত। পরীক্ষাটা খুবই সহজ, একটা কাগজে একটা সরলরেখা আঁকা হয়েছে, অন্য একটা কাগজে তিনটা সরলরেখা আঁকা হয়েছে, যার মাঝে একটা প্রথম কাগজে আঁকা রেখাটার সমান। যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করা হলে সে তিনটা রেখার মাঝে কোন রেখাটা প্রথম রেখাটার সমান সেটা খুব সহজেই বলে দিতে পারে। সলোমন এশ এবারে একটা মজার কাজ করলেন, তিনি আটজন মানুষের একটা ছোট দলকে এই কাজটি করতে দিলেন, তিনটি রেখার ভেতর থেকে সঠিক দৈর্ঘ্যের রেখাটি খুঁজে বের করতে হবে। আটজনের এই দলের মাঝে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, সাতজনই ছিল সলোমন এশের নিজের লোক, একজন ছিল খাঁটি এবং সে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে নি যে অন্যেরা এই বৈজ্ঞানিক "ষড়যন্ত্রের" সাথে যুক্ত। সলোমন এশের নির্দেশ অনুযায়ী সাতজন মানুষই ইচ্ছে করে একটা ভুল রেখাকে শনাক্ত করল, মজার ব্যাপার দেখা গেল যে খাঁটি মানুষটি ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে নিজেও ভুল রেখাটাকে শনাক্ত করছে। কোনটি সঠিক উত্তর হবে সে খুব ভালো করে জানে কিন্তু অন্য সাতজনের উত্তর শুনে সে ভুল উত্তরটাকেই সঠিক উত্তর ভাবতে শুরু করেছে! বৈজ্ঞানিক মহলে এটা ঐকমত্যের (conformity) পরীক্ষা নামে বিখ্যাত হয়ে আছে—তবে আমরা বহুদিন থেকে এটা জানি। আমাদের বাংলা ভাষায় এটা নিয়ে একটা বাগধারাও আছে, আমরা সেটাকে বলি, "দশচক্রে ভগবান ভূত!"

17.2 নং ছবি : স্ট্যানলি মিলগ্রামের পরীক্ষার্থীরা অন্যের আদেশে অনেক বড় অমানবিক কাজ করে ফেলত

মনোবিজ্ঞানের জগতে যে পরীক্ষাটি সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে আছে সেটার নাম স্ট্যানলি মিলগ্রামের পরীক্ষা। অনুমান করা হয় আজকাল এরকম পরীক্ষা আইনসঙ্গত মনে করা হবে না এবং কাউকে করতে দেয়া হবে না। তবে ষাটের দশকে (1963) মনোবিজ্ঞানী স্ট্যানলি মিলগ্রামের এটা করতে কোনো সমস্যা হয় নি। এই বিখ্যাত পরীক্ষাটি করা হয়েছে এভাবে : খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে ছাত্র এবং শিক্ষক সংক্রান্ত একটা পরীক্ষা করা হবে সে জন্যে স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। সেই বিজ্ঞাপন দেখে অনেকেই পরীক্ষায় অংশ নিতে এসেছেন। মনোবিজ্ঞানীরা প্রথমে তাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিলেন। পরীক্ষাটা করার জন্যে দুজন স্বেচ্ছাসেবক দরকার, তার মাঝে একজন হবে শিক্ষক অন্যজন হবে ছাত্র। দুজন স্বেচ্ছাসেবককে দিয়ে শুরু করা হলো এবং লটারি করে একজনকে শিক্ষক অন্যজনকে ছাত্রের দায়িত্ব দেয়া হলো, ছাত্রকে প্রথমে বেশ কিছু জোড়া শব্দ মুখস্থ করতে বলা হলো এবং তাকে বলা হলো জোড়া শব্দের প্রথম শব্দটি তাকে বলা হলে তাকে দ্বিতীয় শব্দটি বলতে হবে। সে যদি সঠিকভাবে বলতে না পারে তাকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। পরীক্ষার উদ্দেশ্য ইলেকট্রিক শক দিয়ে তাকে আরো দ্রুত শেখানো যায় কী না সেটা পরীক্ষা করা। ইলেকট্রিক শক দেওয়ার একটা যন্ত্রও আলাদাভাবে তৈরি করা আছে—এটা শুরু হয় 45 দিয়ে

AMARBOI.COM

এবং 15 ভোল্ট করে বাড়াতে বাড়াতে 450 ভোল্ট পর্যন্ত যাওয়া যায়। 45 ভোল্টের ইলেকট্রিক শক প্রায় বোঝাই যায় না কিন্তু সেটা বাড়তে বাড়তে যদি 450 ভোল্ট হয়ে যায় তাহলে সেটা ভয়াবহ—রীতিমতো মেরে ফেলার অবস্থা!

মনোবিজ্ঞানীরা গম্ভীরভাবে শিক্ষকের দায়িত্ব নেয়া স্বেচ্ছাসেবককে বলে দিলেন প্রতিবার ছাত্র একটা ভুল করবে ততবার তাকে ইলেকট্রিক শক দিতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকবার ভুল করার পর ইলেকট্রিক শকের মাত্রা 15 ভোল্ট করে বাড়িয়ে দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়, মনোবিজ্ঞানীরা বলে দিলেন, পরীক্ষাটা শুরু করার পর শেষ না করে কেউ উঠে যেতে পারবে না। ছাত্র এবং শিক্ষক দুজনেই রাজি হলো। ছাত্রটাকে তখন একটা ঘরে একটা চেয়ারে রীতিমতো বেঁধে ফেলা হলো। তার শরীরে ইলেকট্রিক তার লাগানো হলো ইলেকট্রিক শক দেওয়ার জন্য।

শিক্ষকে তখন অন্য একটা ঘরে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার যন্ত্রটাসহ বসানো হলো, যন্ত্রটা কীভাবে কাজ করে তাকে শেখানো হলো এবং 45 ভোল্টের একটা ছোট শক দিয়ে তাকে ইলেকট্রিক শক খেলে কেমন লাগে তার অনুভূতি দেওয়া হলো। তারপর মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষক এবং ছাত্রকেই পুরো পরীক্ষাটা শেষ করার নির্দেশ দিলেন, তাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন, পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী একবার শুরু করা হলে পুরো পরীক্ষা শেষ করতে হবে।

17.3 নং ছবি : স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জেলখানার কয়েদি এবং গার্ডের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ছাত্ররা সত্যি সত্যি নিজেদের সেটা ভাবতে শুরু করে

পরীক্ষা শুরু হলো। শিক্ষকের দায়িত্ব পাওয়া স্বেচ্ছাসেবক একটা করে শব্দ উচ্চারণ করেন এবং ছাত্রের দায়িত্ব পাওয়া স্বেচ্ছাসেবক তার জোড় শব্দটি বলেন। যদি উত্তর সঠিক হয় তাহলে ভালো কিন্তু যখনই উত্তরটা ভুল হয় তখনই ছাত্রকে একটা ইলেকট্রিক শক দিয়ে ভোল্টেজের মাত্রাটা বাড়িয়ে দেয়া হয়। প্রথম দিকে কাজটা সহজ ছিল কিন্তু যখন ছাত্র একটু পরে পরে ভুল করতে লাগল তখন ভোল্টেজের মাত্রা বেড়ে যেতে লাগল এবং ইলেকট্রিক শক খেয়ে যন্ত্রণায় ছাত্রটা গগনবিদারি চিৎকার করতে থাকে। রীতিমতো অমানুষিক ব্যাপার—শিক্ষকের দায়িত্ব পাওয়া স্বেচ্ছাসেবক এই ভয়ঙ্কর অমানবিক পরীক্ষা বন্ধ করার অনুমিত চাইল কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা রাজি হলেন না। শিক্ষকের দায়িত্ব

AMARBOI.COM

পাওয়া স্বেচ্ছাসেবক একেবারে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাটা চালিয়ে গেলেন, শেষের দিকে ভোল্টেজ এত বেড়ে গেল যে ইলেকট্রিক শক খেয়ে "ছাত্র" বেচারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল কিন্তু তবু তার মুক্তি নেই!

এই ছিল বিখ্যাত স্ট্যানলি মিলগ্রামের বিখ্যাত পরীক্ষা এবং যারা এটা পড়ছেন তারা নিশ্চয়ই ভাবছেন বিজ্ঞানী হয়ে কেমন করে এরকম অমানবিক একটা পরীক্ষা করতে পারলেন? পরীক্ষাটা আসলেই ভয়ঙ্কর অমানবিক একটা পরীক্ষা হতো যদি না পুরো ব্যাপারটা আসলে একটা সাজানো নাটক হতো। এই পুরো পরীক্ষাটাই সাজানো, প্রকৃতপক্ষে শক দেওয়ার যন্ত্রটি মোটেও ইলেকট্রিক শক দেয় না, ছাত্রকে কখনোই শক দেয়া হয় নি, সে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার ভান করে গগনবিদারি চিৎকার করেছে। শিক্ষকের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক কখনোই অনুমান করতে পারে নি যে লটারি করে তাকে শিক্ষক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে সেটাও ছিল সাজানো। মূল পরীক্ষাটা মোটেও ছাত্র-শিক্ষক এবং শেখার ব্যাপার নয়। মূল পরীক্ষাটা ছিল ধোপদুরস্ত বৈজ্ঞানিকের চেহারার মানুষ একজন সাধারণ মানুষকে কোনো আদেশ দিলে তারা সেই আদেশ কতটুকু মানে। অন্য একজনকে নির্মম যন্ত্রণা দেওয়ার আদেশ তারা মানতে রাজি হয় কী না। স্ট্যানলি মিলগ্রাম দেখিয়েছেন সাধারণ মানুষ একটা অন্যায় আদেশ দেয়া হলে সেটা না মানার মনোবল বা দৃঢ়তা দেখাতে পারে না। যুদ্ধে সাধারণ সৈনিকেরা যে অবলীলায় সাধারণ মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে, তার কারণটাও আসলে এর মাঝে লুকিয়ে রয়েছে। এই সত্যটা জানে বলেই সেনাবাহিনীতে সাধারণ সেনাবাহিনীকে কোনো প্রশ্ন না করে তাদের উপরের অফিসারের আদেশ মেনে নেয়া শেখানো সম্ভব হয়।

স্ট্যানলি মিলগ্রামের পরীক্ষা ছিল এক ধরনের মানসিক চাপের পরীক্ষা। মনে হচ্ছিল কোনো কোনো মানুষ শারীরিক যন্ত্রণা পাচ্ছে কিন্তু আসলে সেটা ছিল অভিনয়। কিন্তু এখন যে পরীক্ষাটার কথা বলা হবে সেটা সবাই জানত অভিনয় কিন্তু তার ফলে যে যন্ত্রণার জন্ম হয়েছিল সেটা ছিল পুরোপুরি বাস্তব। এই পরীক্ষাটা করেছিলেন ফিলিপ জিমবার্ডো, 1973 সালে প্রথমে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির 24 জন আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্রকে

17.4 নং ছবি : ইরাকের আবু গারিব জেলখানায় আমেরিকান পুরুষ ও নারী সৈনিকেরা কয়েদিদের উপর যে অমানবিক আচরণ করেছিল তার তুলনা পাওয়া কঠিন

AMARBOI.COM

বেছে নেয়া হলো। যাদেরকে বেছে নেয়া হলো তারা সবাই শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ এবং সবল। তারপর লটারি করে তাদের অর্ধেককে তৈরি করা হলো গার্ড বাকি অর্ধেক হলো কয়েদি। গার্ডদের দেয়া হলো গার্ডের পোশাক, কয়েদিদের কয়েদির পোশাক এবং পায়ে শিকল। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞান বিভাগের নিচে একটা বেসমেন্টকে তৈরি করা হলো একটা জেলখানা তারপর কয়েদিদের জেলখানায় পুরে গার্ডদের বলা হলো পাহারা দিতে। তাদেরকে দুই সপ্তাহ কয়েদি এবং গার্ড হিসেবে থাকতে হবে। এবং মনোবিজ্ঞানীরা তাদের পরীক্ষা করে দেখবেন। কমবয়সী আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্ররা সানন্দে রাজি হয়ে গেল।

মাত্র ছয়দিন পর এই পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে হলো কারণ দেখতে দেখতে গার্ডের ভূমিকায় থাকা ছেলেগুলো হয়ে উঠল নিষ্ঠুর, কয়েদির ভূমিকায় থাকা ছেলেগুলো হয়ে গেল অসহায়। সেই নিষ্ঠুর ছেলেগুলো অসহায় কয়েদিদের গালিগালাজ, অপমান, উলঙ্গ করে অত্যাচার এরকম ভয়ানক নির্যাতন শুরু করল যে কয়েদিরা মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়ল। পুরো বিষয়টা ছিল এক ধরনের অভিনয় কিন্তু দেখতে দেখতে সেটি বাস্তব হয়ে গেল। গার্ডের ভূমিকা পাওয়া ছেলেগুলো মনে করতে লাগল তারা সত্যিই বুঝি নিষ্ঠুর গার্ড। কয়েদির ভূমিকা পাওয়া ছেলেগুলো মনে করতে লাগল তারা সত্যিই বুঝি অসহায় কয়েদি, তারা প্রতিবাদ করতেই আর সাহস পেল না!

ল্যাবরেটরিতে করা এই পরীক্ষটার ত্রিশ বছর পর সারা পৃথিবীর মানুষ ইরাকের আবু গারিব জেলখানার ঘটনাটা জানতে পেরেছিল, যেখানে আমেরিকার নারী এবং পুরুষ গার্ডেরা ইরাকি কয়েদিদের উপর অমানুষিক একটা নির্যাতন চালিয়েছিল। মনোবিজ্ঞানের বইয়ে আবু গারিব জেলখানার ঘটনা এখন ফিলিপ জিমবার্ডোর সাড়া জাগানো পরীক্ষার বাস্তব রূপ বলে ধরে নেয়া হয়।

AMARBOI.COM

17.5 নং ছবি : বেহালাবাদক জশুয়া বেল, মেট্রোতে বেহালা বাজিয়ে পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করছেন

যে পরীক্ষাটার কথা বলে শেষ করা হবে সেটা আসলে মনোবিজ্ঞানীদের কোনো পরীক্ষা নয় কিন্তু বহুল আলোচিত একটা ঘটনা, যেটা মানুষের মনোজগতের একটা বিশেষ দিকে উঁকি দেয়। ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন জশুয়া বেল নামে পৃথিবীর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক। 2007

সালের 7 এপ্রিল তিনি জীর্ণ-শীর্ণ পোশাক পরে একটা বেহালা নিয়ে ওয়াশিংটন ডি.সি.র পাতাল ট্রেনের একটা স্টেশনের গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বেহালার বাক্সটা সামনে খুলে রেখে তিনি বেহালা বাজাতে লাগলেন, সেই দেশের দরিদ্র ভিখারিরা যেভাবে ভিক্ষা করে সেভাবে। তিনি যেই বেহালটি বাজাচ্ছিলেন সেটি ছিল অত্যন্ত মূল্যবান একটা বেহালা এবং বেহালায় তিনি যে সুর তুলছিলেন সেই সুর শোনার জন্যে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ হাজার হাজার ডলার খরচ করে তার অনুষ্ঠানে যায়।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজালেন, কেউ তার দিকে ঘুরেও তাকাল না। ভিক্ষে যেটুকু পেলেন সেটি না পাওয়ার মতোই। কেউ তাকে চিনল না এবং হাজার হাজার মানুষ ব্যস্তভাবে ট্রেন ধরতে কিংবা ট্রেন থেকে নেমে ছুটে গেল, কেউ তার বেহালার সুর শোনার জন্যে থমকে দাঁড়াল না।

থমকে দাঁড়াল শুধু শিশুরা—তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে সেই অপূর্ব বেহালার সুর শুনতে চাইছিল। মায়েরা তাদের সেটা শুনতে দেয় নি, স্টেশনে ছেঁড়া কাপড় পরা এক ভিখিরির বেহালা শোনার তাদের সময় নেই, মায়েরা তাদের সন্তানদের টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

তার পরেও আমরা কী শিশুদের বিচারবুদ্ধিকে অবহেলা করব?

AMARBOI.COM

18. পশু মানব

বেশ কয়েক বছর আগে আমি সিলেট থেকে ঢাকা আসার জন্যে রেল স্টেশনে গিয়েছি। সময়টা শীতকাল এবং সম্ভবত তখন কোনো একটা শৈত্যপ্রবাহ চলছে। কুয়াশা ঢাকা ঘোলাটে সূর্যে কোনো উত্তাপ নেই, সারাদেশ শীতের দাপটে জবুথবু হয়ে আছে। আমি সোয়েটার, জ্যাকেট এবং গলায় মাফলার জড়িয়েও শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি। তখন আমি একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখতে পেলাম, তিন-চার বছরের একটি বাচ্চা সম্পূর্ণ উদোম গায়ে রেললাইনের উপর খেলছে, তার শরীরে একটা সুতোও নেই। এই প্রচণ্ড শীতে যখন প্রতিটি মানুষ জাব্বাজোব্বা জড়িয়েও শীত থেকে রেহাই পাচ্ছে না তখন এই শিশুটি প্রচণ্ড শীতের বাতাসে কেমন করে নির্বিকারভাবে উদোম শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটি একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

AMARBOI.COM

18.1 নং ছবি : গ্রিক উপাখ্যানে রমুলাস এবং রিমাসের নেকড়ে বাঘের কাছে বড় হওয়ার কাহিনী আছে

একটা শিশুকে কতদিন না খাইয়ে রাখা যায়, কিংবা কত কম তাপমাত্রায় একটা শিশু বেঁচে থাকতে পারে বা কত কম বাতাসে একটা শিশু নিশ্বাস নিতে পারে এই ধরনের প্রশ্ন মানুষের মাথায় ঘুরপাক খেলেও কোনো মানুষ কখনোই কোনো পরীক্ষা করে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করার চেষ্টা করে নি। (নাৎসি ডাক্তার ম্যাঙ্গেলাকে আমি মানুষ হিসেবে বিবেচনা করি না।) কিন্তু মাঝে মাঝেই লোকচক্ষুর আড়ালে বড়

হওয়া কোনো অপ্রকৃতস্থ পিতামাতার সন্তান, বড় দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কোনো শিশু কিংবা ভূমিকম্পে আটকে পড়া কোনো নবজাতকদের দেখে বিজ্ঞানীরা মানব শিশু সম্পর্কে কিছু বিচিত্র তথ্য পেয়ে যান। সিলেট রেল স্টেশনের উদোম গায়ের শিশুটি ছিল একজন অপ্রকৃতস্থ মায়ের সন্তান, অবহেলায় বড় হওয়া সেই শিশুটিকে দেখে আমি অনুমান করেছিলাম একটা শিশুকে জন্মের পর থেকেই অভ্যাস করানো হলে সে নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর শীতেও উদোম গায়ে থাকতে পারে।

তবে মানুষ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে বনের পশুর কাছে বড় হওয়া কিছু শিশুদের কাছ থেকে। ইতিহাসে এ রকম অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে, সবচেয়ে বিখ্যাতটি সম্ভবত গ্রিক উপাখ্যানের রমুলাস এবং রিমাসের কাহিনী। এই দুইজন যমজ ভাইকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কিন্তু নিষ্পাপ শিশু দুটিকে হত্যা না করে তাদেরকে একটা ঝুড়িতে করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত একটি নেকড়ে মা তাদের দুধ খাইয়ে বড় করে। রমুলাস শেষ পর্যন্ত রোমে রাজত্ব করেছিল এবং তার নামানুসারেই রোমের নামকরণ করা হয়েছিল।

18.2 নং ছবি : বনের পশুর কাছে বড় হওয়া শিশু ভিক্টর

গ্রিক উপাখ্যানের এই কাহিনীটি চমকপ্রদ কিন্তু এখন আমরা জানি এটি পুরোপুরি সত্যি হতে পারে না। মানুষ কীভাবে মানুষ হয়ে ওঠে সেটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের অনেক কৌতূহল। তারা এখন জানেন যে মানুষের বয়স যখন এক লক্ষ বিশ হাজার হলেও কথা বলার জন্যে পরিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতে পারে এ রকম আধুনিক মানুষ তুলনামূলকভাবে অনেক নতুন, মাত্র চল্লিশ হাজার বছর। ভাষা ব্যবহার করা বা একজনের সাথে আরেকজনের ভাব বিনিময়ের এই প্রক্রিয়াটা মানুষ কেমন করে শিখেছে সেটা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। যে কোনো পরিবেশেই মানুষ কী ভাষা ব্যবহার করতে পারে নাকি এটা মানুষকে সামাজিক পরিবেশে রাখলেই সে ভাষা শিখতে পারে সেটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে এক ধরনের কৌতূহল ছিল। পশুদের কাছে বড় হওয়া শিশুদের থেকে বিজ্ঞানীরা জানেন, ভাষা বা ভাব বিনিময়ের প্রক্রিয়াটা শেখার জন্যে সামাজিক পরিবেশ বা মানুষের সাহচর্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। সত্যি কথা বলতে কী ভাষা শেখার জন্যে শিশুদের যে ছোট একটা সময় রয়েছে কোনোভাবে সেই সময়টুকু যদি ব্যবহার করতে না পারে তাহলে পরে যত চেষ্টাই করা যাক না কেন তারা আর ভাষাটুকু শিখতে পারে না।

পশুর কাছে বড় হওয়া মানব শিশুর অনেকগুলো ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকলেও সেগুলো যে সবই বিশ্বাসযোগ্য তা নয়। এই বিষয়গুলো নিয়ে মানুষের এত কৌতূহল যে সেটা ব্যবহার করে অনেকেই গাঁজাখুরি গল্প ফেঁদে রেখেছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ এ রকম সবচেয়ে

পুরনো এবং বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাটি ঘটেছে জার্মানির হেমেলিন শহরে 1724 সালে। সেই শহরের মানুষেরা অবাক হয়ে একদিন দেখে কালো চুল বাদামি রঙের একটি বিচিত্র উলঙ্গ কিশোর মাঠেঘাটে ছোটাছুটি করছে। তাকে যখন ধরে আনা হলো শহরের মানুষ আবিষ্কার করল, কিশোরটি পুরোপুরি বুনো স্বভাবের, জ্যান্ত পাখি কাঁচা খেয়ে ফেলে। এ রকম বিচিত্র একটি প্রাণী—কাজেই প্রাচীনকালে যা ঘটার কথা তাই ঘটল, ইংল্যান্ডের রাজা জর্জ ওয়ান তাকে তার প্রাসাদে একটা সংগ্রহ হিসেবে রেখে দিলেন। পিটার নাম দেয়া সেই কিশোরটি বাকি জীবনটা সেখানেই কাটাতে হলো। দীর্ঘ ষাট বৎসরে সে কোনো কথা বলতে শিখে নি, কখনো সে হাসে নি!

পরের ঘটনাটি ঘটেছে ফ্রান্সের দক্ষিণে 1799 সালে। খুব শীত পড়েছে, খাবারের খুব অভাব, পেটের খিদেয় বন থেকে লোকালয়ে একটা বন্য ছেলে এসে হাজির। তাকে ধরে আবিষ্কার করা হলো ছেলেটির আচার-ব্যবহার পুরোপুরি জন্তুর মতো। বরফের মাঝে সে গড়াগড়ি খেতে পারে, তার ঠাণ্ডা লাগে না। অবলীলায় কাঁচা কিংবা পচা খাবার খেয়ে ফেলতে পারে। একজন মানুষ আর পশুর মাঝে পার্থক্য কী সেটা নিয়ে তখন অনেক বিতর্ক চলছে ঠিক তখন এই কিশোরটি মানুষের হাতে ধরা পড়েছে। বিশ্বাস করা হতো সহমর্মিতা আর ভাষা শেখার ক্ষমতা হচ্ছে মানুষ হওয়ার প্রথম শর্ত, কাজেই বনে পশুদের মাঝে বড় হওয়া এই কিশোরটি তখন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিশোরটির নাম দেয়া হলো ভিক্টর আর অনেক

18.3 নং ছবি : ভারতের মেদেনীপুরে আমলা ও কমলা নামে দুটি শিশু নেকড়ের কাছে বড় হয়েছিল

বড় বড় বিজ্ঞানীরা তার ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। জাঁ মার্ক গাসপার্ড ইটার্ড নামে একজন ডাক্তার ভিক্টরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে তাকে বড় করেছিলেন, কিন্তু অনেক

AMARBOI.COM

চেষ্টা করেও তাকে কোনো ভাষা শেখানো যায় নি, "দুধ" শব্দটা ছাড়া আর কোনো শব্দ সে উচ্চারণ করতে শিখে নি। ভিক্টরের ভেতর সত্যিকার অর্থে আবেগ বা সহমর্মিতার সে রকম বিকাশ না ঘটলেও স্বামীহারা একজনকে কাঁদতে দেখে তাকে একবার বিচলিত হতে দেখা গিয়েছিল। ভিক্টর 40 বছর বয়সে প্যারিসে মারা যায়।

18.4 নং ছবি : অতি সম্প্রতি জন সেবুনিয়া নামে বানরের কাছে পালিত হওয়া একটি মানব শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে

পশুর কাছে বড় হওয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটেছিল ভারতবর্ষের মেদেনীপুর এলাকাতে। 1920 সালে একটা নেকড়ে মাতার কাছে দুটি বাচ্চা মেয়েকে পাওয়া যায়। নেকড়েটিকে মেরে ফেলে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে আসা হলো জোসেফ অমৃত লাল সিং নামে একজন ধর্ম যাজকের কাছে। বাচ্চা দুটির বয়স আট বছর এবং দেড় বছর, বড়জনের নাম রাখা হলো কমলা ছোটজনের অমলা। তাদেরকে যখন ধরে আনা হয় তখন তারা হাত এবং পা ব্যবহার করে চতুষ্পদ প্রাণীর মতো ছুটে বেড়ায়, সারাদিন অন্ধকার কোনায় ঘুমিয়ে থেকে রাতের বেলা জেগে ওঠে। গভীর রাতে তারা নেকড়ে বাঘের মতো চিৎকার করত। রান্না করা খাবার খেতে চাইত না, পছন্দ করত কাঁচা মাংস। তাদের ঠাণ্ডা বা গরমের অনুভূতি ছিল না এবং কখনোই বিন্দুমাত্র অনুভূতি প্রকাশ করত না। তাদের একমাত্র যে অনুভূতিটি বোঝা যেত সেটি হচ্ছে ভয়। তাদের ঘ্রাণশক্তি ছিল প্রবল এবং রাতের বেলায় তারা খুব ভালো দেখতে পেত।

অমলা নামের ছোট শিশুটি বছর খানেকের মাঝে কিডনির জটিলতায় মারা যায়। বড়জন আরো নয় বছর বেঁচেছিল।

এই ধরনের অন্যান্য শিশুর মতোই এই বাচ্চাগুলোও সত্যিকার অর্থে কোনো ভাষা শিখতে পারে নি। অনেক চেষ্টায় শেষে কমলাকে কাপড় পরানো শেখানো হয়েছিল। পশুর মতো চার হাত-পায়ে ছোটাছুটি করাই তার জন্যে স্বাভাবিক ছিল। অনেক কষ্ট করে তাকে দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখানো হয়েছিল, যদিও কোথাও দ্রুত যেতে হলে সে চারপায়ে ছুটে যেত।

সবচেয়ে সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য (এবং বিশ্বাসযোগ্য) ঘটনাটি ঘটেছে উগান্ডায় 1991 সালে। মিলি নামে একটা মেয়ে বনের ভেতর হঠাৎ করে একটা মানবশিশুকে বানরদের সাথে দেখতে পেল। গ্রামে এসে সে অন্যদের খবরটা দেয়ার পর গ্রামবাসী সদলবলে গেল বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে। বাচ্চাটি এবং অন্যান্য বানরেরা প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেও মানুষেরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসে। তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে খোঁজ নিয়ে জানা গেল শিশুটির নাম জন সেবুনিয়া। তার যখন বয়স চার বৎসর তখন এক রাতে তার বাবা তার মা'কে গুলি করে মেরে ফেলে, সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে সে বনের ভেতর পালিয়ে যায়। এরপর বনের ভেতর সে বানরদের সাথে সাত বছর কাটিয়ে দিয়েছিল।

AMARBOI.COM

অন্যদের মতো জন সেবুনিয়া প্রথম প্রথম কথা বলতে পারত না, কিন্তু চেষ্টা করার পর সে বেশ খানিকটা কথা বলতে শিখেছিল। অনুমান করা হয় জীবনের প্রথম চার বৎসর মানুষের সাথে থাকার কারণে সে কথা বলতে শিখেছিল।

পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এই ঘটনাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন—তারা সবসময়েই চট করে এই ঘটনাগুলো বিশ্বাস করতে চান না। অনেকেরই ধারণা এই ঘটনাগুলো অতিরঞ্জিত, বাচ্চাগুলো আসলে কোনো পশু লালনপালন করে বড় করে নি। বাচ্চাগুলো সম্ভবত মানসিক প্রতিবন্ধী কিংবা অটিস্টিক। কাজেই তাদের আচার-আচরণ আসলে পশু দিয়ে লালিত হবার আচরণ নয় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বা অটিস্টিক শিশুদের আচরণ।

18.5 নং ছবি: চিড়িয়াখানায় পড়ে আহত হওয়া একটা শিশুকে গরিলা মাতা পরম মমতায় আশ্রয় কোলে নিয়ে বসে আছে

AMARBOI.COM

অনেকেই সন্দেহ করেন আসলেই পশুরা সত্যি সত্যি কোনো মানবশিশুকে লালন করতে আগ্রহী কিংবা সক্ষম কি না। পশুরা মানুষের মতো সহমর্মিতা বা স্নেহ-মমতা দেখাতে পারে কি না এটা নিয়ে অনেকের ভেতরেই একধরনের সন্দেহ ছিল।

তবে ১৯৯৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের একটি চিড়িয়াখানায় বিচিত্র ঘটনা সবাইকে নূতন করে ভাবতে শিখিয়েছিল। সাড়ে তিন বছরের একটা বাচ্চা সেই চিড়িয়াখানার গরিলাদের জন্যে সংরক্ষিত জায়গায় উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

চিড়িয়াখানার কর্মীরা যখন শিশুটিকে উদ্ধার করার জন্যে ছোটাছুটি করছে তখন তারা সবিস্ময়ে দেখল সেখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহিলা গরিলাটি এসে বাচ্চাটিকে খুব সাবধানে

কোলে তুলে নিয়ে এক কোনায় গিয়ে বসে থাকে। উদ্ধারকারীরা এসে শিশুটিকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত গরিলা মাতাটি এই শিশুটিকে নিজের সন্তানের মতো পরম মমতায় কোলে নিয়ে বসেছিল।

আমরা মানুষ এবং পশুকে খুব স্পষ্টভাবে বিভাজন করে রাখি—কিন্তু ভালোবাসা এবং মমতার জগতে অনেক জায়গাতেই সেই বিভাজনের দাগটি অস্পষ্ট, পার্থক্যটুকু অনেক সময়ই মিলিয়ে যায়।

AMARBOI.COM

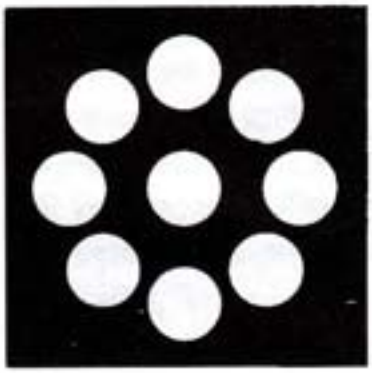

19. সলিটন

প্রায় দেড়শ' বছর আগে জন স্কট রাসেল নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার এডিনবার্গে একটা খালের নৌকার একটা ডিজাইন নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। সরু খালের ভেতর দিয়ে নৌকাটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দুটি ঘোড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে দড়িটা ছিঁড়ে গেল। নৌকাটা সাথে সাথে থেমে গেল কিন্তু তখন অত্যন্ত বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটল। নৌকার সামনে জমে থাকা জলরাশি থেকে অত্যন্ত বিচিত্র ধরনের একটা ঢেউ প্রচণ্ড বেগে সামনের দিকে ছুটে যেতে থাকে।

19.1 নং ছবি : জন স্কট রাসেল নামের একজন ইঞ্জিনিয়ার প্রথম সলিটনটি দেখেছিলেন

এটাকে ঢেউ বলা ঠিক নয় কারণ ঢেউ উপরে উঠে আর নিচে নামে কিন্তু এখানে কোনো কিছু নিচে নামছে না। খানিকটা পানি উঁচু হয়ে সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, পানির ঢেউয়ের বেগ কত হতে পারে সেটা সম্পর্কে সবারই একটা ধারণা আছে। পুকুরে ঢিল মারলে ঢেউটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে, সেটাই হচ্ছে ঢেউয়ের বেগ কিন্তু এখানে উঁচু হয়ে থাকা জলরাশি ছুটে যাচ্ছে ঘণ্টায় প্রায় দশ মাইল বেগে। বিস্মিত এবং কৌতূহলী ইঞ্জিনিয়ার স্কট রাসেল একটা ঘোড়ায় চড়ে সেই বিচিত্র ঢেউয়ের পিছু পিছু ছুটে চললেন এবং তার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয়টা আবিষ্কার করলেন। একটা ঢেউ যখন ছুটে যেতে থাকে তখন ছুটে যেতে যেতে সেটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞানে এর একটা গালভরা নাম আছে—ডিসপার্সান, কিন্তু এই বিচিত্র ঢেউটির কোনো ডিসপার্সান নেই। এটা যে রূপ নিয়ে তৈরি হয়েছিল হুবহু সেই রূপ নিয়ে ছুটে যেতে থাকল, এটা ছড়িয়ে গেল না, ভেঙে গেল না কিংবা থেমে গেল না। বিস্মিত

AMARBOI.COM

স্কট রাসেল মাইল দুয়েক এর পিছনে ছুটে গেলেন কিন্তু আঁকাবাঁকা খালের তীর দিয়ে বেশি দূর ছুটে যেতে পারলেন না। হতবাক ইঞ্জিনিয়ার স্কট রাসেল এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না—কিন্তু একজন খাঁটি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের যেটা করা উচিত সেটাই করলেন। বাসার পেছনে ত্রিশ ফুট লম্বা পানির একটা চৌবাচ্চা তৈরি করে সেটা নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিলেন। তিনি এটার নাম দিলেন সলিটারি ওয়েভ বা একাকী তরঙ্গ। তার গবেষণার ফলাফল জার্নালে প্রকাশ করলেন এবং বিজ্ঞানে যা হয় তাই হলো, কেউ সেটাকে কোনো গুরুত্ব দিল না। স্কট রাসেলকে বিজ্ঞানী মহল মনে রাখল তার অন্য কাজের জন্যে একাকী তরঙ্গের জন্য নয়।

তারপর একশ' বিশ বছর কেটে গেল, 1960-এর দশকে বিজ্ঞানীদের হাতে শক্তিশালী কম্পিউটার এসেছে, তারা সেটা দিয়ে নন-লিনিয়ার মাধ্যমে তরঙ্গের প্রবাহ নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন এবং হঠাৎ করে তারা আবার নূতন করে স্কট রাসেলের একাকী তরঙ্গকে আবিষ্কার করলেন, এর নাম দেয়া হলো সলিটন এবং বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন আমাদের চারপাশের জগতের সবকিছুতে ছড়িয়ে আছে সলিটন। তরল পদার্থের প্রবাহ থেকে আলোকবিদ্যা, প্লাজমা থেকে শক ওয়েভ, টর্নেডো থেকে বৃহস্পতি গ্রহের লাল দাগ, বস্তু জগতের কণা থেকে প্রোটিনের সংবেদনশীলতা, সুনামী থেকে টেলি যোগাযোগ—মোটা কথায় এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে সলিটন নেই। বলা যেতে পারে বর্তমানে বিজ্ঞানের জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর একটা হচ্ছে সলিটন।

সলিটনের গতি প্রকৃতি বোঝার জন্যে আমাদের কিছু পারশিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান সমাধান করতে হয়, আমরা সেই পথে এগুব না। ব্যাপারটা কেমন করে ঘটে সেটা তরঙ্গের স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বোঝার চেষ্টা করব। আমাদের খুব পরিচিত তরঙ্গ হচ্ছে আলো এবং সেই আলো থেকে তৈরি রংধনু সবাই দেখেছে। বৃষ্টি হবার পর হঠাৎ করে যদি রোদ ওঠে তাহলে আমি সবসময় বাইরে ছুটে যাই রংধনু দেখার জন্যে এবং অবধারিতভাবে রংধনু দেখতে পাই। তখন আকাশে পানির বিন্দুগুলো থাকে এবং সূর্যের আলো সেই পানির ভেতর প্রতিফলিত হয়ে বের হয়ে আসার সময় তার রংগুলোতে ভাগ হয়ে যায় (19.3 নং ছবি)। আলোর ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে

19.2 নং ছবি : বৃহস্পতি গ্রহের লাল দাগটিকেও সলিটন বলে ভাবা হয়

AMARBOI.COM

আমরা আসলে ভিন্ন ভিন্ন রং হিসেবে দেখি। তাই আমরা মোটামুটি বৈজ্ঞানিক ভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি আলোর প্রতিসরাঙ্ক নির্ভর করে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপরে, তাই একটা মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যাবার সময় কোন আলো কতটুকু বেঁকে যাবে সেটা নির্ভর করে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত। আলোর এই বাঁকা হয়ে যাবার কারণে আমরা রংধনু দেখি, প্রিজমে রং ভাগ হয়ে যেতে দেখি। কিন্তু সেটা না করে আমরা যদি একটা আলোকে একটা মাধ্যমের ভেতর দিয়ে সোজা সামনের দিকে যেতে দিই তাহলে কী দেখব?

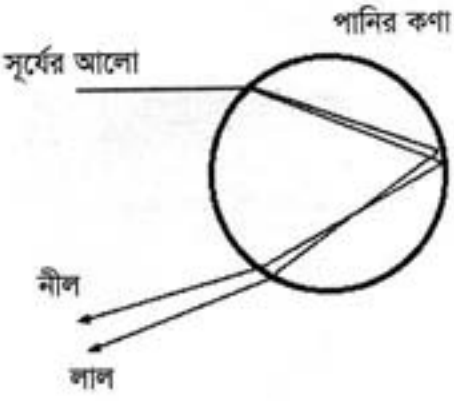

19.3 নং ছবি : পানির কণাতে প্রতিফলিত এবং প্রতিসরিত হয়ে সূর্যের আলো তার রংগুলোতে ভাগ হয়ে যায়

যেহেতু একেক রঙের আলোর জন্যে প্রতিসরাঙ্কের মান একেক রকম তাই আমরা দেখব একেকটি রং একেক গতিতে যাচ্ছে। শুরুতে সবগুলো রং একই সাথে থাকলেও এটা আসলে আলাদা হয়ে যাবে, যেই আলোর সংকেতটা ছিল সরু সেটা ছড়িয়ে পড়বে। এটা হচ্ছে তরঙ্গের ধর্ম এবং সব তরঙ্গে আমরা এটা হতে দেখি (19.4 নং ছবি)। সলিটনে এটা ঘটে না তাই বিজ্ঞানীরা এত অবাক হয়েছিলেন। যে কারণে সেটা ঘটে না সেটাও কম চমকপ্রদ নয়।

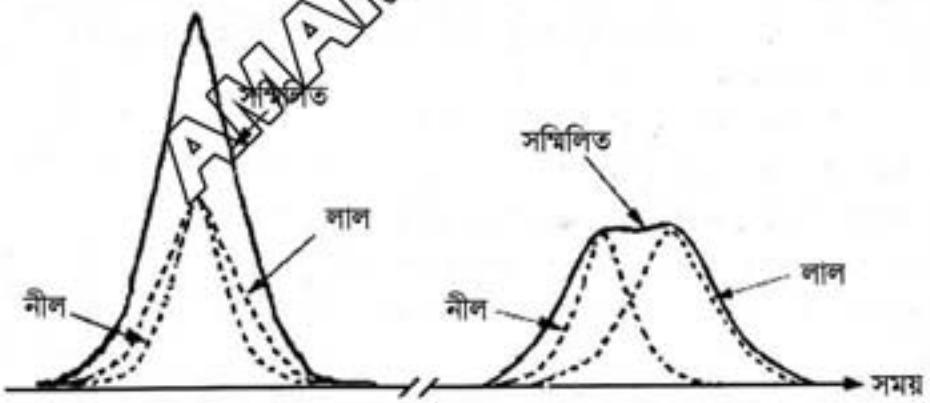

19.4 নং ছবি : কোনো মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন রঙের জন্যে প্রতিসরাঙ্ক ভিন্ন তাই তারা দূরত্ব অতিক্রম করার সময় আলাদা হয়ে যায়

আমরা বলেছি আলোর প্রতিসরাঙ্ক নির্ভর করে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর। ঠিক সে রকম আলোর প্রতিসরাঙ্ক তরঙ্গের বিস্তারের উপরেও নির্ভর করে। তবে তরঙ্গের এই বৈশিষ্ট্যটি খুব ক্ষুদ্র, তাই সাধারণ হিসেবে এটাকে বিবেচনা করা হতো না। সলিটনের বেলাতে হঠাৎ সেটা

AMARBOI.COM

খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, বিজ্ঞানীরা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলেন যে যদি খুব শক্তিশালী একটা তরঙ্গ তৈরি করা যায় তাহলে সেটা প্রতিসরাঙ্কের পরিবর্তন করতে পারে। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একদিকে প্রতিসরাঙ্কের পরিবর্তন করে, তরঙ্গের বিস্তার প্রতিসরাঙ্কের পরিবর্তন করে অন্যদিকে, এবং পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটা সম্ভব একটা পরিবর্তনকে অন্য পরিবর্তন কাটাকাটি করে ফেলে। যার ফলে আমরা দেখতে পাই আসলে কোনো পরিবর্তন হয় নি, তাই যে তরঙ্গটুকু খানিক দূর যেতে যেতেই ভেঙে যাবার কথা, ছড়িয়ে পড়ার কথা আমরা সেই তরঙ্গকে যেতে দেখি অনির্দিষ্টকাল পুরোপুরি অবিকৃতভাবে। কম্পিউটারে সেই বিষয়টি খুঁজে পেয়ে বিজ্ঞানীরা হঠাৎ করে বুঝতে পালেন শতাধিক বছর আগে ইঞ্জিনিয়ার স্কট রাসেল ঠিক এই ধরনের একটা তরঙ্গের কথা বলেছিলেন, যে তরঙ্গটিকে একশ' বছরের বেশি কেউ গুরুত্ব দিয়ে নেয় নি।

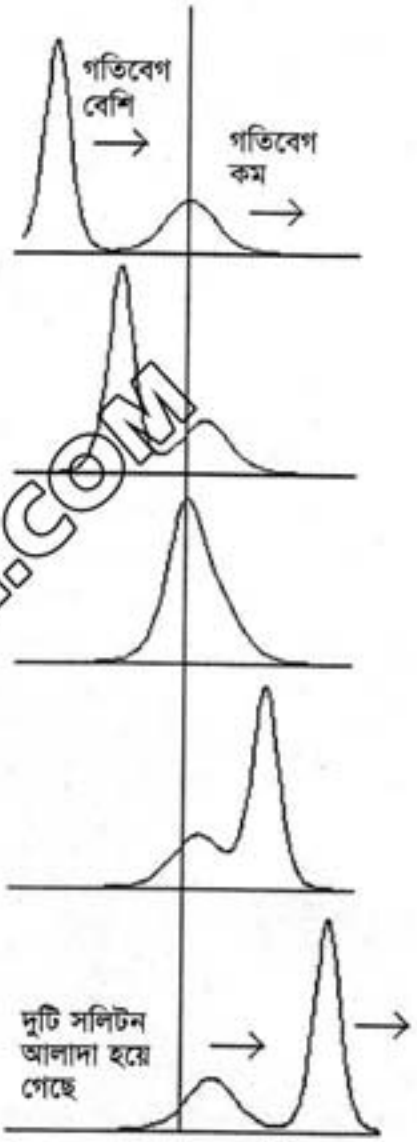

19.5 নং ছবি : একটি সলিটনের ভেতর দিয়ে আরেকটি সলিটন চলে যেতে পারে

এখন অবস্থা পাল্টে গেছে, সলিটনকে সবাই গুরুত্ব দিয়ে নেয়। শুধু যে গুরুত্ব দিয়ে নেয় তা নয়, এখন সলিটন হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফ্যাশন, যখনই কিছুকে চেষ্টা করা হয় সলিটনকে দিয়ে ব্যাখ্যা করতে। কিছুদিন আগে একটা ভয়ঙ্কর সুনামি এসে আঘাত করেছিল, মনে করা হয় সেটাও বুঝি এক ধরনের সলিটন (তবে সলিটনের তরঙ্গ ওপর-নিচ করতে পারার কথা নয়। সুনামীতে ওপর-নিচ হয়, সুনামী আঘাত করার পূর্ব মুহূর্তে সমুদ্রের পানি নিচে নেমে গিয়েছিল।)। বৃহস্পতি গ্রহে যে বিশাল লাল রঙের একটা বৃত্তাকার অংশ আছে সেটাকেও মনে করা হয় সলিটন!

সলিটন যদিও একটা তরঙ্গের মতো কিন্তু এর মাঝে একটা বস্তু কণার ভাব আছে। একটা সলিটন আরেকটা সলিটনের সাথে ধাক্কা লাগতে পারে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার একটা সলিটন অন্য একটা সলিটনের ভেতর দিয়ে একেবারে অবিকৃত অবস্থায় চলে যেতে পারে। সলিটনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যেটার বিস্তার (উচ্চতা) যত বেশি

AMARBOI.COM

সেটার গতিবেগ তত বেশি। তাই যদি দুটো সলিটন একদিকে যেতে থাকে তাহলে যেটার উচ্চতা বেশি সেটা দ্রুত গিয়ে অন্যটার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে। একটা যখন আরেকটার ঠিক উপরে থাকবে তখন তরঙ্গের উচ্চতা হওয়া উচিত দুটি তরঙ্গের যোগফলের সমান কিন্তু সলিটনের বেলায় সেটি সত্যি নয়, সম্মিলিত তরঙ্গের উচ্চতা হয় কম (19.5 নং ছবি)। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় নন-লিনিয়ার সলিটনের বেলায় যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি।

চিত্র ১৯ : সুনামিকেও সলিটন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়

AMARBOI.COM

কেউ যেন মনে না করে সেই দেড়শত বৎসর আগে এডিনবার্গে স্কট রাসেল পানির উপর একটা সলিটন দেখেছিলেন, তারপর আর কেউ কোনো সলিটন দেখে নি, সবাই কম্পিউটারে হিসেব করে সলিটনের নিয়ম-কানুন খুঁজে বের করছে। সলিটনের একটা খুব বড় ব্যবহার হয় ফাইবার অপটিক্সে যখন ডিজিটাল সিগনালকে সলিটন হিসেবে ফাইবারের ভেতর দিয়ে বিশাল দূরত্বে পাঠিয়ে দেয়া হয়। 1973 সালে বেল ল্যাবরেটরিতে এই বিষয়টা প্রথমে কল্পনা করা হয়েছিল। 1998 সালে ফ্রান্স টেলিকম সলিটন ব্যবহার করে 1 টেরাবিট (অর্থাৎ দশ হাজার কোটি বিট) পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। 2001 সালে আলগেটি টেলিকম ইউরোপে প্রথম সলিটন ব্যবহার করে সত্যিকারের টেলি কমিউনিকেশান্সের সূচনা করেছে।

বলা যেতে পারে এটি মাত্র শুরু। সলিটনের শেষ কী দিয়ে হবে সেটি এখন শুধু কল্পনা। স্কট রাসেল বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হতেন।

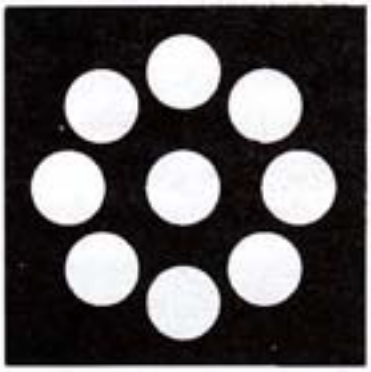

20. নিউট্রিনো

আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখছি বলা যায় তার প্রায় পুরোটুকু তৈরি মাত্র তিনটি কণা দিয়ে। সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। আমরা বস্তু বলতে যা বোঝাই তার সবগুলো তৈরি হয়েছে অণু দিয়ে আর সব অণু তৈরি হয়েছে পরমাণু দিয়ে। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, সেই নিউক্লিয়াস তৈরি হয় প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে। এর মাঝে প্রোটনের চার্জ হচ্ছে পজিটিভ, নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই। প্রোটনের পজিটিভ চার্জে আটকা পড়ে তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রন। সবচেয়ে সহজ পরমাণু হচ্ছে হাইড্রোজেন তার মাঝে একটা প্রোটন এবং তাকে ঘিরে ঘুরছে একটা ইলেকট্রন। হাইড্রোজেন এত সহজ পরমাণু যে তার নিউক্লিয়াস শুধু একটা প্রোটন কোনো নিউট্রন পর্যন্ত নেই। পরমাণুর কেন্দ্র নিউক্লিয়াসে যখন প্রোটনের সংখ্যা বাড়তে থাকে তখন বাইরে ইলেকট্রনের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। যেমন লোহার পরমাণুর কেন্দ্রে 26টা প্রোটন (এবং তিরিশটা নিউট্রন) বাইরে 26টা ইলেকট্রন। বিখ্যাত পরমাণু ইউরোনিয়ামের কেন্দ্রে 92টা প্রোটন (এবং 146টা নিউট্রন!) এবং তাকে ঘিরে ঘুরছে 92টা ইলেকট্রন। ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রনের মাঝে সবচেয়ে হালকা ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রনের ভর ইলেকট্রন থেকে প্রায় দুই হাজার গুণ বেশি। কাজেই কোনো কিছুর ভর আসলে সেই বস্তুটার মাঝে থাকা প্রোটন আর নিউট্রনের ভর।

20.1 নং ছবি : উলফগ্যাং পাউলি প্রথমে নিউট্রিনের অস্তিত্ব নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন

AMARBOI.COM

এতক্ষণ যতটুকু বলা হয়েছে কেউ যদি সেটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে একধরনের বিস্ময় নিয়ে বলবে, আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কী সহজ এবং সরল—মাত্র তিনটি কণা দিয়ে পুরোটা তৈরি! মাত্র তিনটি কণা দিয়ে তৈরি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—এই আনন্দটা উপভোগ করার আগেই বিজ্ঞানীদের এক সময় ভুরু কুঁচকাতে হলো। তারা আবিষ্কার করলেন একটা প্রোটনকে রেখে দিলে সেটা প্রোটন হিসেবেই থেকে যায় কিন্তু নিউট্রনকে আলাদা করে রেখে দিলে সেটা কিন্তু নিউট্রন হিসেবে অনির্দিষ্টকাল থাকতে পারে না। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ করে নিউট্রনটা একটা প্রোটনে পাল্টে যায়। নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই কিন্তু প্রোটনের চার্জ পজিটিভ, হিসেবের গোলমাল হয়ে যাবার কথা, বিজ্ঞানীরা শ্বাস বন্ধ করে থেকে আবিষ্কার করলেন নিউট্রন যখন প্রোটনে পাল্টে যায় তখন তার সাথে একটা ইলেকট্রনও বের হয়। ইলেকট্রনকে বলা হয় বেটা, তাই এই প্রক্রিয়ায় একটা গালভরা নাম আছে, সেটা হচ্ছে বেটা ডিকে। ইলেকট্রকনের চার্জ নেগেটিভ প্রোটনের পজিটিভ তাই এই দুই মিলে মোট চার্জ আবার শূন্য—গোড়াতে নিউট্রিনের যা ছিল।

AMARBOI.COM

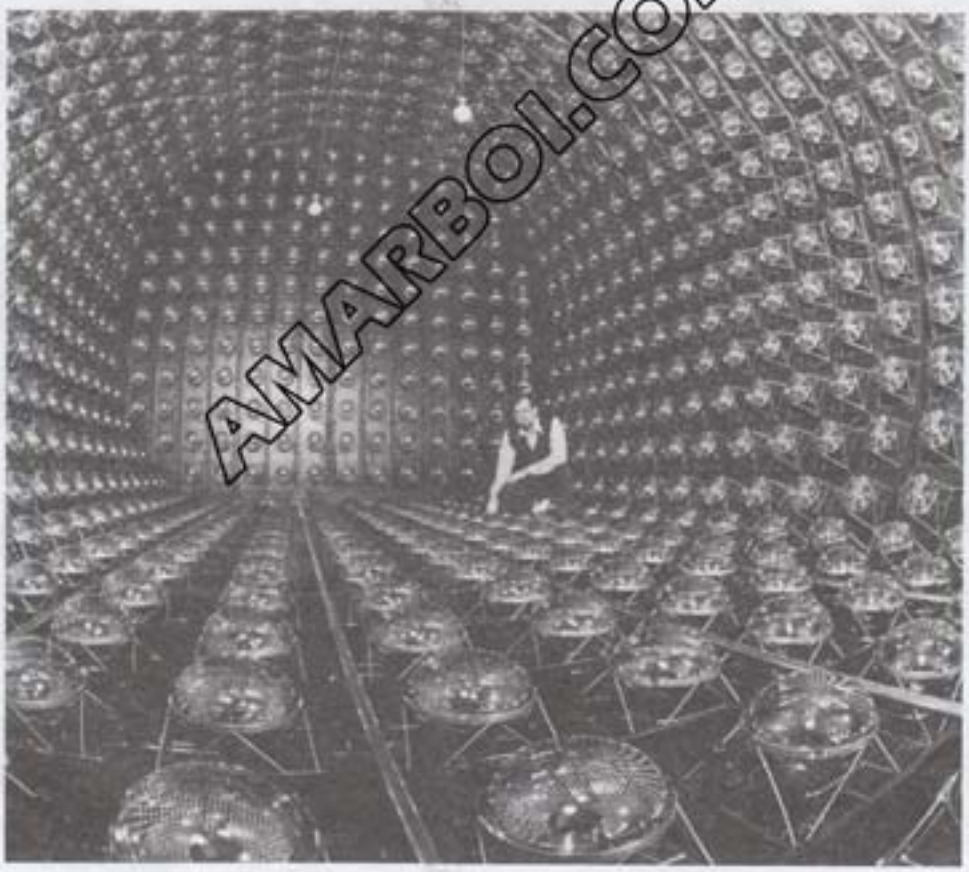

20.2 নং ছবি : নিউট্রিনোকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে তরল সিন্টিলেটর দিয়ে পূর্ণ করে তৈরি করতে হয় বিশাল ডিটেক্টর

বিজ্ঞানীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন কিন্তু খুবই সাময়িকভাবে, কিছুদিনের ভেতরেই তারা আবিষ্কার করলেন নিউট্রনের এই পাল্টে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় মোট চার্জের কোনো পরিবর্তন হয় নি সেটা সত্যি কিন্তু মোট শক্তি বা মোট ভরবেগের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। গোড়াতে যেটুকু শক্তি ছিল শেষে সেই পরিমাণ শক্তি নেই, গোড়াতে যেটুকু ভরবেগ ছিল শেষে সেই ভরবেগে নেই। পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে আগে কখনো এরকম ব্যাপার ঘটে নি।

বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস রাখলেন, তারা ধরে নিলেন শক্তি কিংবা ভরবেগ হচ্ছে অবিনশ্বর। সেটা হঠাৎ করে কমে যেতে পারে না, কিংবা বেড়ে যেতে পারে না। কাজেই নিশ্চয়ই কোনো একটা অদৃশ্য কণা এই শক্তি এবং ভরবেগ নিয়ে চলে যাচ্ছে। 1931 সালে উলফগ্যাঙ্গ পাউলি প্রথম এই অদৃশ্য কণাটির অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, পরের বছর এনরিকো ফারমি এই কণাটির নামকরণ করলেন নিউট্রিনো—যার অর্থ চার্জহীন ছোট কণা!

20.3 নং ছবি : সূর্য থেকে আসা নিউট্রিনোকে দেখার জন্যে তৈরি হয়েছে এই ডিটেক্টর

শুরুতে ছিল তিনিট কণা—ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন, তার সাথে যুক্ত হলো নিউট্রিনো। ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রিনো বিজ্ঞানীরা তাদের ল্যাবরেটরিতে রুটিন মাফিক পরীক্ষা করতে পারেন, কিন্তু নিউট্রিনো তারা কেউ খুঁজে পেলেন না। কারণটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, নিউট্রিনো জন্মলগ্ন থেকেই বিচিত্র একটা কণা, তার চার্জ নেই, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কোনো ভর নেই, সেটা বিক্রিয়া করে খুব দুর্বলভাবে (আক্ষরিকভাবে বলা হয় উইক ইন্টার একশান যেটা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক বা নিউক্লিয়ার শক্তি থেকে অনেক দুর্বল) কাজেই বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা দেয় নি। কিছুদিনের মাঝেই বিজ্ঞানীরা বুঝে গেলেন সাধারণ একটা নিউট্রিনোকে থামাতে প্রায় এক আলোকবর্ষ

AMARBOI.COM

লম্বা সিসার পাত দরকার! (এক আলোকবর্ষ হচ্ছে সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে আলো এক বছরের যেটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে!) যে কণাকে থামানো এত কঠিন সেই কণাকে কেউ সহজে দেখতে পাবে কেউ আশাও করে নি। 1956 সালে সেই অসাধ্য সাধন হলো, প্রথমবারের মতো একটা নিউট্রিনো ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানীদের হাতে ধরা দিল। যে বিজ্ঞানীরা সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন 1995 সালে তাদের সেই চমৎকার কাজের জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

নিউট্রিনোর অস্তিত্বটুকু নিশ্চিত করার পর পরই বিজ্ঞানীরা নিউট্রিনোর বিশাল একটা ভাণ্ডার খুঁজে পেলেন। সেটা হচ্ছে আমাদের চিরপরিচিত সূর্য। সূর্যের ভেতরে শক্তির জন্ম হয় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া দিয়ে এবং তার প্রতিফল হিসেবে সেখানে প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য নিউট্রিনো তৈরি হচ্ছে। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু শুধু আমাদের চোখের ভিতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 70 বিলিয়ন নিউট্রিনো চলে যাচ্ছে—আমরা যেটা কোনোদিন অনুভব করা দূরে থাকুক কল্পনাও করতে পারি না।

সূর্যের ভেতর নিউট্রিনোর এত বড় একটা ফ্যাক্টরি আছে আবিষ্কার করার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীদের আগ্রহ হলো পৃথিবীতে বসে সেগুলো গুনে দেখবেন—ঠিক তার সাথে সাথেই একটা বিপত্তি দেখা গেল। বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত সূর্যের গঠনটা তারা বুঝতে পেরেছেন, সেটা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তারা সেখান থেকে কতগুলো নিউট্রিনো বের হচ্ছে সেটাও সঠিকভাবে অনুমান করতে পারবেন। কিন্তু সমস্যা হলো ল্যাবরেটরিতে সূর্য থেকে আসা নিউট্রিনোর সংখ্যা দেখা গেল অনেক কম, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। কিছুতেই তারা সেই হিসাব মিলাতে পারছিলেন না এবং সেটা সূর্যের নিউট্রিনো সমস্যা নামে বিখ্যাত একটা সমস্যা হিসেবে পরিচিত হয়ে রইল।

আমাদের পরিচিত জগতের প্রায় সবকিছুই যদিও ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে তৈরি (এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে নিউট্রিনো) কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে জেনে গেছেন সৃষ্ট জগতে আরো অসংখ্য কণা আছে—সেগুলো কখনো আসে বাইরের জগৎ থেকে কসমিক রে হিসেবে, কখনো তৈরি হয় এক্সেলেটরে। সবগুলোকে গুছিয়ে একটা তত্ত্বের মাঝে আনা সোজা কথা নয়! যেমন পরিচিত ইলেকট্রনের মতোই আছে মিউওন—যেটার সকল ধর্ম ইলেকট্রনের মতো, শুধু তার ভর বেশি। মিউওনকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে বিজ্ঞানীরা নূতন এক ধরনের নিউট্রিনো আবিষ্কার করলেন যেটার নাম দেয়া হলো মিওন নিউট্রিনো। 1962 সালে সেই নিউট্রিনো খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা। তার জন্যে তারা নোবেল পুরস্কার পেলেন 1988 সালে। প্রথমে ছিল শুধু ইলেকট্রন এবং তার সাথে ইলেকট্রন নিউট্রিনো। তারপর এলো ঠিক ইলেকট্রনের মতো একটা কণা, যার নাম মিউওন এবং তার সাথে পাওয়া গেল মিউওন নিউট্রিনো। 1975 সালে ইলেকট্রন এবং মিউওনের মতো পাওয়া গেল তৃতীয় একটা কণা—যার নাম দেয়া হলো টাও। বিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে ধরেই নেয়া হলো এর সাথেও পাওয়া যাবে একটা নিউট্রিনো এবং তার নাম দেয়া হলো টাও

AMARBOI.COM

নিউট্রিনো। তাত্ত্বিকদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো 2000 সালে যখন সত্যি সত্যি এই নিউট্রিনোকে খুঁজে পাওয়া গেল!

তিন ধরনের নিউট্রিনো নিয়ে যখন পদার্থবিজ্ঞানীদের ভেতর নানা ধরনের উত্তেজনা তখন একই সাথে সবার ভেতরে আরেকটা প্রশ্ন কাজ করছে। সেটা হলো, নিউট্রিনোর কী ভর আছে? একটা কণা যার কোনো ভর নেই কল্পনা করা শক্ত। আমরা সে রকম একটা কণাকেই জানি, সেটা হচ্ছে আলোর কণা, তার কোনো ভর নেই বলে সেটা ছুটে আলোর গতিতে! নিউট্রিনোর যদি ভর না থাকে তাহলে সেটাও ছুটবে আলোর গতিতে। নিউট্রিনোর ভর যদি থেকেও থাকে সেটা হবে খুবই কম—এত কম যে ল্যাবরেটরিতে সেটা খুঁজে বের করা রীতিমতো দুঃসাধ্য একটা কাজ।

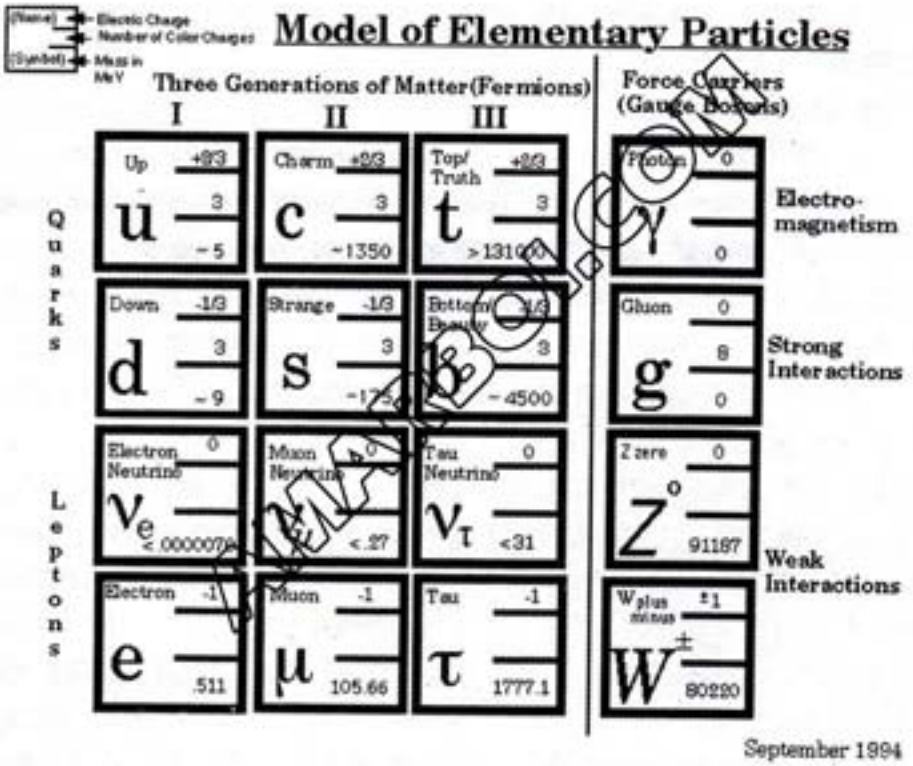

20.4 নং ছবি : এই তালিকার কণাগুলো দিয়েই তৈরি হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

দুঃসাধ্য হলেও বিজ্ঞানীরা থেমে থাকেন না। কাজেই সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানীরা নিউট্রিনোর ভর আছে কী নেই সেটা বের করার কাজে লেগে গেলেন। 1998 সালে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সন্দেহাতীতভাবে দেখালেন যে নিউট্রিনোর ভর আছে, ভরটি খুবই কম, তারা যেরকম কল্পনা করেছিলেন কিন্তু শূন্য নয়।

একই সাথে সূর্যের নিউট্রিনো সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেল। নিউট্রিনোর যদি ভর থাকে তাহলে এক ধরনের নিউট্রিনো অন্য ধরনের নিউট্রিনোতে পাল্টে যেতে পারে। কাজেই সূর্য থেকে যে নিউট্রিনোগুলো বের হচ্ছিল পৃথিবীতে আসতে আসতে তারা অন্য ধরনের নিউট্রিনোতে পাল্টে যাচ্ছিল—বিজ্ঞানীরা তাই সেগুলোকে আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। নিউট্রিনোর ভর খুঁজে পেয়ে ত্রিশ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখা সূর্যের নিউট্রিনো সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্যে সেই পদার্থবিজ্ঞানীদের নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় 2002 সালে!

রহস্যময় নিউট্রিনো সত্যিই রহস্যময় তাই প্রায় অদৃশ্য এই রহস্যময় কণাকে বোঝার জন্য বুঝি এতগুলো বিজ্ঞানীকে নোবেল প্রাইজ দিতে হয়েছে!

AMARBOI.COM

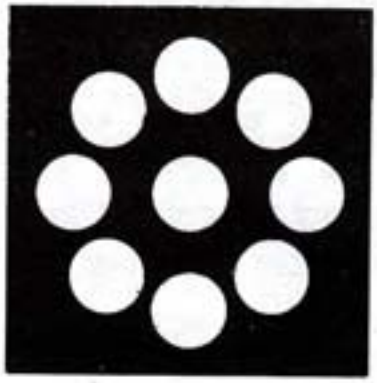

21. ম্যানহাটান প্রজেক্ট

পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ যে কয়টা জিনিসের ভুল নামকরণ করা হয়েছে তার একটা হচ্ছে এটম বোমা। এর সঠিক নাম হওয়া উচিত নিউক্লিয়ার বোমা এবং মাঝে মাঝে এই নামটাও যে ব্যবহার করা হয় না তা নয় কিন্তু কীভাবে জানি এটম বোমা নামটাই অনেক বেশি ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়।

AMARBOI.COM

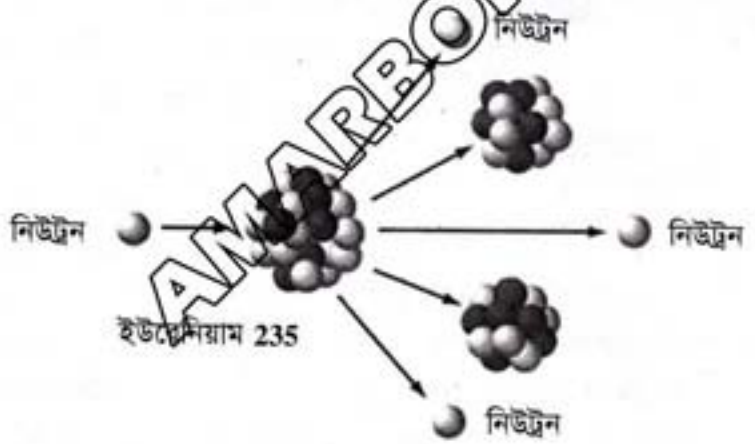

21.1 নং ছবি : ইউরেনিয়াম ২৩৫ একটি নিউট্রন গ্রহণ করার পর দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়

এটম বোমার (বা শুদ্ধ করে বললে নিউক্লিয়ার বোমার) সাথে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের যোগাযোগ দুই ভাবে। প্রথমত, এই বোমায় বস্তুর ভরকে আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র $E = mc^2$ অনুযায়ী শক্তিতে রূপান্তর করা হয়। দ্বিতীয় যোগাযোগটি অনেক বেশি বাস্তব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে আগে 1937 সালের 2 আগস্ট আইনস্টাইন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টকে একটা চিঠি লিখে বলেছিলেন হিটলার জার্মানিতে সম্ভবত নিউক্লিয়ার

বোমা বানানোর চেষ্টা করছে কাজেই আমেরিকারও এই ধরনের প্রস্তুতি থাকা দরকার। তার কিছুদিনের ভেতরেই সেখানে ম্যানহাটান প্রজেক্ট নামে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির খুব গোপন একটি প্রজেক্ট শুরু হয়। হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে পৃথিবীর মানুষের উপর ফেলা বোমা দুটি এই প্রজেক্ট থেকে তৈরি করা হয়েছিল।

নিউক্লিয়ার বোমার শক্তিটুকু আসে পরমাণু বা এটমের মাঝখানে থাকা নিউক্লিয়াস থেকে এবং এরকম একটা নিউক্লিয়াস হচ্ছে ইউরেনিয়াম 235, এখানে 235 সংখ্যাটি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এর নিউক্লিয়াস প্রোটন এবং নিউট্রনের মোট সংখ্যা হচ্ছে 235 (এর মাঝে 92টি প্রোটন বাকি সব নিউট্রন)। এটি অনেক বড় নিউক্লিয়াস এবং বলা যেতে পারে এটা কোনোরকমে আস্ত অবস্থায় রয়েছে। যদি কোনোভাবে এর মাঝে আরো একটি নিউট্রন ঢুকিয়ে দেয়া যায় তাহলেই এটা আর আস্ত থাকবে না, ভেঙে দুই টুকরো হয়ে যাবে—তার সাথে কিছু খুচরা নিউট্রনও বের হয়ে আসবে (21.1 নং ছবি)। নিউক্লিয়াস এবং তার মাঝে ঢুকে যাওয়া নিউট্রনের যে ভর ছিল দেখা যাবে যে ভেঙে যাওয়ার পর তার দুই টুকরো এবং খুচরা কিছু নিউট্রনের ভর কিন্তু তার থেকে কম। যেটুকু ভর কম সেটাই আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E = mc^2$ সূত্র মেনে শক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে। পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র বা পারমাণবিক চুল্লি বলতে আমরা যেটা বোঝাই সেখানে ঠিক এই প্রক্রিয়ায় শক্তি বের হয়ে আসে। সেখানে বাকিটাকে বের করা হয় নিয়ন্ত্রিতভাবে ধীরে ধীরে, যখন পুরো শক্তিটাকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে মুহূর্তের মাঝে বের করে আনা হয় সেটাকে বলে এটম বোমা (অথবা শুধু করে বললে নিউক্লিয়ার বোমা।)

21.2 নং ছবি : দু'টি সাব ক্রিটিক্যাল ভর একত্র করে তৈরি নিউক্লিয়ার বোমা

তাহলে বোঝাই যাচ্ছে নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর প্রথম ধাপ হচ্ছে ইউরেনিয়াম 235 সংগ্রহ করা। কাজটা খুব সহজ নয়, প্রথমত এক গ্রাম ইউরেনিয়াম পাওয়ার জন্যে দরকার 500 গ্রাম ইউরেনিয়ামের খনিজ, সেখানে ইউরেনিয়ামের প্রায় পুরোটাই—শতকরা প্রায় নিরানব্বই ভাগ হচ্ছে ইউরেনিয়াম 238 যেটা দিয়ে বোমা বানানো যায় না। যে আইসোটোপ দিয়ে বোমা

বানানো যায় সেটা হচ্ছে ইউরেনিয়াম 235 সেটা থাকে শতকরা এক ভাগ। শতকরা হিসেবে সেটা খুব বড় সমস্যা হবার কথা নয় কিন্তু সেটা বিশাল সমস্যা অন্য কারণে—ইউরেনিয়াম 235 এবং ইউরেনিয়াম 238 দুটোই একই পরমাণুর আইসোটপ, অর্থাৎ রাসায়নিক পরিচয় হুবহু এক, পার্থক্য হচ্ছে নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের তিনটা সংখ্যায়! সে কারণে কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম 235কে ইউরেনিয়াম 238 থেকে আলাদা করা যায় না। সেটা আলাদা করতে হয় অত্যন্ত জটিল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। নিউক্লিয়ার রি-এক্টরে ব্যবহার করার জন্যে যেটুকু ইউরেনিয়াম 235 আলাদা করতে হয় তার থেকে অনেক বেশি আলাদা করতে হয় বোমা বানানোর জন্যে। তাই যখনই কোনো দেশ ইউরেনিয়াম 235 আলাদা করার চেষ্টা করে তখনই সারা পৃথিবী সতর্ক হয়ে যায়। ইরানকে নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলো হইচই করছে ঠিক এই কারণে।

21.3 নং ছবি : প্লুটোনিয়ামের গোলককে সংকুচিত করে তৈরি নিউক্লিয়ার বোমা

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে নিউক্লিয়ার বোমা বানানো খুব সহজ, খানিকটা ইউরেনিয়াম 235-এর মাঝে কিছু নিউট্রন ছেড়ে দেয়া—বাস্তবে কাজটা এত সহজ না। প্রথমত বোমা মানেই হচ্ছে মুহূর্তের মাঝে বিস্ফোরণ, কাজেই পুরো ঘটনাটা হবে এক সেকেন্ডের একশ কোটি ভাগের এক কোটি ভাগ সময়ে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসে একই সাথে একটা করে বাড়তি নিউট্রন দিতে হবে, সেটা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। তবে আমরা আগেই বলেছি একটা ইউরেনিয়াম 235কে ভাঙতে পারলে শক্তির সাথে সাথে কিছু খুচরা নিউট্রন পাওয়া যায়, সেই নিউট্রনগুলো আবার অন্য নিউক্লিয়াসকে ভাঙতে পারে সেখান থেকে আবার আরো নিউট্রন পাওয়া যায়। সব নিউট্রন আবার ব্যবহার করা যায় না—কিছু কিছু খোয়া যায়। কাজেই গবেষণা করে দেখা গেছে একটা নির্দিষ্ট ভরের ইউরেনিয়াম 235 একত্র করতে পারলেই ইউরেনিয়াম 235 ভেঙে শক্তি পাওয়ার ব্যাপারটা একটানা চলতে থাকে। এই ভরটার নাম ক্রিটিক্যাল মাস এবং এই ক্রিটিক্যাল মাস বের করা হচ্ছে বোমা বানানোর প্রথম শর্ত। এক সময় এটা বের করা খুব সহজ ছিল না। আজকাল কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট যুগে এটা প্রায় ছেলেখেলার মতো হলেও পরিমাণটুকু গোপন রাখা হয়। কেউ ঘরে বসে হিসেব করে বের করলেও নিরাপত্তা কর্মীরা এসে এই কাগজপত্র জব্দ করে নিয়ে যাবে!

ক্রিটিকাল মাস বা ভরের সমান ইউরেনিয়াম 235 একত্র করতে পারলেই তার ভেতর থেকে শক্তি বের হতে থাকে। বোমা বানানোর জন্যে দরকার সুপার ক্রিটিক্যাল মাস, যে ভরের

AMARBOI.COM

ইউরেনিয়াম 235 একত্র করতে পারলে আসলে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ঘটনাটি অস্বাভাবিক গতিতে বাড়তে শুরু করে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়।

1939 থেকে 1945 সাল পর্যন্ত এই ছয় বছর প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার খরচ করে আমেরিকায় দুটি বোমা তৈরি করেছিল যার একটি ফেলেছিল হিরোশিমাতে 1945 সালের 6 আগস্ট। অন্যটি ফেলেছিল নাগাসাকিতে, তার তিনদিন পর আগস্টের 9 তারিখ—পরের দিন, আগস্টের 10 তারিখ জাপান মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এই বোমাগুলো যেখানে ফেলা হয়েছিল তার নিচের আধ মাইল ব্যাসের পুরো এলাকাটা আক্ষরিক অর্থে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল, এক মাইল ব্যাসের ভেতর সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দুই থেকে আড়াই মাইল ব্যাসের ভেতর যা কিছু দাহ্য পদার্থ ছিল সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বোমা বিস্ফোরণের মুহূর্তে মারা গিয়েছিল প্রায় সত্তর হাজার মানুষ আরো সত্তর হাজার মানুষ আহত হয়েছিল। বোমার পরে শুরু হয়েছিল তেজস্ক্রিয়তার কারণে মানুষের অচিন্তনীয় সর্বনাশ।

তেজস্ক্রিয়তা যে মানুষের জন্যে কী ভয়াবহ হতে পারে সেটি অবশ্য ম্যানহাটান প্রজেক্টের বিজ্ঞানীরা হিরোশিমা-নাগাসাকির বোমা বিস্ফোরণের আগেই জানতেন একজন খ্যাপা ধরনের বিজ্ঞানীর জন্যে। তার নাম লুইস টিন, জন্মসূত্রে কানাডার মানুষ। আমরা আগেই বলেছি ইউরেনিয়াম 235 যদি একটা নির্দিষ্ট ভর বা ক্রিটিক্যাল মাসে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সেটাতে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং সেটা আর থেমে যায় না। কাজেই খুব সঙ্গত কারণেই ইউরেনিয়াম 235 কখনোই ক্রিটিক্যাল মাস করা হয় না—নিরাপত্তার জন্যে সেটাকে দুই ভাগ করে আলাদা রাখা হয়। আলাদাভাবে দুটোই ক্রিটিক্যাল মাস থেকে কম, একসাথে একত্র করলেই সেটা বিপজ্জনক।

বিজ্ঞানী লুইস টিন এই বিপজ্জনক কাজটা নিয়ে খেলা করতে পছন্দ করতেন। অর্ধেকটা ক্রিটিক্যাল মাসের উপর বাকি অর্ধেকটা পড়তে দিতেন এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে নিচে একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে দুটো অংশকে আলাদা করে রাখতেন। এরকম খেলা করতে করতে হঠাৎ একদিন স্ক্রু ড্রাইভারটা সময়মতো দিতে পারলেন না এবং দুটো অংশ একত্র হয়ে মুহূর্তে পুরোটাতে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। ঘরে যারা ছিল তারা সবাই দেখল ক্রিটিক্যাল ভরের সেই নিউক্লিয়ার জ্বালানি থেকে নীল আলো ঝলসে উঠেছে—মনে হলো ঘরের ভেতর একটা আগুনের হলকা ছুটে যাচ্ছে।

21.4 নং ছবি : বিজ্ঞানী লুইস স্লটিন ক্রিটিক্যাল ভর নিয়ে বিপজ্জনক খেলা খেলতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন

AMARBOI.COM

লুইস টিন প্রাণপণ চেষ্টা করে ভেতরে স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে দুটো অংশ আলাদা করে বিক্রিয়াটি থামালেন কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। লুইস টিনের মনে হলো তার হাতটি আগুনে ঝলসে গেছে, তিনি মুখে এক ধরনের টক টক স্বাদ অনুভব করলেন। লুইস টিন তখন ঘরের ভেতর দাঁড়ানো সব বিজ্ঞানীদের বললেন, "তোমরা কেউ নড়বে না, যে যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাকো, কে কতটুকু তেজস্ক্রিয় বিকীরণ পেরেছ জানা দরকার। আমি বাঁচব না, তোমাদের কেউ কেউ বেঁচে যাবে।"

দুই দিন পর লুইস টিন মারা গেলেন, সেই মৃত্যুর মতো যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশি নেই। তীব্র তেজস্ক্রিয় রশ্মি তার সারা শরীরকে একেবারে ভেতর থেকে ঝলসে দিয়েছিল। একজন লুইস টিন যত কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছিলেন জাপানের প্রায় এক লক্ষ মানুষ সেরকম কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছিল!

লুইস স্লটিনের হাত ফসকে দুটো অংশ একত্র হয়ে ক্রিটিক্যাল ভর হয়ে গিয়েছিল। নিউক্লিয়ার বোমার ভেতরে সেটা করা হয় ইচ্ছে করে। লুইস টিন যে দুটো অংশ নিয়ে খেলা করছিলেন সেটা শুধুমাত্র বিক্রিয়াটা শুরু করেছিল, নিউক্লিয়ার বোমায় সেটা শুরু হয়ে মাত্রার বাইরে চলে যায় মুহূর্তে। নিউক্লিয়ার বোমার ভেতরে দুটো অংশ আলাদা রাখা হয়, যখন বিস্ফোরণের মুহূর্তটি আসে তখন দুটি অংশ প্রচণ্ড বেগে একটি আরেকটির দিকে ছুটে আসে। দুটি অংশ স্পর্শ করা মাত্রই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সেটা বিস্ফোরিত হয় (21.2 নং ছবি)। হিরোশিমার বোমাটি ছিল এরকম একটি বোমা।

বোমা নিয়ে কথা বলার সময় শুধু ইউরেনিয়াম 235-এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু শুধু যে ইউরেনিয়াম 235 দিয়ে বোমা তৈরি করা যায় তা নয়, প্লুটোনিয়াম 239 দিয়েও বোমা তৈরি করা যায়। জাপানের উপর ফেলা দ্বিতীয় বোমাটি ছিল প্লুটোনিয়াম 239 দিয়ে তৈরি, লুইস টিনের যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটাও ঘটেছিল প্লুটোনিয়াম 239 দিয়ে।

21.5 নং ছবি : পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বোমা লিটল বয়– যেটা হিরোশিমার উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল

AMARBOI.COM

ম্যানহাটান প্রজেক্টের দ্বিতীয় বোমাটি তৈরি করার সময় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন সেটি দুটি অংশকে একত্র করে বিস্ফোরিত করা যাবে না। তার জন্যে দরকার একটা বড় গোলককে চাপ দিয়ে ছোট করে সুপার ক্রিটিক্যাল করে—চারপাশে বিস্ফোরক রেখে একই মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একত্র করে এটাকে বিস্ফোরণ করা হয় (21.3 নং ছবি।)

ম্যানহাটান প্রজেক্টের বিজ্ঞানীরা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দুটো বোমা ফেলার আগে একটি বোমা তৈরি করেছিলেন পরীক্ষা করার জন্যে। 1945 সালের 16 জুলাই সেটা নিউ মেক্সিকোর একটা মরুভূমিতে বিস্ফোরিত করা হয়েছিল। সেই বিস্ফোরণটি দেখে সকল বিজ্ঞানীরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তারা আতংকিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন সেটি যেন কখনোই কোনো মানুষের উপর ব্যবহার করা না হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী সেই অনুরোধ রক্ষা করে নি, তারা সেটা ব্যবহার করেছিল। একবার নয়—দুই বার।

AMARBOI.COM

১৭.৬ নং ছবি : নিউক্লিয়ার বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমায় যে পাইলট বোমাটি ফেলেছিল ছবির উপর তার স্বাক্ষর

ম্যানহাটান প্রজেক্টের দায়িত্বে ছিলেন রবার্ট ওপেনহাইমার নামে একজন বড় বিজ্ঞানী। নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে নিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ দেখে তিনি গীতা থেকে একটা শ্লোক আওড়ে বলেছিলেন, এখন আমি হচ্ছি পৃথিবীর ধ্বংসকারী—আমিই হচ্ছি মৃত্যু।

মানুষ নিজেই যখন নিজের মৃত্যু হয়ে দাঁড়ায় তাদের রক্ষা করা কী খুব সহজ কথা?

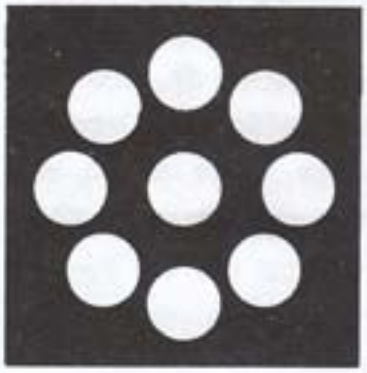

22. রহস্যময় প্রতি-পদার্থ

পল ডিরাককে নিয়ে একটা মজার গল্প প্রচলিত আছে। একবার তাকে একটা গণিতের সমস্যা দেয়া হলো, সমস্যাটা এরকম : তিনজন জেলে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছে, মাছ ধরে যখন বাড়ি ফিরে যাবে তখন সমুদ্রে ঝড় ওঠে। জেলে তিনজন তখন রাত কাটানোর জন্যে একটা দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে ঘুমিয়ে গেল। গভীর রাতে একজন জেলের ঘুম ভেঙে গেল, তখন ঝড় থেমে গেছে। সে ভাবল অন্য জেলেদের বিরক্ত না করে সে তার ভাগের মাছ নিয়ে বাড়ি চলে যাবে। মাছগুলো তিন ভাগে ভাগ করার পর সে দেখে একটা মাছ বাড়তি রয়ে গেছে। সে বাড়তি মাছটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে নিজের এক ভাগ নিয়ে বাড়ি চলে গেল। কিছুক্ষণ পর আরেকজন জেলে ঘুম থেকে উঠেছে, ঝড় থেমে গেছে তাই সেও ভাবল সে তার ভাগের মাছ নিয়ে চলে যাবে। তাই যে মাছগুলো রয়ে গেছে সে সেগুলোকে তিন ভাগ করে দেখে একটা মাছ বেশি। বাড়তি মাছটা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে সে তার নিজের ভাগ নিয়ে চলে গেল। শেষ জেলেও এক সময় ঘুম থেকে উঠেছে, সেও দেখে উঠেছে ঝড় থেমে গেছে। কাজেই

AMARBOI.COM

22.1 নং ছবি : সৃষ্টি জগৎ এই বারোটি কণাকে (Particle) এবং তাদের প্রতি-কণা (Anti-Particle) দিয়ে তৈরি। ছবিতে শুধু কণাগুলোকে দেখানো হয়েছে তার প্রতি-কণা দেখানো হয় নি

সেও ঠিক করল নিজের ভাগের মাছ নিয়ে সে চলে যাবে। রয়ে যাওয়া মাছগুলোকে তিন ভাগ করে দেখে একটা মাছ বেশি। সেও বাকি মাছ সমুদ্রের পানিতে ফেলে দিয়ে নিজের ভাগটুকু নিয়ে চলে গেল। এটুকু হচ্ছে গণিতের সমস্যাটার বর্ণনা—এখন প্রশ্ন হচ্ছে সবচেয়ে কম কতগুলো মাছ হলে তিনজন জেলে এইভাবে মাছ ভাগ করে নিতে পারবে?

সমস্যাটা এমন কিছু কঠিন নয় যে কেউ একটু মাথা ঘামালে এর উত্তরটা বের করে ফেলতে পারবে। কথিত আছে পল ডিরাককে যখন এই সমস্যাটা দেয়া হলো তখন তিনি এক মুহূর্তও চিন্তা না করে বললেন, "-2টি (মাইনাস দুই) মাছ!" মাছ কেমন করে 'মাইনাস' হয় সেটা পরের ব্যাপার কিন্তু গণিতের দৃষ্টিকোণে এটি খাঁটি একটা সমাধান। প্রথম জেলে 2টি মাছ থেকে + 1টি মাছ পানিতে ফেলে দিল তাই তার হাতে থাকল-3টি মাছ। (−2=3+1) সে তিন ভাগে ভাগ করে তার ভাগ (−1টি মাছ) নিয়ে গেল, বাকি রইল 2টি মাছ! কাজেই পুরো প্রক্রিয়াটা আবার গোড়া থেকে শুরু করা সম্ভব। তিনজন জেলেই এটা করতে পারবে এবং শেষ পর্যন্ত 2টি মাছ রয়ে যাবে।

22.2 নং ছবি : m ভরের একই ধরনের পদার্থ এবং প্রতি-পদার্থ সংস্পর্শে আসামাত্র $2mc^2$ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

যিনি গণিতের এই সমস্যাটি দিয়েছিলেন তিনি মোটেও এই উত্তর আশা করেন নি (তিনি আশা করেছিলেন প্রচলিত উত্তরটি—সেটা হচ্ছে 25) কিন্তু আমরা এখন অনুমান করতে পারি কেমন করে পল ডিরাকের মাথায় এরকম একটা উত্তর খেলা করেছে। পল ডিরাক সবার আগে প্রতি-পদার্থের অস্তিত্বের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রতি-পদার্থ অনেকটা নেগেটিভ সংখ্যার মতো, পজিটিভ সংখ্যার সাথে নেগেটিভ সংখ্যা যোগ করলে যেমন কিছুই থাকে না, ঠিক সেরকম পদার্থের সাথে প্রতি-পদার্থ মিলিত হলে দুটোই অদৃশ্য হয়ে যায়! থাকে শুধু শক্তি।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের একটা ভাষা হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং যে কয়জন পদার্থবিজ্ঞানী প্রথম কোয়ান্টাম মেকানিক্স গড়ে তুলেছেন তার অন্যতম হচ্ছেন পল ডিরাক। তিনি ইলেকট্রনের জন্যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করার সময় সেখানে আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি ব্যবহার করে 1931 সালে প্রথমবার ইলেকট্রনের প্রতি-পদার্থ পজিট্রনের অস্তিত্বের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। পরের বছরেই কার্ল এন্ডারসন পজিট্রন আবিষ্কার করে দেখালেন ডিরাকের অনুমান একশত ভাগ সত্যি।

AMARBOI.COM

প্রতি-পদার্থ সম্ভবত প্রকৃতির সবচেয়ে রহস্যময় একটি বিষয়। আমাদের পরিচিত যে জগৎ সেগুলো তৈরি হয়েছে অণু-পরমাণু দিয়ে আর অণু-পরমাণু তৈরি হয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে। কাজেই আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি তার সবকিছু ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে তৈরি বললে একটুও অত্যুক্তি হয় না। ইলেকট্রনের যেরকম প্রতি-পদার্থ হচ্ছে পজিট্রন ঠিক সে রকম প্রোটন আর নিউট্রনেরও প্রতি-পদার্থ রয়েছে, বিজ্ঞানের ভাষায় তার নাম এন্টি-প্রোটন (anti-proton) এবং এন্টি-নিউট্রন (anti-neutron)। সব প্রতি-পদার্থই সামনে এন্টি শব্দ বসিয়ে বোঝানো হয়, শুধু ইলেকট্রনের প্রতি-পদার্থের আলাদা একটা নাম আছে—পজিট্রন। কাজেই আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি একটি প্রোটন আর একটি পজিট্রন দিয়ে তৈরি হয় একটি এন্টি-হাইড্রোজেন! ঠিক সেভাবে আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি তার সবকিছুরই "এন্টি" থাকা সম্ভব। পদার্থবিজ্ঞান সেটা মেনে নিয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা এক্সেলেটরে মোটামুটি নানারকম এন্টি-ম্যাটার (anti-matter) বা প্রতি-অণু প্রতি-পরমাণু তৈরি করে দেখিয়েছেন।

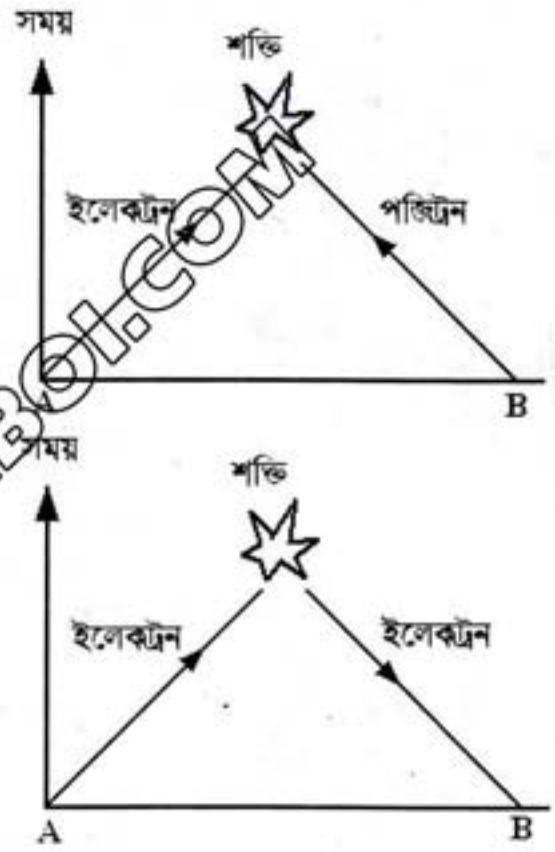

22.3 নং ছবি : (a) A এবং B বিন্দু থেকে যথাক্রমে একটি ইলেকট্রন এবং পজিট্রন রওনা দিয়ে C বিন্দুতে একে-অপরকে আঘাত করে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে (b) A বিন্দু থেকে একটি ইলেকট্রন C বিন্দুতে গিয়ে খানিকটা শক্তি দেয়ার পর সময়ের উল্টো দিকে রওনা দিয়ে B বিন্দুতে এসেছে। পদার্থবিজ্ঞানের চোখে (a) এবং (b)-এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই

এবারে মনে হয় একটা বিষয় নিয়ে একটু সতর্ক করে দেয়া ভালো, একটু আগে বলেছি আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি তার সবকিছুই তৈরি হয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে কিন্তু আমরা যা কিছু দেখি শুধুমাত্র সেগুলো দিয়েই যে আমাদের জগৎ সেটি সত্যি নয়—অনেক কিছুই আছে যেগুলো আমরা আমাদের দৈনন্দিন জগতে দেখি না, কিন্তু সেগুলো খুব ভালোভাবে আছে, বিজ্ঞানীরা নানাভাবে সেগুলো খুঁজে বের করেছেন। এখন পর্যন্ত যে থিওরিটি সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করেছে সেটা অনুযায়ী আমাদের এই সৃষ্টি জগৎ বারোটি কণা (Particle এবং তাদের প্রতি কণা (anti-Particle) দিয়ে তৈরি (22.1 নং ছবি)।

AMARBOI.COM

যারা পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে না আমি আশা করি না তারা এই কণাগুলোর নাম মনে রাখার চেষ্টা করবে কিংবা তার গভীরে যাবার চেষ্টা করবে। বারোটি কণার দিকে একঝলক চোখ বুলিয়ে গেলেই যথেষ্ট। যারা একটু খুঁতখুঁতে তারা হয়তো ভুরু কুঁচকে বলবে, বলা হয়েছিল আমরা যা কিছু দেখি তার সবই ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন দিয়ে তৈরি। তালিকায় অনেক কষ্টে ইলেকট্রনকে খুঁজে পাওয়া গেল (লেপটনের নিচের সারিতে বাম দিকে) কিন্তু নিউট্রন, প্রোটন কোথায়? নিউট্রন, প্রোটন এখানে নেই কারণ এই তালিকায় শুধু মৌলিক কণাগুলো দেয়া হয়েছে—নিউট্রন, প্রোটন মৌলিক কণা নয়, সেগুলো তৈরি কোয়ার্ক দিয়ে। যেমন নিউট্রন তৈরি হয় একটি আপ কোয়ার্ক এবং দুটি ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে (udd) ঠিক সে রকম প্রোটন তৈরি হয় দুটি আপ কোয়ার্ক আর একটি ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে (udd)। কাজেই আমরা এবারে আরো সঠিকভাবে বলতে পারি আমাদের দৃশ্যমান জগৎ তৈরি হয়েছে তিনটি মৌলিক কণা দিয়ে, ইলেকট্রন, আপ কোয়ার্ক এবং ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে!

যাই হোক, 22.1 নং ছবির বারোটি কণা এবং তাদের প্রতি-কণা দিয়ে সৃষ্টি জগতের সকল পদার্থ এবং প্রতি-পদার্থের একটা খুবই বড় বিশেষত্ব হচ্ছে যখন একই ধরনের পদার্থ এবং প্রতি-পদার্থ একে-অপরের সংস্পর্শে আসে সাথে সাথে একটা আরেকটাকে ধ্বংস করে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেই শক্তির পরিমাণ কত হবে সেটা আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E= mc^2$ সূত্র দিয়ে খুব সহজেই বের করা যায়। এটি কোনো কল্পকাহিনী নয়, আমাদের চারপাশে সবসময়ই সেটা ঘটছে।

22.4 নং ছবি : লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা হবে

সৃষ্টি জগৎ যেহেতু বারোটি মৌলিক কণা এবং তাদের প্রতি-কণা দিয়ে তৈরি হয়েছে কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি এই জগতে আমরা যে রকম পদার্থ দেখতে পাব ঠিক সে রকম প্রতি-পদার্থও দেখতে পাব। কিন্তু এখানে একটি বড় রহস্য এখানো উন্মোচিত হয় নি। কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে আমাদের দৃশ্যমান সৃষ্টি জগৎ পুরোটাই তৈরি হয়েছে পদার্থ দিয়ে, এখানে কোনো প্রতি-পদার্থ নেই। এটা গোপনে কোথাও রয়ে গেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তার কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ পদার্থ প্রতি-পদার্থ একে-অপরের সংস্পর্শে এলেই দুটোই ধ্বংস হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কাজেই এটা কোনোভাবেই বিজ্ঞানীদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

এই সৃষ্টি জগৎ তৈরি হয়েছিল বিগ ব্যাং (Big Bang)-এর ভেতর দিয়ে, সেই বিগ ব্যাংয়ের পর সৃষ্টি জগতে কিন্তু সমান পরিমাণ পদার্থ এবং প্রতি-পদার্থ তৈরি হওয়ার কথা, সেই সমান পরিমাণ পদার্থ এবং প্রতি-পদার্থ একে-অপরকে ধ্বংস করে সৃষ্টি জগতে শুধু শক্তি থাকার কথা। এই গ্রহ-নক্ষত্র, গ্যালাক্সি কিছুই থাকার কথা নয়, থাকার কথা শুধু শক্তির—কিন্তু আমরা খুব ভালো করে জানি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পদার্থ রয়ে গেছে, গ্রহ-নক্ষত্র, গ্যালাক্সি রয়ে গেছে। কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে প্রতি-পদার্থ পদার্থের কাছে হেরে গেছে এবং সৃষ্টি জগতের সকল প্রতি-পদার্থকে ধ্বংস করার পরও বাড়তি পদার্থ রয়ে গেছে যেটা দিয়ে আমাদের এই দৃশ্যমান জগৎ তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনো সঠিকভাবে জানেন না ঠিক কীভাবে ব্যাপারটা ঘটেছে। (CP Violation নামে কিছু ধারণা দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু সেটা এখনো পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে নি।)

পৃথিবীর সবাই ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই LHC (Large Hadron Collider)-এর নাম শুনে গেছে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা খরচ করে ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের সীমানায় এটা তৈরি করা হয়েছে। বৃত্তাকার এই এক্সেলেরেটরের পরিসীমা 27 কিলোমিটার। আমরা জানি যার ভর আছে তার গতিবেগ কখনো আলোর বেগের সমান হতে পারে না, বড় জোর তার কাছাকাছি হতে পারে। এই এক্সেলেটরে প্রোটিনের গতিবেগ আলোর গতিবেগের 99.999999 (আটটা নয় পাশাপাশি) শতাংশ। এটি মোটামুটিভাবে একটি অচিন্তনীয় ব্যাপার।

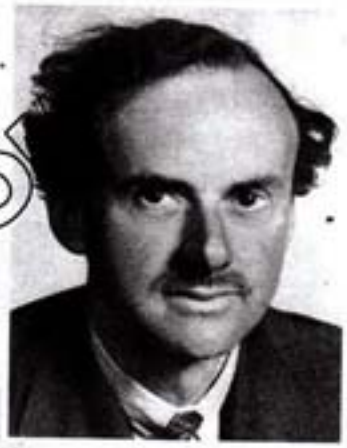

22.5 নং ছবি : পল ডিরাক প্রথম প্রতি-পদার্থের অস্তিত্ব নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন

এল. এইচ. সি. পদার্থবিজ্ঞানের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অমীমাংসিত বিষয়ের উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে এবং পৃথিবীর পুরো বিজ্ঞানী সমাজ তার জন্যে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। বিগ ব্যাংয়ের পর কেমন করে পদার্থের পরিমাণ প্রতি-পদার্থ থেকে বেড়ে গেছে সেই প্রশ্নের উত্তরটিও এল. এইচ. সি. খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।

এবারে পদার্থ এবং প্রতি-পদার্থের একটা অভূতপূর্ব বিশেষত্বের কথা বলে শেষ করা যাক। 22.3 নং ছবিতে দেখানো হয়েছে A এবং B বিন্দু থেকে যথাক্রমে একটি ইলেকট্রন এবং তার প্রতি-পদার্থ পজিট্রন রওনা দিয়ে C বিন্দুতে একে-অপরকে আঘাত করে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই বিষয়টাকে আসলে সম্পূর্ণ অন্যভাবে বলা যায়! আমরা বলতে পারি A বিন্দু থেকে একটা ইলেকট্রন রওনা দিয়ে দিয়ে C বিন্দুতে এসে সময়ের উল্টো দিকে যাত্রা শুরু করে অতীতে B বিন্দুতে এসে হাজির হয়েছে! পদার্থবিজ্ঞানের চোখে দুটি হুবহু একই ব্যাপার।

অর্থাৎ প্রতি-পদার্থ হচ্ছে সময়ের উল্টো দিকে বহমান পদার্থ! এর পরেও কেউ কী অস্বীকার করতে পারবে পদার্থবিজ্ঞান থেকে রহস্যময় বিজ্ঞান আর কিছু নেই?

AMARBOI.COM

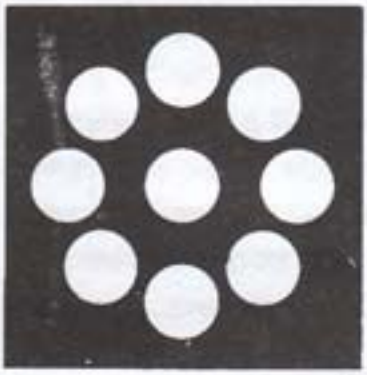

23. ভর আছে, ওজন নেই

যারা টেলিভিশন দেখে তারা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো স্পেস শাটল বা অন্য কোনো মহাকাশযানের ভেতরের ভিডিও দেখেছে যেখানে দেখা যায় মহাকাশচারীরা ভাসছে। একজন মানুষের কোনো ওজন নেই, সে বাতাসে ভাসতে পারে, এর চাইতে চমকপ্রদ দৃশ্য কী হতে পারে?

এর কারণটা কী সেটা নিয়েও নিশ্চয়ই কৌতূহল হয়। আমার ধারণা বেশিরভাগ মানুষের ধারণা মহাশূন্যে এরকমই হওয়ার কথা। পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে থাকলে মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্যে আমরা ওজন অনুভব করি—যদি আকাশে বা মহাকাশে উঠে যাই তখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমতে কমতে শূন্য হয়ে যায়, তাই আমরা আর কোনো ওজন অনুভব করি না, ওজনশূন্য অবস্থায় ভেসে বেড়াই।

AMARBOI.COM

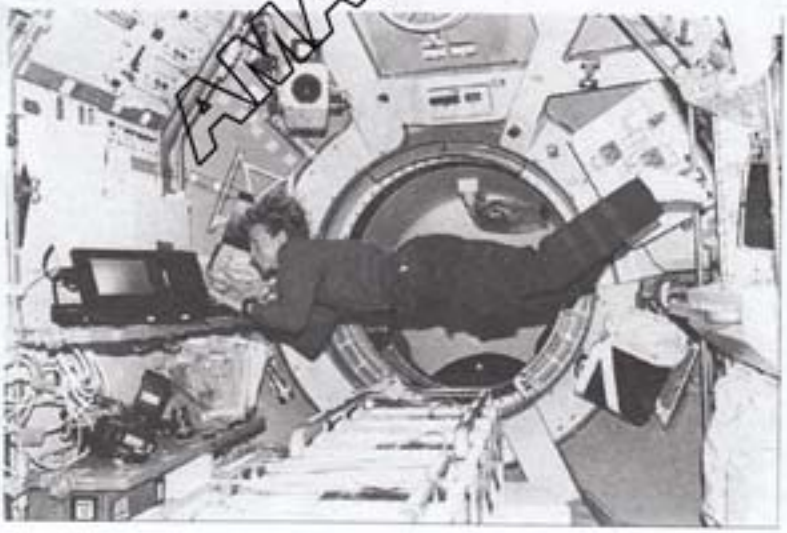

23.1 নং ছবি : স্পেস শাটলে মহাকাশচারীরা বাতাসে ভাসতে পারে, এর চাইতে চমকপ্রদ দৃশ্য কী হতে পারে?

আসলে আমাদের এই ধারণাটা পুরোপুরি ভুল। মহাশূন্যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মোটেও শূন্য নয়। যারা আমার কথা বিশ্বাস করে না তারা ইচ্ছে করলে এখনই হিসেব করে দেখতে পারে। একটা জিনিসের ভর যদি হয় m তাহলে তার ওজন হচ্ছে mg; এখানে g বলতে বোঝানো হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ, যার মান পৃথিবীর পৃষ্ঠে 10 m/s^2-এর কাছাকাছি। চাঁদে এর মান ছয় গুণ কম তাই সেখানে কোনো একটা বস্তুর ওজন ছয় গুণ কম। বৃহস্পতি গ্রহের পৃষ্ঠে এটা আড়াই গুণ বেশি, তাই সেখানে একটা বস্তুর ওজন হবে আড়াই গুণ বেশি। কাজেই যদি দেখা যায় একটা বস্তুর ওজন শূন্য তাহলে বুঝতে হবে সেখানে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণও শূন্য। (অনেক সময় বলা হয় ভরশূন্য পরিবেশ—এটি কিন্তু ভুল কথা—ভর কখনো শূন্য হতে পারে না, শুধুমাত্র ওজন শূন্য হতে পারে!)

এবারে তাহলে আমরা মহাশূন্যে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ কত হয় সেটা বের করতে পারি—তবে তার আগে জানা দরকার মহাশূন্য বলতে আমরা কী বুঝি। শুনে অবাক লাগতে পারে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে পঞ্চাশ মাইল উপরে উঠলে সেটাকেই রীতিমতো মহাশূন্য বলা যেতে পারে। স্পেস শাটলের কক্ষপথ সাধারণত দুশো মাইল উচ্চতার কাছাকাছি থাকে। মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বের বর্গের আকারে কমতে থাকে। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় চার হাজার মাইল, কাজেই মহাশূন্যে—অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চার হাজার দুইশত মাইল উপরে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ মাত্র দশ শতাংশ কম। অর্থাৎ এই উচ্চতায় কোনো কিছুর ওজন কমবে মাত্র দশ শতাংশ। অর্থাৎ স্পেস শাটলে মহাকাশচারীদের ওজন শূন্য নয়—মহাকাশচারীদের ওজন তাদের সত্যিকার ওজনের নব্বই শতাংশ!

23.2 নং ছবি : কিছুদিন আগে বিশ্ব বরেণ্য বিজ্ঞানী স্টিফান হকিং ওজনহীন হওয়ার অনুভূতি অনুভব করেছিলেন

AMARBOI.COM

কিন্তু আমরা সবাই দেখেছি স্পেস শাটলে মহাকাশচারীরা ওজনহীন অবস্থায় ভেসে বেড়াচ্ছেন। যদি সত্যি সত্যি তাদের ওজন থেকে থাকে তাহলে তারা ভেসে বেড়াচ্ছেন কেন?

আসলে তাদের ভেসে বেড়ানোর কারণটা সম্পূর্ণ ভিন্ন, এর সাথে মহাশূন্যের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যি কথা বলতে কী মানুষ ইচ্ছে করলে পৃথিবীর পৃষ্ঠেও ওজনহীন অনুভব করতে পারে। কেউ যদি মাত্র চার হাজার ডলার খরচ করতে রাজি থাকে তাহলে তারা বিশেষ এক ধরনের প্লেনে করে ওজনহীন হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাটুকু অর্জন করতে পারবে। কিছুদিন আগে বিশ্ব বরেণ্য বিজ্ঞানী স্টিফান হকিং এ ধরনের একটা বিমানে করে উড়ে ওজনহীন হওয়ার অনুভূতি অনুভব করেছিলেন—সেই ছবি সারা পৃথিবীর সব পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

ওজনহীন হওয়ার অনুভূতিটি খুবই সহজে পাওয়া যায়—কেউ যদি মুক্তভাবে পড়তে থাকে তাহলেই সে ওজনহীন অনুভব করবে। যারা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না তাদের জন্যে এরকম একটা দৃশ্য কল্পনা করে নেয়া যায় : একজন মানুষের ঘাড়ে আরেকজন মানুষ চেপে বসেছে। নিঃসন্দেহে যে মানুষটির ঘাড়ে আরেকজন চেপে বসেছে সে চেপে বসা মানুষটির ওজনটুকু পুরোপুরি অনুভব করবে! এবারে কল্পনা করে নেয়া যাক মানুষটি তার ঘাড়ে চেপে বসা অন্য মানুষটিকে নিয়ে এগারো তলা একটা বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে লাফ দিয়েছে—যখন দুজন নিচে এসে পড়বে তখন কী অবস্থা হবে সেটার কথা আমরা আপাতত ভুলে যাই—আমরা দেখার চেষ্টা করি যখন তারা নিচে পড়ছে তখন কী হচ্ছে। যতক্ষণ এগারোতলা বিল্ডিংয়ের ছাদে মানুষটি দাঁড়িয়ে ছিল ততক্ষণ সে তার ঘাড়ে বসে থাকা মানুষটির ওজন অনুভব করেছে কিন্তু যখন দুজনেই মুক্তভাবে পড়তে শুরু করেছে তখন মানুষটি কিন্তু তার ঘাড়ে চেপে বসে থাকা অন্য মানুষটির ওজন আর অনুভব করবে না। দুজনে ঠিক একইভাবে নিচে পড়ছে—একজন অন্যজনের ওজন কীভাবে অনুভব করবে?

AMARBOI.COM

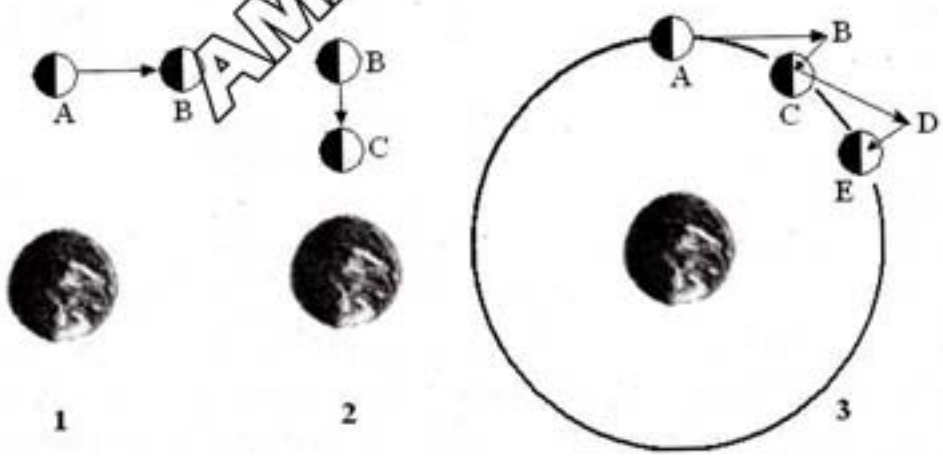

23.3 নং ছবি : প্রথম ছবিতে দেখানো হচ্ছে চাঁদের গতি শুধু সামনের দিকে। দ্বিতীয় ছবিতে শুধু নিচের দিকে। তৃতীয় ছবিতে একই সাথে সামনে এবং নিচে দুই মিলে তৈরি হয় গোলাকার কক্ষপথ

কাজেই ওজনহীন অনুভব করা খুবই সোজা—তার জন্যে মুক্তভাবে নিচে পড়তে হবে! ছেলেবেলায় আমরা যখন পাঁচিলের উপর থেকে লাফ দিয়েছি নিচে পড়ার সময় আমরা মুহূর্তের জন্যে নিজেদের ওজনহীন অনুভব করেছি। তবে সময়টা এত কম যে ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার আগেই আমরা মাটিতে সজোরে আছড়ে পড়েছি!

এবারে আরো একটা জিনিস পরিষ্কার করে নেয়া যাক। ধরা যাক আমাদের ঘাড়ে চেপে বসা মানুষটিকে নিয়ে অন্য মানুষটি সরাসরি নিচে লাফিয়ে না পড়ে অন্য একটা কাজ করল। সে ছাদের অন্য মাথায় গিয়ে সেখান থেকে ছুটে এসে লাফ দিল, তাহলে আমরা দেখব সে সরাসরি নিচে পড়ছে না—সে নিচে পড়ার সাথে সাথে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তার গতির দুটো অংশ রয়েছে, একটা অংশ সরাসরি নিচের দিকে, আরেকটা অংশ সামনের দিকে। এবারেও কিন্তু দুজন মানুষই ওজনহীন অনুভব করবে, তারা যে মুক্তভাবে নিচে পড়ার সাথে সাথে সামনে খানিকটা এগিয়েও যাচ্ছে তার জন্যে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে ওজনহীন অনুভূতির কোনো পার্থক্য হচ্ছে না।

এবারে আমরা স্পেস শাটলের মহাকাশচারীদের ওজনহীন অনুভব করার বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু সেটা করার আগে আমরা একবার চট করে নিউটনের অভিজ্ঞতাটুকুর কথা বলে নিই। সত্য-মিথ্যা জানা নেই, গল্প প্রচলিত রয়েছে যে একবার নিউটন আপেল গাছের নিচে বসে ছিলেন তখন তার সামনে টুপ করে একটা আপেল এসে পড়ল। প্রচলিত গল্প অনুযায়ী তিনি ভাবতে লাগলেন আপেলটি উপরে উঠে না গিয়ে নিচে কেন পড়ল এবং সেখান থেকেই তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিষয়টি আবিষ্কার করলেন। তার এই ভাবনার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়—বরং যেটা হতে পারে সেটা এরকম : যখন আপেলটি নিচে এসে পড়ল তখন তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সেখানে একটি চাঁদ। তিনি ভাবলেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের কারণে আপেলটি টুপ করে নিচে এসে পড়ছে। পৃথিবী তো চাঁদটাকেও টানছে, তাহলে আকাশ থেকে চাঁদটা টুপ করে না হলেও ধপাস করে নিচে এসে পড়ছে না কেন?

আসলে এটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। পৃথিবী যেভাবে আপেলটাকে নিচে টানছে, চাঁদটাকেও সেভাবে নিচে টানছে। আপেলটা মাটিতে পড়ে যায় কিন্তু চাঁদটা পড়ে যায় না, এর মাঝে রহস্যটা কী?

আসলে এর মাঝে কোনো রহস্য নেই—চাঁদটাও কিন্তু পৃথিবীতে পড়ে যাচ্ছে। আপেল যেরকম মুক্তভাবে পড়ে, চাঁদটাও হুবহু সেভাবে পৃথিবীতে পড়ে যাচ্ছে। আমি জানি সকল পাঠক এবারে ভুরু কুঁচকে বলছেন সেটা যদি পড়েই যাচ্ছে তাহলে আমরা সেটা দেখাত পাচ্ছি না কেন? উত্তরটা খুবই সহজ, আমরা এটা দেখতে পেতাম যদি কেউ চাঁদটাকে থামিয়ে দিতে পারত—চাঁদটা শুধু যে পৃথিবীর দিকে পড়ে যাচ্ছে তা নয় একই সাথে সেটা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যদি সেটা না হতো তাহলে আপেলের মতোই চাঁদটা পৃথিবীতে ধপাস করে পড়ত।

AMARBOI.COM

ব্যাপারটা বোঝার জন্যে আমরা 23.3 নং ছবিটা দেখতে পারি। ছবির প্রথম অংশে দেখানো হচ্ছে যদি পৃথিবী চাঁদটাকে নিজের দিকে না টানত—অর্থাৎ চাঁদটা যদি শুধু সামনের দিকে এগুত তাহলে কী হতো। আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে চাঁদটা ই থেকে ঈতে এসে পৌছাত। এর পরের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি চাঁদটার সামনের দিকে কোনো গতি না থাকত (অর্থাৎ চাঁদটাকে থামিয়ে দেয়া যেত) তাহলে কী হতো। আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে চাঁদটা ঈ থেকে উতে এসে পৌছাত। তৃতীয় ছবিটাতে আমরা দেখাচ্ছি যদি চাঁদটা একই সাথে সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং নিচের দিকে নেমে আসে তাহলে কী হতো, আমরা দেখছি সেটা ই থেকে ঈ এবং ঈ থেকে উতে এসে পৌছাত! যেটা হচ্ছে পৃথিবীকে ঘিরে একটা গোলাকার কক্ষপথের ক্ষুদ্র একটা অংশ। চাঁদটা আবার একইভাবে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে নিচে পড়তে থাকবে এবং সম্মিলিতভাবে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঋ বিন্দুতে পৌছাবে। অর্থাৎ সেটা বৃত্তাকারে পৃথিবীকে তার কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে! স্কুলের পদার্থবিজ্ঞান জানলেই আমরা এক মিনিটের মাঝে হিসেব করে বের করে ফেলতে পারব কোন কক্ষপথে থাকার জন্যে চাঁদকে কত বেগে ঘুরতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি!

23.4 নং ছবি : নিউটন আপেল গাছের নিচে বসে ভাবছিলেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের কারণে আপেলটির মতো চাঁদটাও নিচে এসে পড়ছে না কেন?

কাজেই আমার ধারণা সবাই নিশ্চয়ই অনুমান করতে শুরু করেছে স্পেস শাটলে কেন মহাকাশচারীরা ওজনহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। স্পেস শাটল যখন পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকে তখন তার অবস্থা ঠিক চাঁদের মতোন, এটা আসলে প্রতি মুহূর্তেই পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীর দিকে মুক্তভাবে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে সময়টাতে এটা মুক্তভাবে পড়ে যাচ্ছে সেই সময়টাতে এটা আবার সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, সে কারণে এটা সত্যি সত্যি নিচে না পড়ে গোলাকার কক্ষপথের নূতন একটা বিন্দুতে হাজির হয়! এভাবে ব্যাপারটা চলতেই থাকে—আমরা দেখতে পাই স্পেস শাটল পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় এটা মুক্তভাবে পৃথিবীর দিকে পড়ার চেষ্টা করছে!

আমরা জানি কেউ যখন মুক্তভাবে পৃথিবীতে পড়ার চেষ্টা করে তখন সে ওজন অনুভব করে না। (বিজ্ঞানী স্টিফান হকিংসের সেই ছবিটি সবাই দেখেছে। তিনি ভাসছেন।) স্পেস শাটলের ভেতরে যে মহাকাশচারীরা থাকেন তারাও সেই জন্যে কোনো ওজন্য অনুভব করেন না—কারণ স্পেস শাটলের সাথে সাথে তারাও আসলে মুক্তভাবেই পড়ছেন!

কাজেই ওজনহীন হবার জন্যে আসলে মহাশূন্যে যেতে হয় না—পৃথিবীর মাটিতেই ওজনহীন হওয়া সম্ভব—তার জন্যে শুধু একটা উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিয়ে মুক্তভাবে পড়তে হয়—আর কিছু নয়!

AMARBOI.COM

24. পৃথিবীর তাপমাত্রা : পৃথিবীর দুঃখ

গত ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এবং দৃঢ়ভাবে সন্দেহ করা হয়েছে যে এর জন্যে দায়ী হচ্ছে পৃথিবীর মানুষ। মানুষ জ্বালানি পুড়িয়ে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে, এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড অনেকটা গ্রীন হাউস বা কাচ ঘরের মতো—এর ভেতর থেকে তাপ বের হতে পারে না। তাই স্বাভাবিকভাবে পৃথিবী যে তাপটুকু বিকীরণ করে ছড়িয়ে দিতে পারত সেটা আর সেভাবে করতে পারছে না, সে কারণেই পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর কার্বন-ডাই-অক্সাইডের চার ভাগের এক ভাগই আসে মাত্র একটি দেশ থেকে, সে দেশটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মজার ব্যাপার হলো সে দেশের পরিবেশ সংক্রান্ত সিনেট কমিটির সভাপতি কিন্তু পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া ব্যাপারটাই বিশ্বাস করতেন না, তার মতে এটা হচ্ছে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের কাছে করা একটা বিশাল ধাপ্পাবাজি।" সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের বিলাসী জীবনযাপনের মূল্য দিতে হয় কিন্তু

24.1 নং ছবি : পৃথিবীর মানুষ অবিবেচকের মতো বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে

AMARBOI.COM

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ মানুষের। আমরা লক্ষ করেছি কী না জানি না পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার বিপদটা আমরা সম্ভবত টের পেতে শুরু করেছি। বাড়তি তাপমাত্রার কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গিয়েছে, এই দেশে তার সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এ দেশের মানুষ বন্যার সাথে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত কিন্তু এখন শুধু বন্যা নয় শুরু হয়েছে জলাবদ্ধতা। আগে হয়তো বিশ বছরে একটা প্রলয়ঙ্কর বন্যা আসত এখন প্রতি চার-পাঁচ বছরে একটা প্রলয়ঙ্কর বন্যা আসে—সেই বন্যার পানিও আর সহজে নামতে চায় না!

বিজ্ঞানীরা অবশ্যি খুব জোরেশোরে চিৎকার শুরু করেছেন এবং খুব ধীরে ধীরে তার ফল পাওয়া শুরু হয়েছে। পৃথিবীর যেসব দেশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি করে তারা সেটা কমানোর উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। কিন্তু সেটা অনেক সময়ের ব্যাপার, পৃথিবীর মানুষ সম্ভবত তার অনেক আগেই একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝে পড়ে যাবে।

বড় বড় দেশের বড় বড় সরকারকে নাড়াচাড়া করানো খুব সহজ নয় কিন্তু সচেতন মানুষকে কিন্তু সহজেই ভালো কিছু করার জন্যে রাজি করানো যায়। পৃথিবী জুড়ে সেই কাজটি শুরু হয়েছে, সবুজ পৃথিবী আন্দোলন নামে পৃথিবীর অনেক মানুষ সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। কী কী কাজ করে পৃথিবীর কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমানো যায় তার তালিকা করা হচ্ছে, সেই তালিকা ধরে কাজ করা শুরু হয়েছে। সেই কাজের তালিকা দীর্ঘ এবং বিচিত্র। যেমন জাপানের মানুষ ঠিক করেছে তারা গ্রীষ্মকালে কোট-টাই পরা ছেড়ে দেবে। কোট-টাই না পরলে পৃথিবী কেমন করে সবুজ হবে সেটা চট করে বোঝা সম্ভব নয়, কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে শুধুমাত্র কোট-টাই না পরার কারণে জাপানে এক বছরেই 72 হাজার টন কম কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়েছে। কারণটা সহজ, কোট-টাই না পরার কারণে তাদের গরম লেগেছে কম তাই অফিসে এয়ারকন্ডিশন চালাতে হয়েছে কম, সে কারণে ইলেকট্রিসিটি খরচ

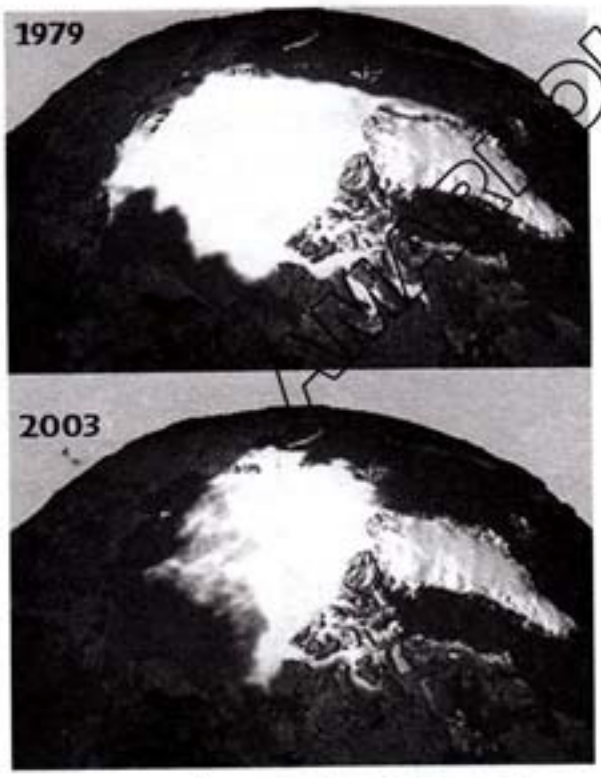

24.2 নং ছবি : ২০ বছরেই মেরু অঞ্চলের বরফ অনেক কমে গিয়েছে

হয়েছে কম, যে কারণে জ্বালানি তেলের সাশ্রয় হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসও তৈরি হতো কম।

কিভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরির পরিমাণ কমানো যায় সেটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে বিজ্ঞানীরা আরও মজার কিছু তথ্য আবিষ্কার করেছেন। যেমন, গরুর গোশত খাওয়া কমিয়ে দিলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াটিতে রাশ টেনে ধরা সম্ভব। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর যে গ্যাসগুলো গ্রীন হাউস এফেক্টের জন্যে দায়ী তার পাঁচ ভাগের এক ভাগই আসে পৃথিবীর গরু, মহিষ, আর ভেড়া থেকে! পৃথিবীতে যত মানুষ সেই সংখ্যার প্রায় অর্ধেক সংখ্যক গরু-মহিষ আর ভেড়া রয়েছে এবং সেটা বেড়েই চলছে। এই গরু-মহিষ-ভেড়ার গোবর থেকে আসে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস, যেটার তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা তিনশ গুণ বেশি! গরু-মহিষ ভেড়ার খাওয়া আর হজম করার প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে আসে মিথেন গ্যাস আর সেই গ্যাসের তাপ ধারণ করার ক্ষমতা 23 গুণ বেশি! বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখছেন যদি একজন মানুষ গরু-মহিষ-ভেড়ার গোশত খাওয়া ছেড়ে দেন তাহলে বছরে দেড় টন করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি হবে। পৃথিবীর মোট কার্বন-ডাই-অক্সাইড হচ্ছে প্রায় ছাব্বিশ বিলিয়ন টন। পৃথিবীর মানুষ হচ্ছে ছয় বিলিয়নের কাছাকাছি, সবাই যদি দেড় টন করে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের দায়িত্ব নিয়ে নিত তাহলেই তো পুরো কার্বন-ডাই-অক্সাইডের চার ভাগের এক ভাগের সমস্যা মিটে যেত!

কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ন্ত্রণে রাখার একটা খুব সহজ উপায় আছে, সেটা হচ্ছে গাছ। গাছ বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে সেটাকে ব্যবহার করে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। একটা গাছ তার জীবদ্দশায় প্রায় এক টন কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে ব্যবহার করতে পারে। তাই পৃথিবীর সব মানুষ যদি বছরে একটা করে গাছ লাগায় তাহলেও আনুমানিক আরো ছয় বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে দূর করে ফেলা যেত! সব গাছই কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে ব্যবহার করতে পারে, তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে দক্ষ হচ্ছে বাঁশ। আমাদের গ্রামবাংলার বাঁশঝাড় আসলে পরিবেশ রক্ষার মস্ত বড় সেনানী!

24.3 নং ছবি : আমাদের দেশে বন্যা হয় এখন অনেক ঘন ঘন এবং থেকে যায় বেশি দিন

তবে এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের খানিকটা দ্বিমত আছে। গাছের

AMARBOI.COM

পাতার রঙ সবুজ, যার অর্থ সে তাপমাত্রা শোষণ করে ধরে রাখে। তাই কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমিয়ে সে একটা বড় উপকার করলেও তাপ শোষণ করে তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে সেটা সমস্যা হতে পারে শুধুমাত্র শীত প্রধান দেশগুলোর জন্যে—আমরা যারা উষ্ণ অঞ্চলে থাকি তাদের জন্যে গাছ এখনও আমাদের পরম বন্ধু।

পৃথিবীর কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমস্যাটি সৃষ্টি করেছে উন্নত দেশের মানুষরা এবং ঠিক করে বললে বলতে হয় সেই দেশের শহুরে মানুষেরা। কাজেই তাদের দায়-দায়িত্বটাও সবচেয়ে বেশি। সচেতন মানুষগুলো সেটা নিয়ে এর মাঝে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে এবং তার জন্যে কাজও করতে শুরু করেছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা আশি ভাগ মানুষ একা একা গাড়ি করে যায়। শুধুমাত্র কয়েক জন মিলে এক গাড়িতে যাবার চেষ্টা করেই সেই দেশে এখন 71 হাজার টন কম কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাস কম তৈরি হচ্ছে। যেসব কোম্পানি বেশি পরিবেশ সচেতন তারা আর এক ডিগ্রি বেশি এগিয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে আমরা গাড়ি চালাই রাস্তার বাম দিকে তাই বাম দিকে কোনো রাস্তায় ঘুরে যাওয়া সহজ। ডান দিকে ঘুরতে হলে অপেক্ষা করতে হয় কখন সামনে থেকে গাড়ি আসা বন্ধ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবাই গাড়ি চালায় রাস্তার ডান দিক দিয়ে তাই সেখানে ডান দিকে ঘুরে যাওয়া সহজ বাম দিকে ঘুরে যেতে হলে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। গাড়ি নিয়ে রাস্তার মোড় অপেক্ষা করা মানেই পেট্রোলের অপচয় আর পেট্রোলের অপচয় মানেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড! নিউইয়র্ক শহরে ই. পি. এস. কোম্পানি তাদের গাড়ির ড্রাইভারদের জন্যে ম্যাপ ঘেঁটেঘুঁটে কম্পিউটার ব্যবহার করে পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যে পথে গেলে তাদেরকে কখনোই আর বামে মোড় নিতে হবে না, তারা শুধু ডান দিকে মোড় নিয়ে নিয়েই তাদের গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবে। শুধু একটা শহরে এই পদ্ধতি চালু করেই তারা এখন বছরে এক হাজার টন কম কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি করছে তাই কয়েক বছরে সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব শহরে এই পদ্ধতি চালু করে ফেলতে যাচ্ছে।

24.4 নং ছবি : কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণের দক্ষ গাছ হচ্ছে বাঁশ

শহুরে মানুষের বড় একটা বিলাসিতা হচ্ছে ইলেকট্রিক লাইট। এর মাঝে ছোট ছোট

AMARBOI.COM

ফ্লোরোসেন্ট লাইট চলে এসেছে যার বিদ্যুৎ খরচ প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। সম্ভবত ভবিষ্যতের ইলেকট্রিক লাইট হবে লাইট এমিটিং ডায়োড বা এল.ই.ডি. দিয়ে যেখানে ইলেকট্রিসিটির প্রায় পুরোটুকু খরচ হয় আলো তৈরি করতে, যেখানে তাপ তৈরি করে কোনো শক্তির অপচয় করা হয় না। এর মাঝে ছোট ছোট উজ্জ্বল সাদা আলোর এল.ই.ডি. চলে এসেছে, শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা মাত্র যখন ঘরে ঘরে লাইট বাল্বের বদলে আমরা এল.ই.ডি. ব্যবহার করব।

পরিবেশবাদীরা এখন ঘরবাড়ি তৈরি করেন অনেক চিন্তাভাবনা করে। প্রকৃতিকে ব্যবহার করে গরমের সময় ঘরকে শীতল রাখা হয় শীতের সময় গরম। যতটুকু শক্তি খরচ করতে হয় তার বাইরে যেন কোনো অপচয় না হয়। কারণ অপচয় মানেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড মানেই গ্রীন হাউস এফেক্ট আর গ্রীন হাউস এফেক্ট মানেই পৃথিবীর মানুষের দুর্দশা।

24.5 নং ছবি : নূতন লাইট বাল্ব চার ভাগের এক ভাগ বিদ্যুৎ খরচ করেই সমান পরিমাণ আলো তৈরি করে

পৃথিবীর সচেতন মানুষেরা যখন কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে কমানোর কাজে লেগেছেন তখন বড় বড় বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদরা বসে নেই, তারা নামছেন তাদের বড় বড় পরিকল্পনা নিয়ে। সেই পরিকল্পনাগুলো প্রায় সময়েই অনেকটা কল্পবিজ্ঞানের মতো। যেমন মহাকাশে বিশাল একটা আয়না বসিয়ে সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে সরিয়ে দিয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমিয়ে দিলে কেমন হয়? কিংবা বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে সালফার ছড়িয়ে পৃথিবীটা শীতল করে ফেললে কেমন হয়? প্রায় নিরুপায় হয়ে বিজ্ঞানীরা আরো আজগুবি পরিকল্পনা করছেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আলাদা করে সেটাকে মাটির নিচে পুঁতে রাখবেন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি ইতোমধ্যে বিষয়টা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

সুইডেন ডেনমার্কে সেটা করার কাজও শুরু হয়েছে, শূন্য হয়ে যাওয়া গ্যাস ফিল্ডে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে সেটাকে সরিয়ে দেয়া হবে!

পৃথিবীকে রক্ষা করার পরিকল্পনার বিশাল তালিকার মাঝে সবচেয়ে সুন্দর পরিকল্পনাটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ। সেটি হচ্ছে সবার জন্যে ভোগ-বিলাসহীন সহজ-সরল একটা জীবন। যে ভোগবাদী জীবনের লোভ দেখিয়ে সারা পৃথিবীকে ছুটিয়ে নেয়া হচ্ছে তার থেকে মুক্তি নিয়ে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমাদের জীবনটি হতে হবে সহজ এবং সরল, আমরা ভোগ করব না, বিলাস করব না, একে-অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করব না—আমরা জীবনকে উপভোগ করব একে-অন্যকে সাহায্য করে।

আমার মনে হয় এটাই হবে নূতন মানব সভ্যতার প্রথম মাইলফলক।

25. বজ্রপাত

কালবৈশাখীর ঝড় শুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে আকাশ যখন কুচকুচে কালো মেঘে ঢেকে যায় এবং সেই মেঘ চিরে যখন বিদ্যুতের ঝলক নেমে আসে এবং তার কয়েক মুহূর্ত পরে যখন গুরুগম্ভীর আওয়াজে চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে ওঠে তার মাঝে এক ধরনের অস্বাভাবিক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে যেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমাদের দেশ ঝড়-বৃষ্টি আর মেঘের দেশ— কাজেই আমরা সবাই কখনো না কখনো মুগ্ধ হয়ে ঝড়-বৃষ্টি আর মেঘ দেখেছি। আমাদের কাছে আকাশের বিজলি এবং গুরুগম্ভীর বজ্রপাতের শব্দে এক ধরনের সাহসিকতা রয়েছে। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বরকে তাই বলা হতো বজ্রকণ্ঠ!

AMARBOI.COM

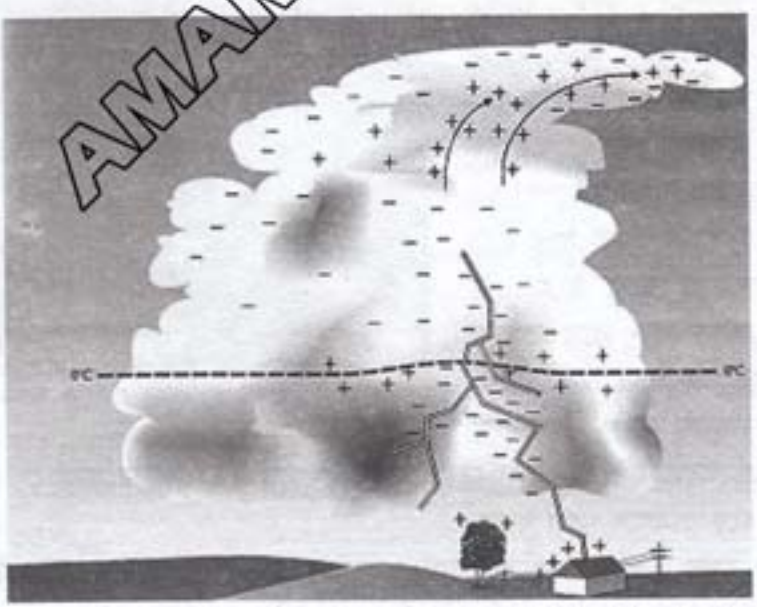

25.1 নং ছবি : মেঘে যখন চার্জ আলাদা হয়ে জমা হয় তখন সেটা বজ্রপাতের জন্ম দেয়

আমরা সবাই জানি বজ্রপাতের সাথে বিদ্যুতের এক ধরনের সম্পর্ক আছে। দৈনন্দিন কাজে কোনো না কোনোভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে নি সে রকম মানুষ আজকাল আর একজনকেও পাওয়া যাবে না। যে ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের কৌতূহল থাকতে পারে সেটা হচ্ছে মেঘের মাঝে কেমন করে বিদ্যুৎ এসে জমা হয়?

যারা একটুখানি বিজ্ঞানও জানে তারাও বলতে পারবে যে পৃথিবীর সবকিছু তৈরি হয়েছে পরমাণু দিয়ে। পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস, যেখানে থাকে পজিটিভ চার্জ এবং সেই পজিটিভ চার্জের আকর্ষণে আটকা পড়ে সেটাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে নেগেটিভ চার্জের ইলেকট্রন। প্রত্যেকটা পরমাণুতে সমান সংখ্যক পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ থাকে বলে মোট চার্জ হচ্ছে শূন্য তাই আমাদের চারপাশের জগৎ হচ্ছে স্বাভাবিক এবং চার্জহীন। যদি কোনোভাবে আমরা এই চার্জকে প্রবাহিত করতে পারি তখন সেটাকে আমরা বলি বিদ্যুতের প্রবাহ। চার্জ যদি হয় দুই রকম তার প্রবাহও হতে হবে দুই রকম, তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ ব্যবহার করি সেটা সব সময়ই হচ্ছে ইলেকট্রনের প্রবাহ, ধাতব পদার্থে কিছু ইলেকট্রন প্রায় মুক্ত অবস্থায় থাকে, তাই সেগুলোর প্রবাহই অনেক সোজা!

বোঝাই যাচ্ছে আমরা যখন একটা বজ্রপাত দেখি সেটা আসলে এরকম একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ যেটা হয় ক্ষণিকের জন্যে এবং দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করে। এই বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্যে প্রথমে চার্জগুলোকে আলাদা হতে হয়, বজ্রপাতের আগে সেটা ঠিক কেমন করে হয় বিজ্ঞানীরা এখনো পুরোপুরি সেটা বুঝে উঠতে পারেন নি। মেঘ জমা হবার সময় জলীয় রূপে যখন উপরে উঠতে থাকে তখন সেই জলীয়বাষ্পের ঘর্ষণের জন্যে কিছু ইলেকট্রন আলাদা হয়ে নিচের মেঘগুলোর মাঝে জমা হতে থাকে। উপরের মেঘের মাঝে ইলেকট্রন কম পড়ে গিয়ে সেটার মাঝে পজিটিভ চার্জের জমা হয়। জলীয়বাষ্প যত উপরে উঠতে থাকে ততই ঠাণ্ডা হতে থাকে, যখন ঠাণ্ডা হতে হতে এটা বরফ হয়ে যেতে শুরু করে তখনো তাদের মাঝে চার্জ জমা হতে থাকে, নেগেটিভ চার্জগুলো থাকে নিচে এবং পজিটিভ চার্জ থাকে উপরে—বলা যেতে পারে মেঘের দুই ধরনের চার্জ যেন একটা বিশাল ক্যাপাসিটর হয়ে আকাশে ঝুলে থাকে।

25.2 নং ছবি : নিউইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ে বজ্রপাত

কোথাও যখন এভাবে চার্জকে আলাদা হয়ে যেতে দেখা যায় তখন সেটাকে বলে স্থির বিদ্যুৎ। শীতকালে শুকনো মাথায় চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানোর পর আমরা প্রায় সবাই ছোট

AMARBOI.COM

ছোট কাগজকে সেই চিরুনি দিয়ে আকর্ষণ করিয়েছি। এটা ঘটে চার্জ আলাদা হয়ে চিরুনিতে স্থির বিদ্যুৎ জমা হবার কারণে। আমাদের দেশের বাতাসে জলীয়বাষ্প তুলনামূলকভাবে বেশি, শীতের দেশের বাতাস হয় শুষ্ক, সেখানে স্থির বিদ্যুৎ আরো অনেক বেশি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কার্পেটে হাঁটলে জুতোর সাথে ঘষা খেয়ে শরীরে এত স্থির বিদ্যুৎ জমা হয়ে যেত যে দরজা খোলার সময় দরজার নবের কাছে হাত আনতেই শরীরের স্থির বিদ্যুৎ স্পার্ক হিসেবে দরজার নবে ছুটে যেত! দীর্ঘদিন ওরকম পরিবেশে থাকতে থাকতে নিজের অজান্তেই আমার একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, দরজা খোলার আগে পকেট থেকে চাবি বের করে চাবির মাথাটাকে স্পার্ক হতে দেয়ার জন্যে ব্যবহার করা। স্পার্কটা যেহেতু আঙ্গুল থেকে বের না হয়ে চাবি থেকে বের হতো তাই বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার অস্বস্তিকর অনুভূতিটা হতো অনেক কম।

যাই হোক আকাশে যখন মেঘের ভেতর প্রচুর চার্জ জমা হয়ে যায় তখন তার স্বাভাবিক পরিণতি হতে চার্জটুকু কোনোভাবে সরিয়ে দিয়ে একটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং সেটাই হচ্ছে বজ্রপাত। বজ্রপাতের ব্যাপারটা হঠাৎ করে ঘটে না, তার জন্যে একটা প্রস্তুতি হয়, প্রথমে মেঘের ভেতরকার নেগেটিভ চার্জের জন্যে নিচে মাটিতে এক ধরনের পজিটিভ চার্জ জমা হয়। এক সময় মেঘের নিচে থেকে "স্টেপ লিডার" নামে এক ধরনের খুব হালকা আলোকিত আভা সাপের মতো এঁকেবেঁকে নিচে নেমে আসতে থাকে, তখন মাটি থেকেও একই ধরনের একটা আলোকিত আভা উপরের দিকে উঠতে থাকে যেটাকে বলা হয় পজিটিভ স্ট্রিমার। এর ভেতর দিয়ে যে বৈদ্যুতিক কারেন্ট বা প্রবাহ হয় সেটা শ'খানেক এম্পিয়ারের মতো (আমরা আমাদের বাসায় পাঁচ থেকে দশ এম্পিয়ার কারেন্ট ব্যবহার করি) উপর থেকে নেমে আসা স্টেপ লিডার আর নিচে থেকে উপরে ছুটে যাওয়া পজিটিভ স্ট্রিমার যখন একটা আরেকটাকে স্পর্শ করে তখন তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়। মেঘের ভেতর জমা হয়ে থাকা বিশাল চার্জ তখন আক্ষরিক অর্থে লক্ষ মাইল বেগে নিচে ছুটে আসে। বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ তখন হয়ে যায় প্রায় লক্ষ এম্পিয়ার। এই বিশাল পরিমাণ বিদ্যুৎ যখন বাতাস ভেদ করে নিচে ছুটে আসে তখন বাতাসটা 20 থেকে 30 হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত গরম হয়ে যায়, যেটা সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা থেকে বেশি!

25.3 নং ছবি : বজ্রপাতের মুহূর্তে প্রায় লক্ষ এম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহ হতে পারে

এই প্রচণ্ড তাপমাত্রার কারণে আমরা নীলাভ সাদা আলোর একটা জ্বালানি দেখতে পাই। তাপমাত্রার কারণে আরো একটা ব্যাপার ঘটে, বাতাসটুকু ফুলে-ফেঁপে বাইরের দিকে ছড়িয়ে

পড়ে প্রচণ্ড গতিতে এবং তার কারণে গগনবিদারি একটা শব্দ হয় যেটাকে আমরা বজ্রপাতের শব্দ হিসেবে শুনি। যে কোনো শব্দের জন্যে কোনো কিছুকে নড়তে-চড়তে হয়, কাঁপতে হয় যদি সেই নাড়াচাড়া বা কাঁপাটুকু শব্দের গতি থেকে দ্রুতগতিতে হয় তাহলে সেটাকে বলে শক ওয়েভ। বজ্রপাতের শব্দটা আসলে শক ওয়েভ, শক ওয়েভের মাঝে আসলে অনেক শক্তি থাকে, কাছাকাছি কোথাও বজ্রপাত হলে প্রচণ্ড শব্দে ঘরের দরজা-জানালা ভেঙে যাওয়া তাই এত বিচিত্র কিছু না।

বজ্রপাত থেকে আলো আর শব্দ দুটি বের হওয়ার কারণে আমরা সাধারণত একটা মজার জিনিস করতে পারি, বজ্রপাতটা কত দূরে বের হয়েছে সেটা মোটামুটি নিখুঁতভাবে বের করে ফেলতে পারি। আলোর গতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার, কাজেই বজ্রপাতের আলোর ঝলকানিটা আমরা বলতে গেলে সাথে সাথেই দেখি। বাতাসে শব্দের গতি সেকেন্ডে মাত্র সাড়ে তিনশ মিটার অর্থাৎ এক কিলোমিটার যেতে প্রায় তিন সেকেন্ড সময় লাগে। কাজেই আলোর ঝলকানির কত সেকেন্ড পর শব্দটা শোনা গেছে সেটা দেখে তাকে তিন দিয়ে ভাগ দিলেই বজ্রপাতটা কত কিলোমিটার দূরে হয়েছে মোটামুটি নিখুঁতভাবে বের করে ফেলা যায়। সত্যি কথা বলতে কী সময় মাপার জন্যে ঘড়ি দেখারও প্রয়োজন নেই, "এক হাজার এক" "এক হাজার দুই" এভাবে বলতে এক সেকেন্ড করে সময় লাগে, কাজেই যত সংখ্যা পর্যন্ত গোনা যায় তত সেকেন্ড পার হয়েছে ধরে নেয়া যায়। অন্যদের কথা জানি না, বজ্রপাতে আলোর ঝলকানি দেখলেই আমি নিজের অজান্তে "এক হাজার এক" "এক হাজার দুই" গুনতে শুরু করে দিই।

AMARBOI.COM

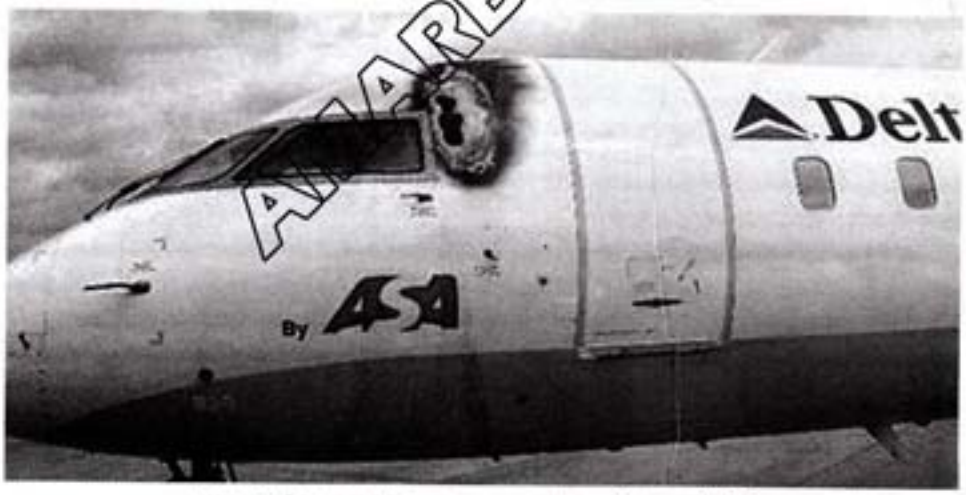

25.4 নং ছবি : আকাশে ওড়ার সময় বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত একটি বিমান

বজ্রপাতে আমরা সবসময়ই দেখি আলোর ঝলকানিটি কেঁপে কেঁপে ওঠে, ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে যে আমরা সবসময় চোখে দেখে আলাদা করতে পারি না। ভিডিও ক্যামেরা বা অন্য

কিছু দিয়ে আলোর ঝলকানিটুকু ধরে রাখলে দেখা যাবে বজ্রপাতের সময় পুরো ব্যাপারটা সেকেন্ডের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের মাঝেই কয়েকবার ঘটে যেতে পারে।

পৃথিবীতে গড়ে প্রতি সেকেন্ডে 100টা বজ্রপাত হয়—পৃথিবীর কোথাও হয় বেশি কোথাও হয় কম। আকাশের মেঘ থেকে যেহেতু বিদ্যুৎ নিচে নেমে আসে তাই এটা সাধারণত উঁচু জিনিসকে সহজে আঘাত করে। বজ্রপাত থেকে রক্ষা করার জন্যে উঁচু বিল্ডিংয়ের উপর ধাতব একটা সূচালো শলাকা লাগিয়ে রাখা হয়, সেটা মোটা বিদ্যুৎ সুপরিবাহী তার দিয়ে মাটির গভীরে নিয়ে যাওয়া হয়। পেছনের বিজ্ঞানটুকু খুব সহজ, আকাশ থেকে নেমে আসা বিদ্যুৎ অনিয়ন্ত্রিতভাবে না গিয়ে এই মোটা তারের ভেতর দিয়ে মাটির গভীরে চলে যাবে। অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিতভাবে না হয়ে বজ্রপাতটা হবে এই সূচালো শলাকার উপর।

সূচালো শলাকায় শুধু যে বজ্রপাত হয় তা নয়, এই সূচালো শলাকার ভেতর দিয়ে বিপরীত চার্জ বের হয়ে উপরে মেঘের মাঝে জমে থাকা চার্জকে কমিয়ে দিতে পারে। কাজেই অনেক সময়েই বজ্রপাতের আশঙ্কাটাকেও এই ধাতব শলাকা কমিয়ে আনতে পারে।

বিদ্যুৎ পরিবাহী ধাতব শলাকার ভেতর দিয়ে চার্জকে প্রবাহিত করে মাটির গভীরে নিয়ে যাওয়ার এই ধারণাটা দিয়েছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন। একটা উঁচু গির্জার উপরে তার একটা ধাতব শলাকা লাগানোর পরিকল্পনা ছিল, গির্জাটা তৈরি হতে দেরি হচ্ছিল বলে এক মেঘলা দিনে তিনি তার ছেলেকে নিয়ে আকাশে একটা ঘুড়ি ওড়ালেন। ঘুড়ির সুতোয় একটা চাবি লাগিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, এমনিতে ঘুড়ির সুতো বিদ্যুৎ অপরিবাহী তাই আকাশের মেঘ থেকে কোনো বিদ্যুৎ নেমে আসছিল না, কিন্তু বৃষ্টিতে সুতো ভেজা মাত্র বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে মেঘের মাঝে জমে থাকা বিদ্যুৎ নেমে এলো, সুতোর সাথে বেঁধে রাখা চাবি থেকে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ (স্পার্ক) বের হতে থাকে! যে বিষয়টা দেখতে চেয়েছিলেন সেটা সন্দেহাতীতভাবে দেখেছেন সত্যি কিন্তু এই বিপজ্জনক পরীক্ষাটা করতে গিয়ে আরেকটু হলে তিনি নিজে এবং তার ছেলে মারা পড়তে পারতেন!

25.5 নং ছবি : বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন পরিবাহী তার দিয়ে বজ্রপাতের বিদ্যুৎ নিচে নিয়ে আসার বিপজ্জনক পরীক্ষাটি করেছিলেন সবার আগে

বজ্রপাতে প্রতি বছরই কিছু মানুষ মারা যায়। মজার কথা হলো বজ্রপাতের শিকার হয়ে শতকরা নব্বই জন মানুষ কিন্তু বেঁচেও যায়। রয় সুলিভান নামে একজন মানুষের সাত সাত বার বজ্রপাত হওয়ার পরও সে বেঁচে ছিল। কেউ যেন তাই

AMARBOI.COM

বলে বজ্রপাতকে হেলাফেলা করে না নেয়—বজ্রপাতের সময় যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় সেটা কিন্তু ছেলেখেলা নয়!

মানুষ সেই আদিকাল থেকে বজ্রপাত দেখে আসছে কিন্তু এখনো যে এটাকে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে তা নয়। আগে বলা হয়েছে মেঘের নিচের অংশে থাকে নেগেটিভ চার্জ, সেটা থেকে বজ্রপাত হয়। কিন্তু উপরের পজিটিভ চার্জটুকু কী করে, সেখান থেকে কী বজ্রপাত হতে পারে না? আমরা সবাই মেঘ থেকে মেঘে বজ্রপাত হতে দেখেছি, সেখানে এই পজিটিভ চার্জটুকু ব্যবহার হয় কিন্তু কখনো কখনো এই পজিটিভ চার্জ থেকে সরাসরি বজ্রপাত ঘটে যায়। এই বজ্রপাতগুলো সাধারণ বজ্রপাত থেকে প্রায় দশগুণ বেশি শক্তিশালী, তাই প্রায় দশগুণ বিধ্বংসীকারী। সবচেয়ে যেটা ভয়ের কথা, পৃথিবীর মানুষ এই পজিটিভ বজ্রপাতের খবর পেয়েছে মাত্র বছর ত্রিশেক আগে। আকাশে যে প্লেন উড়ে সেগুলোতে সাধারণ বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাবার মতো নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পজিটিভ বজ্রপাত থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা পুরোপুরি নেই!

বজ্রপাতে শুধু যে আলো, শব্দ এবং ধ্বংস হয় তা নয়, এর মাঝে আরো কিছু ব্যাপার ঘটে, যেটা বিজ্ঞানীরা কখনো কল্পনা করেন নি। ধারণা করা হতো শক্তিশালী গামা রে আসে শুধু পৃথিবীর বইরের মহাজগৎ থেকে। মাত্র কিছুদিন হলো বিজ্ঞানীরা দেখেছেন বজ্রপাত থেকেও কোনো একটা বিচিত্র উপায়ে শক্তিশালী গামা রে বের হয়ে আসে!

বিষয়টা বোঝার জন্যে বিজ্ঞানীরা মাঠে নেমেছেন, আমরাও আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি সেটা তাদের মুখ থেকে শোনার জন্যে!

AMARBOI.COM

26. ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড়ের সাথে আমাদের নিত্য বসবাস। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় হিসেবে এখনো 1910 সালের 12 নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়টির কথা বলা হয়—অনুমান করা হয় সে রাতে প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। (আমি সেটা দেখেছিলাম—জোছনার এক ধরনের আলো ছিল, তার মাঝে প্রচণ্ড ঝড়ে গাছপালা মাথা কুটছে, এরকম একটা দৃশ্য আমার স্মৃতির মাঝে গেঁথে আছে।) এই ঘূর্ণিঝড়ের সাথে বাংলাদেশের জন্মের একটা সম্পর্ক আছে। তখন এই দেশটা ছিল পাকিস্তানের অংশ, ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট—এরকম ভয়ঙ্কর একটা ঘূর্ণিঝড় হয়েছে জানার পরও এই মানুষটি চীন থেকে ফেরার পথে উপদ্রুত এলাকা দেখতে যায় নি! এই দেশের মানুষ সেদিন বুঝে গিয়েছিল পাকিস্তানের সাথে তাদের থাকা যাবে না! এর পরের নির্বাচনেই বাংলাদেশের মানুষ নতুন রাষ্ট্রের সূচনাটি করে দিয়েছিল!

26.1 নং ছবি : 1970 সালের 12 নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়টি পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘূর্ণিঝড়ের একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়

ঘূর্ণিঝড় সম্ভবত প্রকৃতির চমকপ্রদ কিছু বিষয়গুলোর মাঝে একটি। যখন উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর ছবি তোলা যেত না তখন সেটা এত স্পষ্ট করে মানুষ দেখে নি। এখন উপগ্রহের ছবিতে মানুষ স্পষ্ট দেখতে পায় একটা ঘূর্ণিঝড় জন্ম নিচ্ছে তারপর তার বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। তার ভেতর সঞ্চিত রয়েছে কী অমিত শক্তি, কার সাধ্যি আছে তার সাথে যুদ্ধ করে। ভূমিকম্পের মতো সেটি গোপনে এসে আঘাত করে না, সে তার উপস্থিতির কথা জানিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে, মানুষকে তার অদম্য ক্রোধের হাত থেকে রক্ষা পাবার একটা সুযোগ দিয়ে রাখে!

AMARBOI.COM

যারা ঘূর্ণিঝড়ের ছবি দেখেছে তারা সবাই জানে এর মাঝে আসলেই একটা ঘূর্ণন আছে। উত্তর গোলার্ধে সেটা হয় ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে—দক্ষিণ গোলার্ধে সেটা ঘড়ির কাঁটার দিকে। পৃথিবী তার অক্ষে ঘুরপাক খাচ্ছে বলে এটা ঘটে এবং এরকম যে হবে সেটা কেউ ইচ্ছে করলে ঘরে বসেই পরীক্ষা করতে পারবে! বাথটাব বা বেসিনে পানি ভরে হঠাৎ করে নিচের ফুটোটুকু খুলে পানিটাকে চলে যেতে দিলে দেখা যায় সেটা সোজাসুজি না গিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে যাচ্ছে এবং উত্তর গোলার্ধে সেটা সবসময়েই হয় ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে! (ঘূর্ণন বোঝানোর জন্যে সবসময়েই বলা হয় ঘড়ির কাঁটার দিকে কিংবা ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে। আজকাল ডিজিটাল ঘড়ি এসেছে, কিছুদিন পর যদি শুধু ডিজিটাল ঘড়িই থাকে তাহলে ঘূর্ণনের দিক বোঝাব কেমন করে?) আমি এখনো দক্ষিণ গোলার্ধে যাই নি তাই সেখানে যে ঘূর্ণনটা হয় ঘড়ির কাঁটার দিকে সেটা এখনো পরীক্ষা করে দেখতে পারি নি!

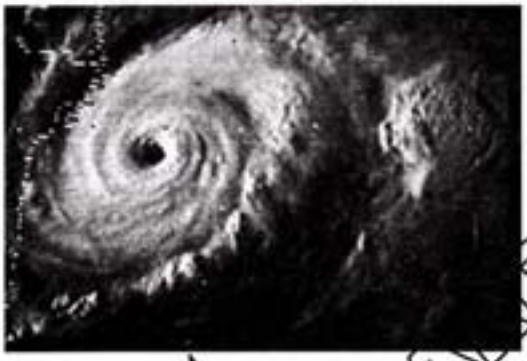

26.2 নং ছবি : উপগ্রহ থেকে এখন খুব সহজেই পৃথিবীর বুকে ঘূর্ণিঝড়কে দেখা যায়

একটা ঘূর্ণিঝড়ের মাঝে অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন ঘূর্ণিঝড় যে পরিমাণ তাপশক্তি তৈরি করে (বিলিয়ন মেগাওয়াট) সেটা সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় তার একশ গুণ! প্রকৃতি যে পদ্ধতিতে একটা ঘূর্ণিঝড়ের মাঝে এই বিশাল শক্তি সঞ্চয় করে সেটা অত্যন্ত চমকপ্রদ। শক্তিটা আসে সমুদ্রের পানি থেকে। সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা যখন 26.5ক্ষ-তে পৌছায় তখন সমুদ্রের পানি থেকে শক্তিটা ঘূর্ণিঝড়ের যেতে পারে। সে জন্যে আমরা কখনো শীতকালে ঘূর্ণিঝড় হতে দেখি না—এটা সবসময়েই হয় গ্রীষ্মের শুরুতে যখন তাপমাত্রা এখানে পৌছায় আবার শীতের শুরুতে যখন তাপমাত্রা এখানে নেমে আসে। বাংলাদেশকে "উত্তর ভারত মহাসাগর" এলাকার মাঝে ফেলা হয়, এই এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের আনুষ্ঠানিক সময় এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর। বাংলাদেশের বড় বড় সব ঘূর্ণিঝড় হয়েছে মে মাস কিংবা অক্টোবর-নভেম্বর মাসে।

ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়ার জন্য প্রথমে নিম্নচাপের সৃষ্টি হতে হয়। "নিম্নচাপ" কথাটার অর্থ হচ্ছে বাতাসের চাপ কমে যাওয়া—সেই চাপ পূরণ করার জন্যে আশেপাশের অঞ্চল থেকে বাতাস সেখানে ছুটে আসতে থাকে। বাথটাব কিংবা বেসিনের পানি ছুটে আসার সময় যেরকম ঘূর্ণন শুরু হয়—এখানেও সেভাবে, বাতাসের একটা ঘূর্ণন শুরু হতে পারে। বাতাসের ঘূর্ণনকে পুরোপুরি তৈরি করতে হলে তার মাঝে শক্তি দিতে হবে এবং এই শক্তি দেয়ার প্রক্রিয়াটি ঠিকভাবে শুরু হলো কী না তার উপরেই নির্ভর করে একটা ঘূর্ণিঝড় জন্ম নেবে কী নেবে না।

AMARBOI.COM

যে প্রক্রিয়ায় একটা ঘূর্ণিঝড়ে সমুদ্রের পানি থেকে শক্তি দেয়া হয় সেটা খুব সহজ এবং চমকপ্রদ। গরমের দিনে আমরা যখন খুব ভিড়ের ভেতর থেকে হঠাৎ করে খোলা জায়গায় এসে হাজির হই তখন আমরা এক ঝলক শীতল অনুভব করি। তার কারণ ভিড়ের মাঝে গরমে আমরা ঘেমে যাই, যখন হঠাৎ ফাঁকা জায়গায় যাই বাতাসে সেই ঘাম শুকায়, যার অর্থ ঘামের পানিটুকু বাষ্পীভূত হয়। পানি বাষ্পীভূত হওয়ার জন্যে তাপের দরকার, পানি সেই তাপটুকু নেয় শরীর থেকে, তাই শরীরটা শীতল হয়ে যায়।

আমরা যদি বিশ্বাস করে নিই যে পানিকে বাষ্পীভূত করা হলে পানিটুকু তাপ নিয়ে নেয় তাহলে তার উল্টোটাও নিশ্চয়ই সত্যি। বাষ্পীভূত জলীয়বাষ্প যদি পানির ফোঁটায় পাল্টে যায় তাহলে তাকে তাপ দিতে হবে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হওয়ার সময় ঠিক সেটা ঘটে, সমুদ্রের বাষ্পীভূত পানি উপরে উঠে গিয়ে পানির ফোঁটায় পরিণত হয় তখন সে তাপ দিতে থাকে! সেই তাপ শক্তি তখন বাতাসকে গতিশীল করে তোলে, সেই বাতাস তখন দ্রুত ছুটতে থাকে (শক্তি বেশি তাই গতি বেশি!) বাতাস যখন আরো দ্রুত ঘুরতে থাকে তখন নিচের সমুদ্রের পানি আরো দ্রুত বাষ্পীভূত হতে থাকবে—যদি আরো দ্রুত বাষ্পীভূত হয় তাহলে সেই বাষ্প উপরে উঠে আরো দ্রুত তাপ ছড়াতে থাকবে—আরো বেশি শক্তি সঞ্চিত হবে ঘূর্ণিঝড়ের মাঝে।

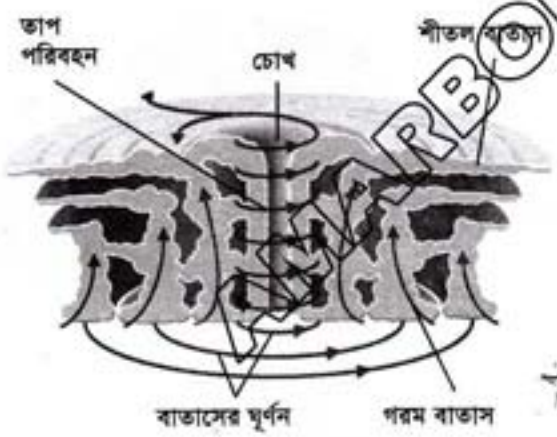

26.3 নং ছবি : প্রকৃতি যে পদ্ধতিতে ঘূর্ণিঝড়ে শক্তি সঞ্চয় করে সেটি চমকপ্রদ

বড় কেটলির মাঝখানে তাপ দিলে গরম পানিটুকু উপরে উঠে যায়, ঠাণ্ডা পানি কেটলির কিনারা দিয়ে নিচে নেমে আবার কেটলির মাঝখানে হার্ট হয়—সেখান থেকে গরম হয়ে আবার উঠে যায়। এভাবে ক্রমাগত একটা পরিবহন হতে থাকে আর তাপটুকু খুব চমৎকারভাবে পানির মাঝে সঞ্চালিত হয়। ঘূর্ণিঝড়েও এরকম তাপের পরিবহনের একটা ব্যাপার ঘটে—সমুদ্রের বাষ্পীভূত পানি তাপটাকে উপরে নিয়ে যায়, উপরে সেটা পানির ফোঁটায় পাল্টে গিয়ে তাপটুকু ছড়িয়ে দেয়। ঘূর্ণিঝড়ের বাইরের অংশ দিয়ে বাতাস আবার নিচে নেমে আসে—ঘূর্ণনের মাঝে দিয়ে মাঝখানে এসে আবার উপরে উঠে যায়। পুরো ব্যাপারটা একটানা ঘটতে থাকে। যতই সেটি ঘটে ততই আরো বেশি ঘটার প্রক্রিয়া শুরু হয়। একটা ব্যাপার যখন সেটা আরো বেশি ঘটাতে শুরু করে তখন সেটাকে বলে "পজিটিভ ফিড ব্যাক" আর এই প্রক্রিয়ায় একটা ঘূর্ণিঝড়ের মাঝে বিশাল একটা শক্তি সঞ্চয় হয়। ঘূর্ণিঝড় তখন তার সেই বিশাল শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে—পৃথিবীর মানুষ হতবাক হয়ে সেই ঘূর্ণিঝড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে!

AMARBOI.COM

একটা ঘূর্ণিঝড় যখন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় তখন ঠিক তার কেন্দ্রে তৈরি হয় ঘূর্ণিঝড়ের "চোখ" বা eye, সেটি হচ্ছে 30 থেকে 40 km বিস্তৃত একটা এলাকা যেটা আশ্চর্য রকম শান্ত! এই কেন্দ্রকে ঘিরে ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ড তুলকালাম ঘটতে থাকে কিন্তু ঠিক মাঝখানে কিছু নেই—এমন কী অনেক সময় সেটা থাকে মেঘমুক্ত, শান্ত। সমুদ্রে মহাসমুদ্রে যখন ঘূর্ণিঝড় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় তখন সেটা মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারে না—সেটা মানুষের ক্ষতি করে যখন সেটা স্থলভূমিতে মানুষের লোকালয়ে হাজির হয়। যারা নিজের চোখে ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি আঘাত দেখেছেন তারা সবাই ঘূর্ণিঝড়ের "চোখ" বা eyeটি দেখেছেন। প্রথমে দেখা যায় বাতাস একদিক থেকে অন্যদিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাচ্ছে। ঠিক যখন ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রটি হাজির হয় তখন মনে হয় ঝড় থেমে গেছে। আকাশে মেঘ নেই, পরিষ্কার আকাশ। যারা ব্যাপারটা জানে না তারা ঘর থেকে বের হয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করতে শুরু করে। দেখতে দেখতে ঘূর্ণিঝড়ের চোখ এলাকাটাকে অতিক্রম করে আবার প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করে—এবারে সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে—মানুষের বিস্ময়ের সীমা থাকে না!

ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় সমুদ্রে, তাই সেটা যখন উপকূলে আঘাত হানে তখন সাথে নিয়ে আসে জলোচ্ছাস। সেই বিশাল জলোচ্ছাসে তলিয়ে যায় উপকূলের বিস্তৃত এলাকা! আমরা জানি আমাদের দেশে সেই জলোচ্ছাসের আকার হয় বিশ থেকে ত্রিশ মিটার—কার সাধ্যি আছে সেই বিশাল জলরাশিকে আটকে রাখার?

ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে প্রকৃতির একটা ইঞ্জিন, তাপশক্তির ইঞ্জিন। সমুদ্রের পানি থেকে তাপ নিয়ে সেই ইঞ্জিন বাতাসে ঘূর্ণিঝড় তৈরি করে। যদি কোনোভাবে সেই তাপ নেয়ার প্রক্রিয়াটা বন্ধ করে দেয়া যায়

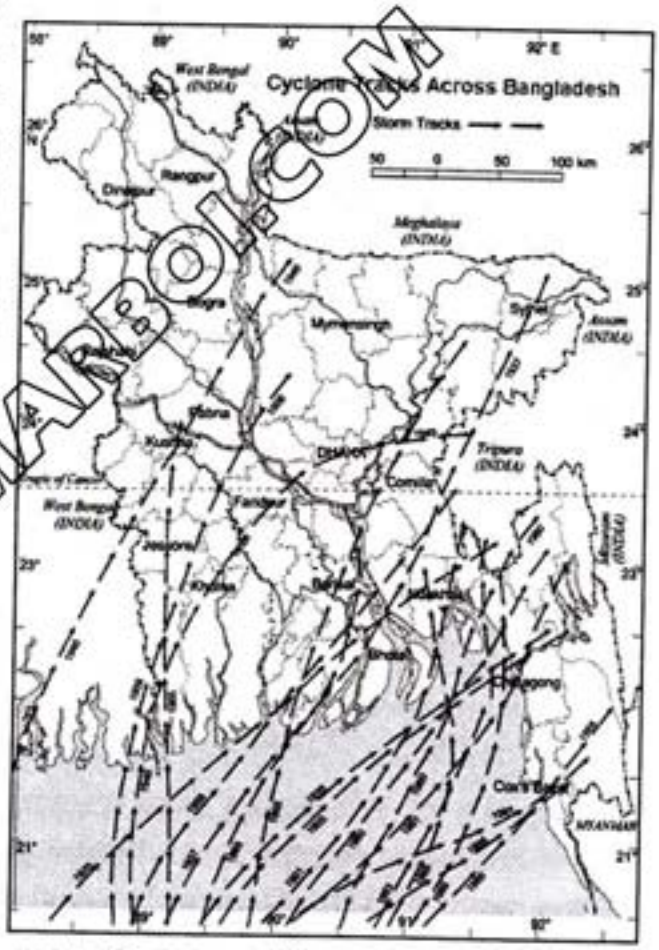

26.4 নং ছবি : বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের সাথে মানুষের নিত্য সহ-অবস্থান

AMARBOI.COM

তাহলেই এই বিশাল ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে। আসলেও সেটা হয় যখন ঘূর্ণিঝড়টি স্থলভূমিতে উপস্থিত হয়। তখন নিচে সমুদ্রের উষ্ণ পানি নেই, সেই পানি থেকে জলীয়বাষ্প হিসেবে উপরে তাপ পাঠানোর কোনো উপায় নেই। তাই আমরা দেখতে পাই স্থলভূমিতে আসার পর ঘূর্ণিঝড় দেখতে দেখতে দুর্বল হয়ে যায়—সাধারণ ঝড় বৃষ্টিতে পাল্টে গিয়ে সেটা শেষ হয়ে যায়।

আগে ঘূর্ণিঝড়ের নাম ছিল না, ইদানীং তাদের নাম দেয়া শুরু হয়েছে। প্রথমে ঘূর্ণিঝড়ের নাম হতো মেয়েদের নামে। খুব সঙ্গত কারণেই মেয়েরা আপত্তি করল, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের নাম কেন মেয়েদের নামে হবে? এখন নামকরণের পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়েছে—একটা ছেলের নাম এরপর একটা মেয়ের নাম। এক এলাকায় যেসব দেশে ঘূর্ণিঝড় আঘাত করে সেই সব দেশ নামগুলো দেয়। বাংলাদেশের দেয়া নামগুলোর মাঝে আছে অনিল, অগ্নি, নিশা, গিরি বা চপলার মতো নাম। কিছুদিন আগে বাংলাদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় "সিডর" নামটি ছিল ওমানের দেয়া, তার পরের নাম 'নার্গিস' নামটি পাকিস্তানের।

26.5 নং ছবি : ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের মানুষের নামে নামকরণ করা কতটুকু যৌক্তিক ভেবে দেখার সময় হয়েছে

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যেসব নাম মানুষের নাম হিসেবে প্রচলিত সেই নামগুলো ঘূর্ণিঝড়ের জন্যে ব্যবহার করা ঠিক নয়। সেই নামে কোনো মানুষ থাকলে সে আহত হয় এবং একটা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের পর সেই নামটি পৃথিবী থেকে মুছে যায়। ক্যাটারিনা খুব সুন্দর একটা নাম কিন্তু 2005 সালে আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সম্পদ ধ্বংসকারী (100 বিলিয়ন ডলার) ঘূর্ণিঝড় হওয়ার পর সেই দেশে কেউ তার কন্যা সন্তানের নাম ক্যাটারিনা রাখে না।

ঘূর্ণিঝড়ের মূল বিষয়টা বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন বলে সেটাকে থামানোর জন্যে কিছু যে চেষ্টা করা হয় নি তা নয়। আকাশে সিলভার আয়োডাইড ছড়িয়ে পানিকে শীতল করে দিয়ে ঘূর্ণিঝড়কে দুর্বল করার চেষ্টা হয়েছে। ঠিক যেখান থেকে উষ্ণ পানির তাপ আকাশে উঠে যায় সেখানে বরফের চাঁই (হিম শৈল) টেনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে—এমন কী নিউক্লিয়ার বোমা ফাটিয়ে ঘূর্ণিঝড়কে ছিন্নভিন্ন করার কথাও যে আলোচিত হয় নি তা নয়!

কিন্তু মানুষ পর্যন্ত টের পেয়েছে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করা চারটিখানি কথা নয়। প্রকৃতিকে বিরক্ত না করে তার সাথে তাল মিলিয়ে বেঁচে থাকাই হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ!

27. শক্তির নবায়ন

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসকে সহজভাবে বলা যায় শক্তি ব্যবহারের ইতিহাস—এখানে শক্তি শব্দটা কিন্তু সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয় নি, বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে শক্তি বলতে বোঝানো হচ্ছে তাপ কিংবা বিদ্যুতের মতো শক্তিকে, রাজনৈতিক বা সামাজিক শক্তির মতো শক্তিকে নয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, কোনো দেশ কতটা উন্নত সেটা বোঝার একটা সহজ উপায় হচ্ছে মাথাপ্রতি তারা কতটুকু বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে তার একটা হিসেব নেয়া। উদাহরণ দেবার জন্যে বলা যায় আমরা মাথাপিছু যেটুকু বিদ্যুৎ খরচ করি—যুক্তরাষ্ট্র খরচ করে তার থেকে একশগুণ বেশি। কাজেই এটা অনুমান করা কঠিন নয় আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে তাদের দৈনন্দিন জীবন সম্ভবত একশগুণ বেশি আরাম-আয়েশের।

AMARBOI.COM

আমরা আমাদের জীবনে যে কয় ধরনের শক্তি ব্যবহার করি তার মাঝে চট করে যে দুটোর নাম মনে আসে সেগুলো হচ্ছে তাপ আর বিদ্যুৎ। আমরা রান্নাবান্না করার জন্যে তাপ শক্তি ব্যবহার করি। কখনো সেটা আসে গ্যাসের চুলোর আগুনে, কখনো লাকড়ির আগুনে কখনোবা বৈদ্যুতিক হিটারে। জীবনকে আরামদায়ক করার

27.1 নং ছবি : নদীতে বাঁধ দিয়ে পানিকে আটকে রেখে তৈরি হয় জল বিদ্যুৎ

জন্যে যে শক্তিটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি। লোড শেডিংয়ের কারণে যখন বিদ্যুৎ চলে যায় তখন আমরা এর গুরুত্বটা হাড়ে হাড়ে টের পাই। তখন ঘরে আলো জ্বলে না, ফ্যান ঘুরে না, টেলিভিশন চলে না। সত্যি কথা বলতে কী আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবকিছুই মোটামুটি বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। সে জন্যে আমরা বিদ্যুৎকে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাই। যে কয় ধরনের শক্তি আমরা ব্যবহার করি তার মাঝে বিদ্যুৎ সবচেয়ে জনপ্রিয় শক্তি কারণ বিদ্যুৎকে সবচেয়ে সহজে অন্য রূপে পরিবর্তন করা যায়। আমরা লাইট বাল্ব ব্যবহার করে বিদ্যুৎকে আলোতে রূপান্তর করি। হিটার দিয়ে তাপে রূপান্তর করি, ফ্যান দিয়ে যান্ত্রিক শক্তিতে আর স্পিকার দিয়ে শব্দ শক্তিতে। শুধু যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাল্টে দিতে পারি তা নয়—এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সেটা খুব সহজে নিয়ে যেতে পারি। প্রয়োজন হলে ব্যাটারির মাঝে আমরা বিদ্যুৎ শক্তিকে জমা করেও রাখতে পারি, যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছে তারা সবাই সেটা জানে!

27.2 নং ছবি : আমাদের দেশের গোবরের ঘুঁটে বায়োমাসের একটা উদাহরণ

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসটা যেহেতু শক্তি ব্যবহারের ইতিহাস তাই আমরা দেখতে পাই আজ পৃথিবীতেই সব দেশ সব জাতির ভিতরেই শক্তির জন্যে এক ধরনের চেষ্টা কাজ করছে। যে যেভাবে পারছে সেভাবে শক্তির অনুসন্ধান করছে, শক্তিকে ব্যবহার করছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীর শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে তেল, গ্যাস বা কয়লা। অনেক দেশ নিউক্লিয়ার শক্তিকে ব্যবহার করছে সেখানেও এক ধরনের জ্বালানির দরকার হয়, সেই জ্বালানি হচ্ছে ইউরেনিয়াম। এই শক্তিগুলোর মাঝে একটা মিল রয়েছে—এগুলো ব্যবহার করলে খরচ হয়ে যায়। মাটির নিচে কতটুকু তেল, গ্যাস, কয়লা আছে কিংবা পৃথিবীতে কী পরিমাণ ইউরেনিয়াম আছে মানুষ এর মাঝে সেটা অনুমান করে বের করে ফেলেছে। দেখা গেছে পৃথিবীর মানুষ যে হারে শক্তি ব্যবহার করছে যদি সেই হারে শক্তি ব্যবহার করতে থাকে তাহলে পৃথিবীর শক্তির উৎস তেল, গ্যাস, কয়লা

AMARBOI.COM

বা ইউরেনিয়াম দিয়ে টেনেটুনে বড় জোর দুইশত বৎসর চলবে। তারপর আমাদের পরিচিত উৎস যাবে ফুরিয়ে। তখন কী হবে?

পৃথিবীর মানুষ সেটা নিয়ে খুব বেশি দুর্ভাবনায় নেই, তার কারণ মানুষ মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই জানে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি ব্যবহার করে এর মাঝে অন্য কিছু বের করে ফেলা হবে—যেমন নিউক্লিয়ার ফিউসান, যেটা ব্যবহার করে সূর্য কিংবা নক্ষত্রেরা তাদের শক্তি তৈরি করে। ফিউসানের জন্যে জ্বালানি আসে হাইড্রোজেনের একটা আইসোটপ থেকে, আর পানির প্রত্যেকটা অণুতে দুটো করে হাইড্রোজেন, কাজেই সেটা ফুরিয়ে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই।

শুধু যে ভবিষ্যতে নূতন ধরনের শক্তির উপর মানুষ ভরসা করে আছে তা নয়, এই মুহূর্তেও তারা এমন শক্তির উপর ভরসা করে আছে যেগুলো কখনো ফুরিয়ে যাবে না। সেই শক্তি আসে সূর্যের আলো থেকে, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা কিংবা ঢেউ থেকে, উন্মুক্ত প্রান্তরের বাতাস থেকে, পৃথিবীর গভীরের উত্তপ্ত ম্যাগমা থেকে কিংবা নদীর বহমান পানি থেকে। আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে এই শক্তিগুলো বলতে গেলে অফুরন্ত। এর একটি গালভরা নামও দেয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে নবায়নযোগ্য (Renewable Energy) শক্তি—অর্থাৎ যে শক্তিকে নবায়ন করা যায়, যে কারণে এটার ফুরিয়ে যাবার কোনো আশঙ্কা নেই।

এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব মানুষ যে পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এই নবায়নযোগ্য শক্তি। যত দিন যাচ্ছে মানুষ ততই পরিবেশ সচেতন হচ্ছে তাই এরকম শক্তির ব্যবহার আরো বেড়ে যাচ্ছে। বাতাস ব্যবহার করে যে শক্তি তৈরি করা হয় প্রতি বছর তার ব্যবহার বাড়ছে প্রায় ত্রিশ শতাংশ, এই সংখ্যাটি কিন্তু কোনো ছোট সংখ্যা নয়।

পৃথিবীর পুরো শক্তির পাঁচ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি। সেই এক ভাগের বেশিরভাগ হচ্ছে জলবিদ্যুৎ, নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা—আমাদের কাপ্তাই লেকের মতো। নদীর পানি যেহেতু ফুরিয়ে যায় না তাই এরকম বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শক্তির উৎসও ফুরিয়ে যায় না এটা হচ্ছে প্রচলিত ধারণা। কিন্তু নদীতে বাঁধ দেয়া হলে পরিবেশের অনেক বড় ক্ষতি হয় সে কারণে পৃথিবীর মানুষ অনেক সতর্ক হয়ে গেছে। যাদের একটু দুরদৃষ্টি আছে তারা এরকম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আর তৈরি করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতীতে অনেক বড় বড় বাঁধ তৈরি করেছিল এখন ধীরে ধীরে সেগুলো ভেঙে আগের জায়গায় যাবার পরিকল্পনা করছে।

27.3 নং ছবি : বাসার ছাদে সোলার প্যানেল বসিয়ে সৌরশক্তি তৈরি করা এখন বেশ পরিচিত একটি দৃশ্য

AMARBOI.COM

জলবিদ্যুৎ করার জন্যে নদীতে বাঁধ দেবার বেলায় সবচেয়ে উদ্যোগী দুটি দেশ হচ্ছে চীন এবং ভারত। ভারতের টিপাইমুখ বিদ্যুৎ প্রকল্পের কথা কে না শুনেছে?

জলবিদ্যুতের পর সবচেয়ে বড় নবায়নযোগ্য শক্তি আসে বায়োমাস (Biomass) থেকে। বায়োমাস কথাটার মাঝে এক ধরনের বৈজ্ঞানিক গন্ধ আছে এবং মনে হতে পারে এটা বুঝি চমকপ্রদ কোনো শক্তির উৎস—আসলে সেরকম কিছু নয়। এটা বলতে বোঝানো হয় লাকড়ি, খড়কুটো এই সব জ্বালানিকে। পৃথিবীর একটা বড় অংশের মানুষের কাছে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ নেই—তাদের দৈনন্দিন জীবন কাটে লাকড়ি, খড়কুটো জ্বালিয়ে। এই দরিদ্র মানুষগুলোর ব্যবহারী শক্তি পৃথিবীর পুরো শক্তির একটা বড় অংশ। যদিও শুকনো গাছ খড়কুটো পুড়িয়ে ফেললে সেটা শেষ হয়ে যায় তারপরেও বায়োমাসকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলার কারণ নূতন করে আবার গাছপালা জন্মানো যায়। তেল, গ্যাস বা কয়লার মতো পৃথিবী থেকে এটা চিরদিনের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যায় না।

নবায়নযোগ্য শক্তির এই দুটি রূপ, জলবিদ্যুৎ আর বায়োমাসকে যদি আমাদের খুব পছন্দের শক্তির উৎস হিসেবে না ধরি তাহলে যে কয়টি বাকি থাকে তার মাঝে গুরুত্বপূর্ণগুলো হচ্ছে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়ো ফুয়েল আর জিওথার্মাল।

শীতের দিনে রোদের উষ্ণতা যে একবারও উপভোগ করেছে সেই আসলে সৌরশক্তির কথাটি জানে। সূর্য পৃথিবীকে অবারিতভাবে শক্তি দিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই আমরা সে কথাটা ভুলে যাই। ভারত টিপাইমুখ বাঁধ তৈরি করে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ তৈরি করার পরিকল্পনা করছে সেটা একটা নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের কাছাকাছি, অর্থাৎ প্রায় হাজার মেগাওয়াট। শুনে অনেকেই অবাক হয়ে যাবে, মাত্র এক বর্গকিলোমিটার এলাকায় সূর্য থেকে আলো তাপ হিসেবে সেই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। তার একটা অংশ বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়ে যায়, রাতের বেলা সেটা থাকে না, মেঘ-বৃষ্টির কারণে সেটা অনিয়ন্ত্রিত, শক্তিটা আসে তাপ কিংবা আলো হিসেবে বিদ্যুতে রূপান্তর করার একটা ধাপ অতিক্রম করতে হয়—তারপরেও বলা যায় এটা আমাদের খুব নির্ভরশীল একটা শক্তির উৎস। সূর্যের তাপকে ব্যবহার করে সেটা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। তার চাইতে বেশি জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে সেটাকে সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তর করা। আজকাল পৃথিবীর

27.4 নং ছবি : বিশাল টারবাইন বসিয়ে বায়ুশক্তি থেকেও বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়

AMARBOI.COM

একটা পরিচিত দৃশ্য হচ্ছে সোলার প্যানেল, বাসার ছাদে লাগিয়ে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ নিজের বাসায় তৈরি করে নেয়।

সৌরশক্তির পরই যেটি খুব দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ফেলছে সেটা হচ্ছে বায়ুশক্তি। আমাদের দেশে আমরা এখনো বায়ু বিদ্যুতের বিশাল টারবাইন দেখে অভ্যস্ত নই কিন্তু ইউরোপের অনেক দেশেই সেটা খুব পরিচিত একটা দৃশ্য। যেখানে এটা বসানো হয় সেখান থেকে শুধু একটা খাম্বা উপরে উঠে যায়, তাই মোটেও জায়গা নষ্ট হয় না সে জন্যে পরিবেশবাদীরা এটা খুব পছন্দ করেন। বিস্তীর্ণ মাঠ বা সমুদ্রোপকূলে বিশাল টারবাইনের পাখাগুলো মন্থর ভঙ্গিতে ঘোরায় দৃশ্যটি বেশ সুন্দর! আজকাল একটা বায়ু টারবাইন থেকে কয়েক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব! আমাদের দেশের সমুদ্রোপকূলেও বায়ুশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে—খানিক দূর এগিয়ে সেটা কেন জানি থমকে আছে!

AMARBOI.COM
27.5 নং ছবি : খাবার থেকে এলকোহল বা জ্বালানি তৈরি এখন আর অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়

পৃথিবীর মানুষ বহুদিন থেকে পান করার জন্যে এলকোহল তৈরি করে আসছে—সেটা এক ধরনের জ্বালানি। ভুট্টা, আখ এ ধরনের খাবার থেকে জ্বালানির জন্যে এলকোহল তৈরি করা মোটামুটি একটা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। রান্না করার জন্যে আমরা যে তেল ব্যবহার করি সেটা ডিজেলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। পৃথিবীতে অনেক ধরনের গাছপালা আছে যেখান থেকে সরাসরি জ্বালানি তেল পাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই এটা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, অনেক দেশই (যেমন ব্রাজিল) এ ধরনের বায়োফুয়েল বেশ বড় আকারে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তবে পৃথিবীর অনেক মানুষ এখনো অভুক্ত, তারা যে খাবারটি খেয়ে বেঁচে থাকতে পারত সেটা ব্যবহার করে বিলাসী গাড়ি চালানোর জন্যে জ্বালানি তেল ব্যবহার করার মাঝে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা আছে সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

নবায়নযোগ্য শক্তির গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি হচ্ছে জিওথার্মাল (geothermal)। আমাদের পৃথিবীর ভেতরের অংশ উত্তপ্ত, আগ্নেয়গিরি দিয়ে যখন সেটা বের হয়ে আসে তখন আমরা সেটা টের পাই। তাই কেউ যদি কয়েক কিলোমিটার গর্ত করে যেতে পারে তাহলেই তাপশক্তির একটা বিশাল উৎস পেয়ে যায়। প্রক্রিয়াটা এখনো সহজ নয় তাই ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু হয় নি। কোনো কোনো জায়গায় তার ভূ-প্রকৃতির কারণে সেখানে এ ধরনের

শক্তি সহজেই পাওয়া যায় সেখানে সেগুলো ব্যবহার শুরু হয়েছে। আইসল্যান্ড খুব ঠাণ্ডা একটি দেশ তারা তাঁদের প্রায় সব মানুষকেই শীতের সময় এই পদ্ধতি থেকে তাপ নিয়ে উষ্ণ রাখে। শুধু তাই নয়, তারা প্রায় কয়েকশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে।

27.6 নং ছবি : প্রকৃতি সহায়ক হলে পানির অভ্যন্তরের শক্তি ব্যবহার করা যায়

AMARBOI.COM

সারা পৃথিবীতেই এখন মানুষেরা পরিবেশ নিয়ে সচেতন হয়ে উঠছে। উন্নতির জন্যে দরকার শক্তি, কিন্তু শক্তির জন্যে যদি পরিবেশকে ধ্বংস করে দেয়া হয় আধুনিক পৃথিবীর মানুষ কিন্তু সেটা মেনে নেয় না। সে কারণে আমরা সারা পৃথিবীতেই একটা পরিবর্তনের সূচনা দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর মানুষ এখন যে কোনো শক্তি যে কোনোভাবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়। আমাদের এই অত্যন্ত কোমল পৃথিবীটার সর্বনাশ না করে, প্রকৃতির সাথে বিরোধ না করে আমরা তার মাঝে লুকানো শক্তিটুকু ব্যবহার করতে চাই।

বর্তমান পৃথিবী সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে—অন্তত এগিয়ে যাবে, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

28. প্লুটো কেন গ্রহ নয়

অন্য যে কোনো গ্রহ থেকে প্লুটোর জীবন কাহিনী বেশি চমকপ্রদ। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরেনাস এবং নেপচুন গ্রহের গতিপথে খানিকটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে জ্যোতির্বিদরা ধারণা করলেন সৌরজগতের আরো বাইরের কোনো গ্রহের আকর্ষণে এই ব্যাপারটা ঘটছে। তারা সবাই মিলে এই গ্রহটার নাম দিলেন প্ল্যানেট এক্স বা এক্স গ্রহ এবং সেটাকে খুঁজতে শুরু করলেন। 1915 সালে একবার এবং 1919 সালে আরেকবার প্লুটোর ছবি তোলা হয়েছিল কিন্তু কেউ সেটাকে গুরুত্ব দেয় নি কারণ সেটা ছিল খুবই ছোট আর অনুজ্জ্বল। ইউরেনাস আর নেপচুনের গতিপথ পাল্টাতে পারে এরকম একটা গ্রহ হিসেবে মনে মনে সবাই আরো বড় কিছু খোঁজ করছিল।

কিছু খুঁজে না পেয়ে জ্যোতির্বিদরা মাঝখানে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। যিনি প্রথমে সেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন, পারসিভেল লোভেল মারা গেলেন 1916 সালে। ধীরে ধীরে কেমন জানি উৎসাহে ভাটা পড়তে শুরু করল।

1929 সালে আরিজনার লোভেল অবজারভেটরিতে আবার নূতন করে রহস্যময় প্ল্যানেট এক্স খোঁজা শুরু হলো। 16 ইঞ্চি একটা টেলিস্কোপ আর ক্যামেরা নিয়ে আকাশের ছবি তোলা শুরু করা হলো, দায়িত্ব দেয়া হলো একজন কমবয়সী শখের জ্যোতির্বিদ ক্লাইড টমবোকে।

28.1 নং ছবি : তরুণ ক্লাইড টমবো প্লুটো গ্রহ খুঁজে বের করেন 16 ইঞ্চি একটা টেলিস্কোপ দিয়ে

AMARBOI.COM

ক্লাইড টমবো-এর জীবনটা প্লুটোর জীবনীর মতোই চমকপ্রদ। খুব ছেলেবেলা থেকেই তার শখ গ্রহ-নক্ষত্রে। চাচার একটা ছোট টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। একটু বড় হয়ে নিজেই আট ইঞ্চি রিফ্লেক্টর দিয়ে একটা টেলিস্কোপ বানিয়ে ফেললেন, প্রথম টেলিস্কোপটা খুব সূক্ষ্ম না হলেও ক্লাইড টমবো-এর টেলিস্কোপ তৈরি করার শখ সেটা দিয়েই শুরু। তার সারা জীবনে তিনি প্রায় চল্লিশটা টেলিস্কোপ তৈরি করেছিলেন।

1928 সালে ক্লাইড টমবো 9 ইঞ্চি রিফ্লেক্টর দিয়ে খুব চমৎকার টেলিস্কোপ তৈরি করেন। সেই বছরেই তার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে এস্ট্রোনমি পড়ার কথা। তিনি উৎসাহে টগবগ করছেন ঠিক তখন প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিতে তাদের পরিবারের সকল ফসল ধ্বংস হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর আর্থিক দুরবস্থা। ক্লাইড টমবো-এর তখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করার সামর্থ্য নেই। হতাশা বুকে চেপে রেখে তিনি পরিবারের চাষ আবাদের কাজে মন দিলেন, মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে তিনি রাতের বেলা তার টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বৃহস্পতি আর মঙ্গল গ্রহ দেখে দেখে তিনি খুব যত্নভাবে তাদের ছবি এঁকে একদিন সেটা লোভেল অবজারভেটরিতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে অবজারভেটরি তখন তাকে একটা চাকরি দিল, তাদের হাতে টাকা-পয়সা ছিল কম, সত্যিকার জ্যোতির্বিদকে বেতন দিয়ে রাখার ক্ষমতা নেই তবে এই শখের কমবয়সী জ্যোতির্বিদকে কম বেতনে রাখা যায়।

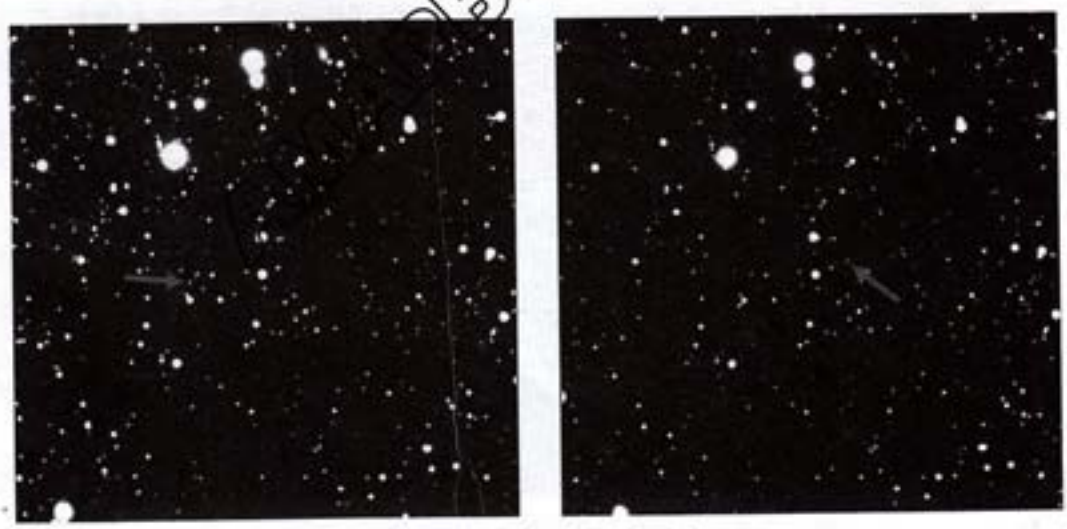

28.2 নং ছবি : এই ঐতিহাসিক ছবিটিতে প্লুটো বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়ে

ক্লাইড টমবো মহাউৎসাহে কাজে লেগে গেলেন। কাজটি খুব আনন্দময় নয়, আকাশের যে অংশে "এক্স গ্রহ"টি পাবার কথা সেই অংশের বিন্দু বিন্দু এলাকায় ছবি তুলে গ্রহটিকে খোঁজা।

1930 সালের 18 ফেব্রুয়ারি ক্লাইড টমবোর পরিশ্রমের ফল বের হয়ে এলো, তিনি ক্যামেরার প্লেটে একটা ছোট বিন্দু খুঁজে পেলেন যেটা সরে যাচ্ছে—একটা নূতন গ্রহ। এক মাস পর খুঁজে পাওয়া এই নূতন গ্রহটির কথা ঘোষণা করা হলো, তার নাম দেয়া হলো প্লুটো। প্লুটো হচ্ছে গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীর মৃতদের দেবতা এবং অন্ধকার জগতের শাসনকর্তা। প্লুটো সূর্য থেকে এত দূরে যে তার কাছে আলো প্রায় পৌঁছায়ই না তাই এই নামকরণটাকে সবাই সঠিক বলেই মেনে নিল।

28.3 নং ছবি : প্লুটো–যেটি তার গ্রহ হওয়ার মর্যাদা হারিয়েছে

নূতন একটা গ্রহ খুঁজে পাবার পর তরুণ শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রি নেই, একটা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে পড়াশোনার জন্যে একটা স্কলারশিপ দেয়ার আগ্রহ দেখাল। ক্লাইড টামবো তখন (1932 সালে) বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার জন্যে ভর্তি হলেন। 1939 সালে তিনি ব্যাচেলর আর মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ করে বের হয়ে এলেন। বাকি জীবনেও জ্যোতির্বিদ্যার জন্যে তার ভালোবাসাটুকু অক্ষুণ্ন ছিল, তিনি সারাজীবনই জ্যোতির্বিদ্যার জন্যে কাজ করেছেন।

WWW.BOI.COM

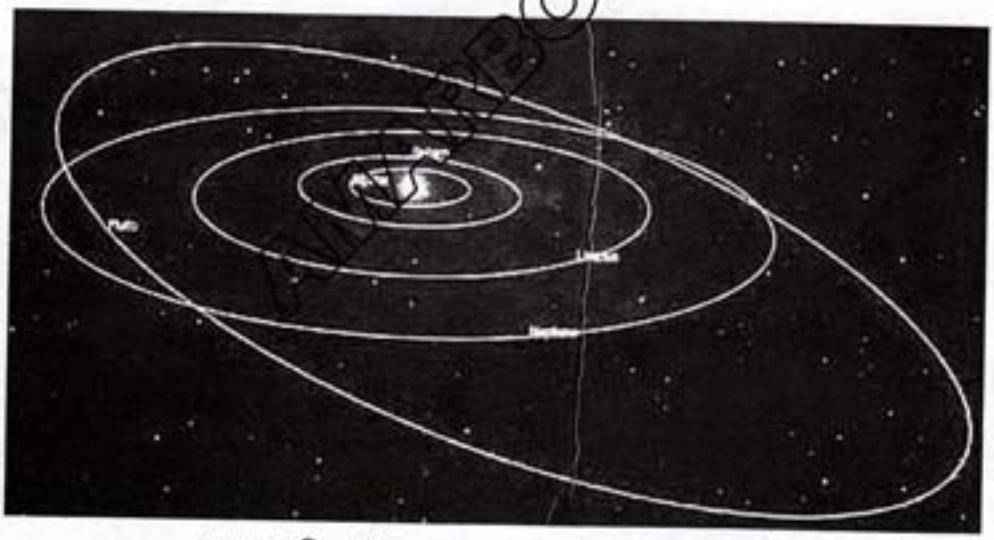

28.4 নং ছবি : প্লুটোর কক্ষপথ অন্য সব গ্রহের কক্ষপথ থেকে ভিন্ন

1930 সালে শেষ পর্যন্ত গ্রহটিকে খুঁজে পাবার পর সকল রহস্যের সমাধান হবার পরিবর্তে নূতন করে সমস্যার জন্ম হতে শুরু করল। তার প্রধান কারণ নূতন খুঁজে পাওয়া প্লুটো নামের

গ্রহটি খুব ছোট। এর ব্যাস মাত্র 1375 মাইল, পৃথিবীর 5 ভাগের এক ভাগ। প্লুটোকে নিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা যে এর কক্ষপথ মোটেও গোলাকার নয়, সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে যখন থাকে তখন তার দূরত্ব 4.5 বিলিয়ন মাইল, যখন কাছে আসে তখন তার দূরত্ব 2.7 বিলিয়ন মাইল। শুধু তাই নয়, এটা যখন সূর্যের কাছে আসে তখন সব নিয়ম ভঙ্গ করে নেপচুন গ্রহের কক্ষপথ ভেদ করে ভেতরে চলে আসে! সৌরজগতের অন্য সব গ্রহ মোটামুটি একই সমতলে, শুধু প্লুটোর কক্ষপথ এই সমতলের সাথে 17° কোণে রয়েছে যেটা খুব বিচিত্র। সৌরজগতের গ্রহগুলোর মাঝে একটা মিল রয়েছে, প্রথম প্রথম চারটা গ্রহ পাথুরে, পরের গ্রহগুলো বায়বীয়, সেই হিসেবে প্লুটোরও বায়বীয় হবার কথা। কিন্তু প্লুটো বায়বীয় নয়, সূর্যকে ঘিরে ঘুরে আসতে পৃথিবীর হিসেবে প্লুটোর 248 বছর লেগে যায়। সেই হিসেবে প্লুটোর একদিন হয় পৃথিবীর 6 দিন 9 ঘণ্টায়। সূর্য থেকে এত দূরে বলে প্লুটো খুব শীতল, তাপমাত্রা শূন্যের নিচে 212 থেকে 228 ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সৌরজগতের একেবারে শেষ মাথায় থাকার কারণে প্লুটো সম্পর্কে জানা তথ্য খুব কম। জ্যোতির্বিদরা ভালো করে এটাকে পর্যবেক্ষণও করতে পারেন নি। তাই এটা খুঁজে পাবার প্রায় অর্ধশতাব্দী পর তারা যখন আবিষ্কার করলেন এই প্লুটো গ্রহটির আবার একটি চাঁদও আছে তারা খুব অবাক হলেন। তার প্রধন কারণ চাঁদটার ব্যাস প্লুটোর ব্যাসের অর্ধেক এবং সেটা প্লুটো থেকে মাত্র 12 হাজার মাইল দূরে। সৌরজগতে আর কোনো গ্রহ নেই যার চাঁদ গ্রহটির ব্যাসের অর্ধেক! প্লুটোর এই বিচিত্র চাঁদটির নাম দেওয়া হলো কেরেন।

28.5 নং ছবি : নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্লুটোকে তার গ্রহের সম্মান দেয়ার জন্যে রীতিমত আন্দোলন গড়ে ওঠে

জ্যোতির্বিদরা আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আরো কিছু বিষয় আবিষ্কার করলেন, তার মাঝে একটা হচ্ছে সৌরজগতের শেষ মাথায় প্লুটোকে ছাড়িয়েও আরো দূরে একটা বস্তু পাওয়া গেছে যার আকার প্লুটো থেকেও বড়। তার নাম দেয়া হয়েছে 2003 UB313 এবং সহজ করে 'জেনা' ডাকা যায়। যদি প্লুটো গ্রহ হয়ে থাকে তাহলে প্লুটো থেকেও বড় একটা কিছু কেন গ্রহ হবে না?

জ্যোতির্বিদদের সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশান এই বছর প্রাগে একটা জরুরি সভায় প্লুটোর ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে বসলেন। সেই আলোচনায় তারা নূতন করে গ্রহ বলতে কী বোঝায় তার সংজ্ঞা তৈরি করলেন। সংজ্ঞাটি এরকম—সৌরজগতে শুধু সেই সব বস্তুকেই গ্রহ বলা হয় যেগুলো আলাদা আলাদাভাবে সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে, যার আকার যথেষ্ট বড় যেন নিজেদের মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে গোলাকৃতি ধারণ করে এবং তার কক্ষপথে ঘোরার সময় তার আশেপাশের এলাকায় নিজের একটা প্রভাব ফেলতে পারে।

AMARBOI.COM

নূতন এই সংজ্ঞার কারণে প্লুটো বেচারা গ্রহের সম্মান থেকে বঞ্চিত হলো। এটি সূর্যকে ঘিরে ঘুরে, তার আকৃতি গোলাকার কিন্তু এটি তার কক্ষপথে নিজের প্রভাব ফেলতে পারে নি। অন্যসব গ্রহ সূর্যকে ঘিরে ঘোরার সময় তার কক্ষপথের কাছাকাছি যত জঞ্জাল রয়েছে তার সবকিছু পরিষ্কার করে ফেলেছে। গ্রহাণু যা অন্য বা কিছু আছে মূল গ্রহটির তুলনায় সেটি খুব নগণ্য, প্লুটো একমাত্র ব্যতিক্রম। এই গ্রহটির কক্ষপথে অসংখ্য ছোট-বড় জঞ্জাল। যে বস্তু নিজের কক্ষপথকে পরিষ্কার করতে পারে না তাকে গ্রহ বলতে সবার আপত্তি! তাকে এখন বলা হচ্ছে "বামন গ্রহ"—এরকম বামন গ্রহ সৌরজগতে রয়েছে 44টি!

28.6 নং ছবি : প্লুটোকে বাতিল করায় এখন গ্রহের সংখ্যা আট

তবে জ্যোতির্বিদরা সবাই যে একমত হয়েছেন তা নয়, তারা এখনো নিজেদের মতো করে তর্ক-বিতর্ক করে যাচ্ছেন। অনেকেই এত সহজে প্লুটোকে গ্রহের অবস্থান থেকে সরাতে রাজি নন। প্লুটো এতদিন গ্রহের সম্মান পেয়ে এসেছে হঠাৎ করে তাকে সরিয়ে দেওয়া খুব সহজ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের নাসা থেকে একটা মহাকাশযান পাঠানো হয়েছিল যেটা 1915 সালে প্লুটো এবং তার চাঁদ কেরেনের কাছে পৌছাবে। আবার সবাই তখন প্লুটো নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠবে, হোক না সে বামন গ্রহ তবুও তার সম্মান অন্য সব বামন গ্রহ থেকে যে আলাদা সে বিষয়ে এখনো সন্দেহ নেই!

ইতোমধ্যে টেক্সট বই বা প্ল্যানেটরিয়াম-এ গ্রহের তালিকা থেকে প্লুটো গ্রহকে সরিয়ে নেয়া শুরু হয়েছে। যে গ্রহটি ঐতিহাসিকভাবে এতদিন সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে রেখেছিল হঠাৎ করে সেটাকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বামন গ্রহ হিসেবে আরো 40টি থেকে বেশি বামন গ্রহের তালিকায় ফেলে দিতে সবারই যে একটু মন খারাপ হচ্ছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছু করার নেই, বিজ্ঞানের জগতে মনের অনুভূতিটুকু সরিয়ে যুক্তি-তর্ক আর বিশ্লেষণকে নিয়েই অগ্রসর হতে হয়।

কাজেই বিদায় প্লুটো, আমরা তোমার অভাবটুকু অনুভব করব!

29. পৃথিবীর মানুষ ও আকাশের চাঁদ

আমাদের জীবনে উপভোগ করার জন্যে যে কয়টি জিনিস আছে তার তালিকায় চাঁদ নিশ্চয়ই একেবারে প্রথম দিকে। আমি নিশ্চিত পৃথিবীতে একজন মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে কখনো না কখনো চাঁদকে দেখে মুগ্ধ হয় নি। আমার নিজের 1971 সালের একটি দিনের কথা মনে আছে, সেই ভয়াবহ দিনটিতে আমাদের পুরো পরিবার তাড়া খাওয়া পশুর মতো জীবন নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, তার মাঝে হঠাৎ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠেছিলাম। সন্ধেবেলা আকাশ আলো করে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, সেই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের কথা আমি আজও ভুলতে পারি না।

AMARBOI.COM

29.1 নং ছবি : পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদের ঘুরে আসতে সময় লাগে 29.5 দিন

মজার কথা হচ্ছে এই চাঁদের অত্যন্ত সহজ কিছু বিষয় কিন্তু অনেক সাধারণ মানুষই ভালো করে লক্ষ করে নি। যারা মুসলমান তারা চাঁদ দেখে রোজা রাখে, চাঁদ দেখে ঈদ করে কিন্তু কেন নূতন একটা সরু চাঁদ আস্তে আস্তে পূর্ণিমার ভরা চাঁদ হয়ে ওঠে আবার পূর্ণিমার ভরা

চাঁদটা কেমন করে অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবে যায় তাদের অনেকেই সেটা জানে না। কেউ যদি এটুকু পড়ে খানিকটা অপরাধ বোধে ভুগতে থাকে তাহলে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতে পারি, এটা নিয়ে লজ্জা পাবার কিছু নেই। পৃথিবীতে অন্তত একটি দেশ রয়েছে যে দেশটি রাষ্ট্রীয়ভাবে এই তথ্যটুকু জানে না সেটা তাদের জাতীয় পতাকার মাধ্যমে স্বীকার করে নিয়েছে! সেটি কোন দেশ এবং কীভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের অজ্ঞানতা প্রকাশ করে বসে রয়েছে সেটা বলার আগে আমরা চাঁদের সহজ কয়েকটা বিষয় জেনে নেই।

আমরা সবাই লক্ষ করেছি প্রতিদিন সূর্য পূর্ব দিকে উঠে আকাশ পাড়ি দিয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। কারণটা খুব সহজ—সূর্য মোটেও ঘুরপাক খাচ্ছে না, সে তার জায়গায় স্থির, পৃথিবীটাই তার অক্ষের উপর ঘুরছে তাই মনে হচ্ছে সূর্যটা বুঝি পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যাচ্ছে। যারা আকাশের দিকে তাকাতে ভালোবাসে তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে চাঁদও পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায় এবং সেই একই কারণে। সূর্যের সাথে চাঁদের একটা পার্থক্য আছে, সূর্যের পূর্ণিমা-অমাবস্যা নেই, সেটা সবসময়ই উজ্জ্বল কিন্তু চাঁদের পূর্ণিমা-অমাবস্যা আছে, সেটা কখনো উজ্জ্বল থালার মতো কখনো ভাঙা কলসির মতো আবার কখনো কাস্তের মতো (উপমাগুলো আমার নয়—কবিদের!)।

AMARBOI.COM

29.2 নং ছবি : চাঁদের কক্ষপথ পৃথিবী আর সূর্যের তলের সাথে 5° কোণ করে আছে

এই ব্যাপারটা ঘটে কারণ চাঁদ সূর্যের মতো স্থির নয়, চাঁদ আসলে পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে। আমাদের দিনের হিসেবে পৃথিবীকে পুরো এক ভাগ ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে 29.5 দিন। কেউ যদি ব্যাপারটা মেনে নেয় তাহলেই সে বুঝতে পারবে কেন চাঁদটা বাড়ে-কমে। 29.1 নং ছবিতে পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদের কক্ষপথকে দেখানো হয়েছে— (ছবিটি সঠিক স্কেলে আঁকা হয় নি, যদি সঠিক স্কেলে আঁকা হতো তাহলে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হতো 60টি পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান!)। প্রতি 29.5 দিনে একবার করে চাঁদ পৃথিবীকে ঘিরে তার কক্ষপথে

যেতে যেতে যখন পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে এসে হাজির হয় তখন যে অংশটুকু পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে সেই অংশটি থাকে ছায়া ঢাকা অন্ধকার। আমরা এটাকে বলি অমাবস্যা, তাই (রাতের বেলাও) চাঁদকে আমরা প্রায় দেখতেই পাই না, ছায়া ঢাকা অংশটা পৃথিবীর দিকে মুখ করে আছে, আমরা কেমন করে দেখব? আবার চাঁদ তার কক্ষপথ ধরে যখন পৃথিবীর অন্য পাশে হাজির হয় তখন চাঁদের আলোকিত অংশটা পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে, আমরা তাই পুরো চাঁদটাকে দেখতে পাই, সেটাকে আমরা বলি পূর্ণিমা। পূর্ণিমার নরম আলো দেখে আমরা সবাই কখনো না কখনো মুগ্ধ হয়েছি এবং আমি নিশ্চিত অনেকেই মনে করে চাঁদের শরীর থেকে সূর্যের আলো বেশ ভালোই প্রতিফলিত হয়—মজার কথা হচ্ছে ব্যাপারটা মোটেও সত্যি নয়। চাঁদের প্রতিফলন ক্ষমতা খুবই কম, এটা একটা কয়লার মতো, সূর্যের আলোর মাত্র 7% প্রতিফলিত করতে পারে! চাঁদ যদি কয়লার মতো কালো না হয়ে আরেকটু উজ্জ্বল হতো, তাহলে পূর্ণিমার আলোতেই আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারত।

যারা এই লেখাটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ছে নিশ্চিতভাবেই তাদের মনের ভেতর দুটো প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। সেটি হচ্ছে অমাবস্যার সময় সত্যি সত্যি যদি 29.1 নং ছবির মতো চাঁদটা পৃথিবীর আর সূর্যের মাঝখানে থাকে তাহলে চাঁদ নিশ্চয়ই সূর্যের আলোটাকে আটকে দেবে। এবং ঠিক একই কারণে পূর্ণিমার সময় নিশ্চয়ই পৃথিবীটাই সূর্যের আলোটাকে আটকে দিয়ে চাঁদটাকে অন্ধকার করে ফেলবে। কথা বলতে কী আসলেই এই ব্যাপারগুলো ঘটে এবং এই প্রক্রিয়া দুটোর নাম হচ্ছে সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ। যারা সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ লক্ষ করে থাকে তারা সবাই জানে সূর্যগ্রহণ হয় অমাবস্যায় এবং চন্দ্রগ্রহণ হয় পূর্ণিমায়।

29.3 নং ছবি : চাঁদকে দেখেই বোঝা যায় এটা কী কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ নাকি শুক্লপক্ষের চাঁদ

যারা এখন পর্যন্ত এই লেখাটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে এসেছে তারা নিশ্চয়ই এখন বলবে, তাই যদি সত্যি হবে তাহলে প্রতি অমাবস্যায় কেন সূর্যগ্রহণ হয় না আর প্রতি পূর্ণিমায় কেন চন্দ্রগ্রহণ হয় না? এর কারণ চাঁদের কক্ষপথটা আসলে পৃথিবী আর সূর্যের সাথে এক সমতলে নয়, এটা তার সাথে 5° কোণ করে রেখেছে (29.2 নং ছবি) তাই প্রতি অমাবস্যায় এটা ঠিক পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে আসতে পারে না আবার প্রতি পূর্ণিমায় চাঁদটি ঠিক সূর্য আর পৃথিবীর সাথে এক সরলরেখায় থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে থাকে আর ঠিক তখন সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়। যখন এই গ্রহণ হয় তখন সারা পৃথিবী থেকে সেটা সমানভাবে দেখা যায় না। 2009 সালের জুলাই মাসের 22 তারিখে যে সূর্যগ্রহণ হয়েছে বাংলাদেশ থেকে সেটা পরিপূর্ণভাবে দেখা গেছে।

AMARBOI.COM

নূতন চাঁদ বলতে আমরা কী বোঝাই এতক্ষণে সেটাও নিশ্চয়ই সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। খাঁটি অমাবস্যায় চাঁদটা থাকে সূর্যের ঠিক বিপরীতে। চাঁদটা যখন একটু সরে আসে এবং পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদের আলোকিত অংশের একটা কিনারাকে দেখতে পাই আমরা সেটাকেই বলি নূতন চাঁদ। নূতন চাঁদ ওঠার কয়েকদিনের ভেতরেই চাঁদ আরো সরে আসে এবং পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদের আলোকিত অংশের আরো অংশ বিশেষ দেখতে শুরু করি। আমরা সেটাকে বলি শুক্লপক্ষ। পূর্ণিমার পর আবার উল্টো ব্যাপার ঘটতে শুরু করে, চাঁদের আলোকিত অংশটা আবার আমাদের আড়ালে চলে যেতে থাকে, আমরা সেটাকে বলি কৃষ্ণপক্ষ। যারা আকাশের চাঁদ দেখতে ভালোবাসেন তারা চাঁদের কোন অংশ আলোকিত সেটা দেখেই বলে দিতে পারবেন কখন শুক্লপক্ষ কখন কৃষ্ণপক্ষ। আমি নিজে সেটি করি দুটো অক্ষর দিয়ে। শুক্লপক্ষে যেহেতু চাঁদ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয় তার জন্যে bright। শব্দের প্রথম অক্ষর b ব্যবহার করি, শুক্লপক্ষে চাঁদ থাকে b-এর বাঁকা অংশের মতো (29.3 নং ছবি)। আবার কৃষ্ণপক্ষে চাঁদ ধীরে ধীরে অন্ধকার হতে থাকে তার জন্যে ইংরেজি শব্দ dark-এর প্রথম অক্ষর d ব্যবহার করা যায়। এই সময় চাঁদ থাকে b-এর বাঁকা অংশের মতো!

যারা আকাশের চাঁদ উপভোগ করেন তাদের পেটের ভেতরে এতক্ষণে আরেকটা প্রশ্ন দানা বেঁধে ওঠার কথা। সেটা হচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ যখন দিগন্ত থেকে প্রথম উদিত হয় তখন সেটা থাকে বিশাল, সেটা যখন মাথার উপরে উঠে যায় তখন সেটা কেন এত ছোট হয়ে যায়? এই অত্যন্ত যৌক্তিক প্রশ্নের উত্তরটি একটু বিচিত্র। সেটি হচ্ছে আসলে এটি সত্যি নয়। চাঁদ যখন প্রথম ওঠে এবং যখন মাথার উপর উঠে তার আকারের পরিবর্তন হয় না—পুরোটাই আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম! আমি জানি এটা মেনে নেয়া কঠিন কিন্তু কেউ যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে তাহলে যন্ত্রপাতি দিয়ে মেপে দেখতে পারে—ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে দেখতে পারে, সে আবিষ্কার করবে কথাটি সত্যি।

সম্ভব নয়

সম্ভব

29.4 নং ছবি : পাকিস্তান এবং তুরস্কের পতাকায় চাঁদ-তারা

চাঁদ নিয়ে তথ্যের কোনো শেষ নেই, কাজেই চমকপ্রদ তথ্যটা দিয়ে শেষ করা যাক। যারা 29.1 নং ছবিটি দেখেছে তারা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারে চাঁদটা যেহেতু পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে তাই নিশ্চয়ই একেক সময় চাঁদের একেক অংশ পৃথিবীর দিকে মুখ করে আছে। তাই আমরা যদি নিয়মিতভাবে চাঁদকে লক্ষ করি তাহলে আগে হোক পরে হোক, একটু একটু করে হলেও আমরা নিশ্চয়ই পুরো চাঁদটাকেই দেখতে পারব। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সেটা সত্যি নয়। চাঁদ যখন পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরে সে সবসময়েই তার একটা নির্দিষ্ট অংশ পৃথিবীর দিকে মুখ

AMARBOI.COM

করে রাখে! আমরা শুধু সেই অংশটাই দেখতে পাই অন্য অংশটা কখনোই দেখি না। চন্দ্রে অভিযান করে মহাকাশযান পাঠিয়ে প্রথম চাঁদের উল্টো পিঠের ছবি তুলে আনা হয়েছিল। (আমরা চাঁদের যে অংশটা দেখি সেখানে "কলংক" অনেক বেশি—চাঁদের কালো অংশকে কেন কলংক বলা হয় আমার কাছে তার সদুত্তর নেই!)। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার, কেউ যেন মনে না করে পৃথিবীর সাথে চাঁদের এই ব্যবহার খুব বিচিত্র কিছু। যখন দুটি গ্রহ বা উপগ্রহ একটা আরেকটাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে, ধীরে ধীরে তারা প্রায়ই এরকম একটা অবস্থানে চলে যায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানে এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে।

লেখার শুরুতে আমরা বলেছিলাম পৃথিবীতে অন্তত একটি দেশ আছে যে দেশটি চাঁদ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচার করে আসছে—সেই দেশটির নাম পাকিস্তান। তাদের জাতীয় পতাকায় সরু চাঁদের পাশে একটি তারা আঁকা আছে (29.4 নং ছবি)। আমরা এতক্ষণে জেনে গেছি চাঁদ কখনো সরু হয়ে যায় না, তার পুরো আলোকিত অংশের খানিকটা দেখি বলে সরু মনে হয়—পুরো চাঁদটা কিন্তু সেখানে আছে। পুরো চাঁদ যদি থাকে তাহলে তার মাঝখানে একটা তারা দেখার কোনো উপায় নেই! পাকিস্তানের জাতীয় পতাকায় যেভাবে চাঁদ-তারা আঁকা আছে সেভাবে তারাটা দেখতে হলে চাঁদের ঠিক মাঝখানে বিশাল এক ফুটো করে রাখতে হবে যেন সেই ফুটো দিয়ে পিছনের তারাকে দেখা যায়।

29.5 নং ছবি : পূর্ণিমার চাঁদ

পৃথিবীর বিজ্ঞানমনস্ক দেশ যখন তাদের জাতীয় পতাকায় চাঁদ তারা বসিয়েছে তখন কিন্তু তারাটাকে ঠিক জায়গায় বসানোর জন্য সেটাকে বসিয়েছে চাঁদের বৃত্তাকারের বাইরে—তুরস্কের জাতীয় পতাকাটা দেখলেই সেটা বোঝা যায়!

পাকিস্তানের জাতীয় পতাকাতে আরো একটা সমস্যা রয়েছে—সেখানে যে চাঁদটি রয়েছে সেটি কী উজ্জ্বলতর হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকা নূতন চাঁদ, নাকী অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবে যাবার আগের মুহূর্তের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ? অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এটা নূতন চাঁদ নয়—এটা ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ!

ভাগ্যিস 1971 সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাজিত করে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করে নূতন জাতীয় পতাকা পেয়েছিলাম, তা না হলে এই অবৈজ্ঞানিক পতাকার দায়ভার আমাদের বয়ে বেড়াতে হতো!

AMARBOI.COM

30. সূর্যগ্রহণ ও একজন সুপার স্টার

2009 সালের জুলাই মাসের 22 তারিখ বহুদিন পর পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আমাদের খুব সৌভাগ্য বাংলাদেশের পঞ্চগড় এলাকা থেকে এ দেশের মানুষ সেটি পরিষ্কারভাবে দেখতে পেরেছিল। এর পরেরটি দেখা যাবে এক শতাব্দী থেকেও বেশি পরে—কাজেই এ সূর্যগ্রহণটি নিঃসন্দেহে এ দেশের ইতিহাসের একটা বড় ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

আমরা এখন জানি চাঁদটা যখন ঠিক সূর্যের সামনে এসে হাজির হয় তখন সূর্যটা ঢাকা পড়ে যায়—আমরা সেটাকেই বলি সূর্যগ্রহণ। আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে আমাদের চাঁদটার আকার মোটামুটি সঠিক এবং এটা সঠিক দূরত্বের একটা কক্ষপথে ঘুরছে। যদি এটা আরো ছোট হতো কিংবা কক্ষপথটা আরো বড় হতো তাহলে এটা কখনোই সূর্যটাকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলতে পারত না আর পৃথিবীর মানুষ কখনোই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখতে পেত না। ঠিক কী কারণে সূর্যগ্রহণ হয় মানুষ যখন জানত না তখন এ ব্যাপারটি নিয়ে যে তাদের ভেতর এক ধরনের আতঙ্ক ছিল সেটা খুব অবাক ব্যাপার নয়। দিনদুপুরে ঝলমলে আলোর মাঝে হঠাৎ করে সূর্য নিভে যেতে যেতে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যায় মানুষ আতঙ্ক অনুভব করতেই পারে। এখনও পৃথিবীর অনেক

30.1 নং ছবি : পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময় সূর্যের করোনাকে দেখা যায়

AMARBOI.COM

মানুষই সূর্যগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নানারকম উপাসনা প্রার্থনা করতে থাকে! যখন সূর্য ঢেকে যাওয়া চাঁদের আড়াল থেকে সরে এসে আবার আলো ঝলমল হয়ে ওঠে সেই মানুষেরা তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

সূর্যগ্রহণ কেন হয় সেটি জেনে যাবার পর পৃথিবীর মানুষের দুশ্চিন্তা কমেছে এবং যখন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয় তখন তারা সেই চমকপ্রদ ঘটনার সৌন্দর্যটি উপভোগ করতে পারে। সূর্য এত উজ্জ্বল যে যদি একেবারে পুরোপুরি পরিপূর্ণ সূর্যগ্রহণ না হয়, যদি তার খুব ছোট একটা অংশও দৃশ্যমান থেকে যায় তাহলে কিন্তু পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সৌন্দর্যটুকু দেখা যায় না। সূর্যের চারপাশে উজ্জ্বল আলোর একটি ছটা থাকে, এটি আসলে মিলিয়ন মিলিয়ন কিলোমিটারব্যাপী সূর্য থেকেও উত্তপ্ত হাইড্রোজেন পরমাণুর একটা বলয়—এটার নাম করোনা এবং এই করোনা থেকে এ ধরনের আলোর বিকীরণ হয়, শুধুমাত্র সূর্যগ্রহণের সময়েই পৃথিবীর মানুষ এটি খালি চোখে দেখতে পারে (30.1 নং ছবি)। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় আরো একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটে, পুরোপুরি দিনের বেলায় হঠাৎ করে আকাশে নক্ষত্রগুলো জ্বলজ্বল করে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে! পৃথিবীতে এর চাইতে চমকপ্রদ ব্যাপার খুব বেশি নেই।

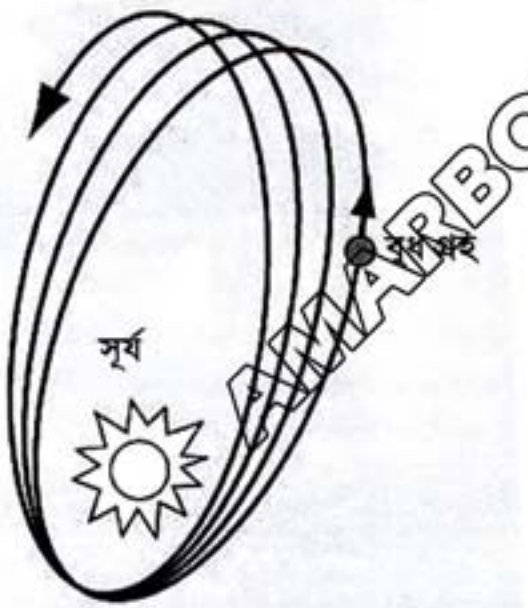

30.2 নং ছবি : বুধ গ্রহের কক্ষপথের বিচ্যুতি– বোঝানোর জন্যে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে

বর্তমানে পৃথিবীতে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় নক্ষত্রদের দেখা একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য কিন্তু একসময় এই বিষয়টি দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হয়েছিল।

আইনস্টাইন 1905 সালে তাঁর স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি প্রকাশ করেছিলেন। স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি প্রকাশ করার সাথে সাথেই তিনি জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। এখন আমরা সবাই জানি এই জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি মহাকর্ষ বলের সঠিক ব্যাখ্যা কিন্তু সেই সময় পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সেটা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। এর আগে মহাকর্ষ বলের জন্যে নিউটন যে সূত্রটি দিয়েছিলেন সেটি দুই শতাব্দী সৌরজগতের চন্দ্র সূর্য গ্রহের আবর্তন থেকে শুরু করে পৃথিবীতে একটা গাছ থেকে একটা আপেল নিচে এসে পড়ার গতিপ্রকৃতি পর্যন্ত সার্বিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারত। মহাকর্ষবলের জন্যে নূতন যে একটা সূত্রের প্রয়োজন আছে সেটা কেউ জানত না। নিউটনের সূত্র মহাকর্ষ সংক্রান্ত সবকিছু ব্যাখ্যা

AMARBOI.COM

করতে পেরেছিল—শুধুমাত্র বুধ গ্রহের কক্ষপথে আবর্তনে একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা বিচ্যুতি সেটা ব্যাখ্যা করতে পারত না। (বিচ্যুতিটা এত ছোট যে সেটা নিয়ে যে বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামাতেন সেটাই অবিশ্বাস্য! একশ বছরে বুধ গ্রহের কক্ষপথে এক ডিগ্রির ছয় ভাগের এক ভাগের একটা বিচ্যুতি হতো।) বৈজ্ঞানিকেরা ভাবতেন হয়তো তাদের চোখে পড়ে নি এরকম একটা গ্রহ রয়ে গেছে, যার টানাপোড়েনে বুধ গ্রহের কক্ষপথে এই বিচ্যুতিটা ঘটছে।

আইনস্টাইন তার জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি দিয়ে বুধ গ্রহের কক্ষপথের এই বিচ্যুতিটা ব্যাখ্যা করে ফেললেন কিন্তু পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা সেটাকে খুব গুরুত্ব দিলেন না। মহামতি নিউটনের মতো বড় একজন বিজ্ঞানীর অত্যন্ত সফল মহাকাশের সূত্রটা ফেলে দিয়ে আইনস্টাইন নামের কমবয়সী অপরিচিত একজন বৈজ্ঞানিকের অবস্থান এবং সময়ের (Space time) সম্মিলিত একটা বিচিত্র সূত্র গ্রহণ করতে কেউ খুব আগ্রহী ছিলেন না।

30.3 নং ছবি : সূর্যের পাশ দিয়ে যাবার সময় দূর নক্ষত্র থেকে আসা আলো বেঁকে যাচ্ছে

AMARBOI.COM

আইনস্টাইন এক ধরনের অস্থিরতায় ভুগছিলেন, তিনি তখন একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর পুরানো সমস্যা ব্যাখ্যা করে তিনি বিজ্ঞানীদের বোঝাতে পারবেন না, তিনি যদি কোনো একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণীটা যদি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় তাহলে হয়তো বিজ্ঞানীরা তার জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি বিশ্বাস করবেন। আইনস্টাইন তখন একটা চমকপ্রদ পরীক্ষার কথা ভেবে বের করলেন। আমরা সাধারণভাবে জানি আলো সরলরেখায় যায়। কিন্তু সূর্যের বিশাল ভরের কারণে তার চারপাশের "স্থান"টুকু বাঁকা হয়ে যাবে, সেই বাঁকা স্থানের কারণে আলোটা যখন যাবে সে আর সোজা যেতে পারবে না, আলোটা বাঁকা হয়ে যাবে। (30.2 নং ছবি) এই পরীক্ষাটা করার জন্যে দরকার নক্ষত্রের আলো—সূর্যের পাশ দিয়ে সেই আলোটা বাঁকা হয়ে যাবে। কিন্তু এই পরীক্ষাটা করার একটা

গুরুতর সমস্যা আছে, সূর্য এত উজ্জ্বল যে তার চোখ ধাঁধানো আলোর কারণে তার আশেপাশে নক্ষত্রকে দেখার কোনো প্রশ্নই আসে না। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন এই পরীক্ষাটা করার একটা মাত্র উপায়, সেটা হচ্ছে—যখন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হবে তখন সূর্যের পাশে দিয়ে আসা নক্ষত্রের আলোগুলোকে দেখা। সূর্যের পাশে দিয়ে আসার সময় নক্ষত্রের আলো ঠিক কতটুকু বেঁকে যাবে আইনস্টাইন সেটা হিসেব করে বের করে রাখলেন।

এখন এই পরীক্ষাটা করার জন্যে দরকার একটা পূর্ণ সূর্যগ্রহণ—কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সূর্যগ্রহণ ইচ্ছেমতো তৈরি করা যায় না। আইনস্টাইন ক্যালেন্ডার ঘেঁটে দেখলেন 1914 সালের 21 আগস্ট রাশিয়ার ক্রিমিয়াতে একটা পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হবে। আইনস্টাইনের একজন বিজ্ঞানী বন্ধু আরউইন ফ্রিয়োনডীচ ঠিক করলেন তিনি রাশিয়াতে যাবেন সূর্যগ্রহণের সময় নক্ষত্রের ছবি তোলার জন্যে।

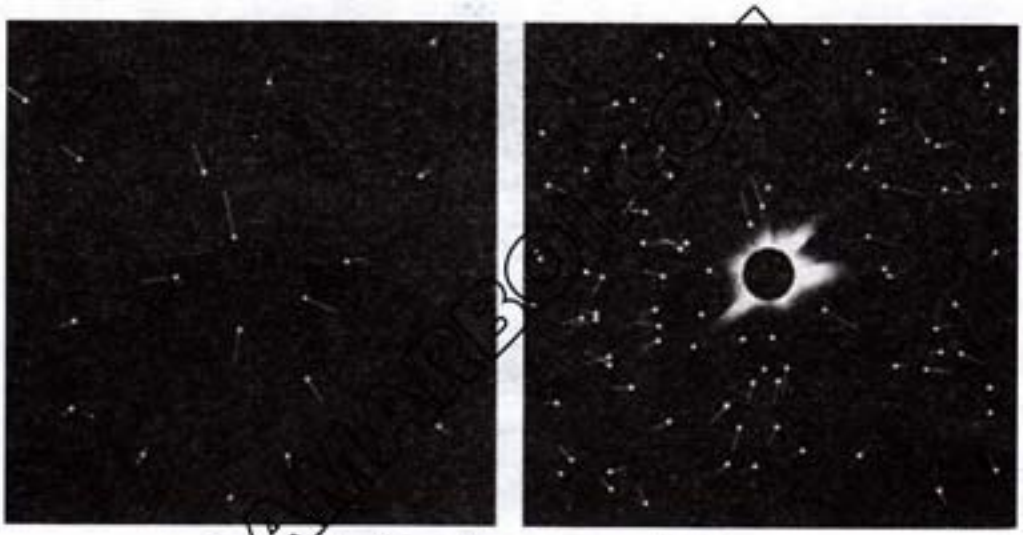

30.4 নং ছবি : সূর্যের কারণে নক্ষত্রের অবস্থানকে পরিবর্তিত দেখা যায়

বিজ্ঞানীদের জীবনে কী ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই অভিযানটি ছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঠিক তখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে এবং বিজ্ঞানী আরউইন ফ্রিয়োনডীচ যখন তার টেলিস্কোপ ক্যামেরা এবং যন্ত্রপাতির লটবহর নিয়ে রাশিয়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঠিক তখন জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে! রাশিয়ার পুলিশ গুপ্তচর সন্দেহ করে তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলল এবং যখন ক্রিমিয়াতে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হচ্ছে তখন এই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জেলখানায়। আরউইন ফ্রিয়োনডীচের কপাল ভালো ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময় কিছু রাশিয়ান অফিসার জার্মানিতে গ্রেপ্তার হয়েছে এবং দুই দেশের যুদ্ধবন্দি বিনিময়ের মাঝে দিয়ে তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন!

সূর্যগ্রহণের সময় নক্ষত্রের অবস্থানের বিচ্যুতি মাপার প্রথম পরীক্ষাটা এভাবে বৃথা যাওয়ায় আইনস্টাইনের যে খুব আশাভঙ্গ হলো সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি আবার ক্যালেন্ডার ঘেঁটে আবিষ্কার করলেন এর পরের পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হবে 1919 সালের 29 মে এবং সেটা দেখা যাবে দক্ষিণ আমেরিকা আর মধ্য আফ্রিকা থেকে। সূর্যগ্রহণের সময় নক্ষত্রের আলোকচিত্র তুলে এই সূক্ষ্ম পরীক্ষাটা করার সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষ ছিলেন কেমব্রিজ অবজারভেটরির আর্থার এডিংটন। কিন্তু তিনি একটা ঝামেলায় পড়ে গেলেন, তখন যুদ্ধ চলছে এবং ব্রিটিশ সরকার তাকে যুদ্ধে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে রইল। এডিংটন নীতিগত কারণে যুদ্ধে অংশ নেবেন না কিন্তু সরকার তাকে যুদ্ধে পাঠাবেই—শেষ পর্যন্ত আরো বড় বড় বিজ্ঞানীরা তাকে যুদ্ধ থেকে রক্ষা করলেন এবং এডিংটন সূর্যগ্রহণের ছবি তোলার জন্যে জাহাজে করে আফ্রিকা রওনা দিলেন!

পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে অনেক সূক্ষ্ম এবং জটিল পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু এই পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ অন্যরকম! এর জন্যে বিজ্ঞানীদের পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। সূর্যগ্রহণ শুরু হয় ধীরে ধীরে এবং সেটা কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয় কিন্তু পূর্ণ সূর্যগ্রহণ থাকে মাত্র কয়েক মিনিট। যদি সেই কয়েক মিনিট কোনো কারণে মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে ফেলে তাহলে বিজ্ঞানীদের হয়তো আরো এক যুগ অপেক্ষা করতে হবে! এডিংটন তার দলবল নিয়ে সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখলেন এবং সূর্যগ্রহণের ঠিক আগে আসা কালো মেঘ এসে আকাশ ঢেকে ফেলল। শুধু তাই নয় রীতিমতো বজ্র বিজলিসহ প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো। বিজ্ঞানীদের কী পরিমাণ হতাশা হয়েছিল সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু তারা আবিষ্কার করলেন ঠিক পূর্ণ সূর্যগ্রহণের আগে আগে আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে এবং মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য উঁকি দিতে শুরু করেছে। এডিংটন একটিবারও আকাশের দিকে না তাকিয়ে তার সহকর্মীদের নিয়ে আলোকচিত্র নিতে শুরু করলেন এবং পূর্ণ সূর্যগ্রহণের 302 সেকেন্ড সময়ে ষোলটা আলোকচিত্র নিয়ে রাখলেন। আলোকচিত্রগুলো ডেভেলপ করার পর দেখা গেল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মাত্র একটা ছবি

30.5 নং ছবি : এডিংটনের সাথে আইনস্টাইন

AMARBOI.COM

এসেছে যেটাকে এই অসাধারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাবে! সেটাকেও বিশ্লেষণ করা হলো এবং দেখা গেল আইনস্টাইন যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। নক্ষত্রের আলো সূর্যের পাশে দিয়ে আসার সময় যেটুকু বেঁকে যাবার কথা ঠিক সেটুকু বেঁকে গেছে!

1919 সালের নভেম্বরের 6 তারিখ সেই বিখ্যাত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো এবং সাথে সাথে আইনস্টাইন নামের একজন তরুণ বিজ্ঞানী বিজ্ঞান জগতের "সুপারস্টার" হয়ে গেলেন!

তিনি এখনো বিজ্ঞান জগতের সুপারস্টার এবং যতদিন পৃথিবীর সভ্যতা টিকে থাকবে তিনি সুপারস্টার হিসেবেই থাকবেন।

AMARBOI.COM

31. অতিকায় হীরক খণ্ড

প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেলে সেটা কয়েক বার দপদপ করে জ্বলে নিভে যায়। সেভাবে আমাদের সূর্যের জ্বালানিও কখনো শেষ হয়ে যাবে কী না, আর সেটাও কয়েক বার দপদপ করে জ্বলে চিরদিনের মতো নিভে যাবে কী না সেটা নিয়েও পৃথিবীর মানুষ নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা করেছে। প্রাচীনকালে কিছুক্ষণের জন্যে যখন সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যটি ঢেকে যেত মানুষের তখন দুশ্চিন্তার শেষ থাকত না—সূর্যগ্রহণ শেষে যখন সূর্য আবার তার পুরো ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ফিরে আসত মানুষ তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত। পৃথিবীর মানুষ যখন আবিষ্কার করেছে যে সূর্যের জ্বালানি প্রদীপের তেলের মতো নয়—এটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া, ভরটুকু আইনস্টাইনের $E = mc^2$ হিসেবে শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তখন তাদের দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে—সূর্যের ভেতরে প্রতি সেকেন্ডে 40 লক্ষ টন পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, সূর্যের ভর তিন লক্ষ পৃথিবীর সমান, কাজেই সেটা চট করে ফুরিয়ে যাবে না। সেটা হতে এখনো প্রায় পাঁচ বিলিয়ন বছর বাকি!

সূর্যের ভেতরে ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার একটা বিশেষ প্রক্রিয়া রয়েছে, সেখানে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে হারিয়ে যাওয়া ভরটুকুকে শক্তি হিসেবে বের করে দেয়। একসময়ে

31.1 নং ছবি : সূর্যের জ্বালানি ফুরিয়ে যেতে এখনো ৫ বিলিয়ন বছর বাকি

AMARBOI.COM

সূর্যের প্রায় পুরোটুকুই ছিল হাইড্রোজেন। এখন এর শতকরা 74% হাইড্রোজেন এবং 25% হিলিয়াম এবং বাকি সবকিছু মিলিয়ে 1%। সূর্যের ভেতরে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে পাল্টে গিয়ে শক্তি দেয়ার ব্যাপারটুকু ঘটে তার কেন্দ্রের কাছাকাছি। মহাকর্ষ বলের কারণে গ্যাসের প্রচণ্ড চাপের ফলে সেখানে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি এবং শুধু সেখানেই নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া হতে পারে। অনুমান করা হয় সূর্যের বর্তমান বয়স 4.6 বিলিয়ন বৎসর এবং যতই দিন যাবে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার পরিমাণ ততই বাড়তে থাকবে। আজ থেকে এক বিলিয়ন বৎসর পরে সূর্যের ঔজ্জ্বল্য শতকরা দশ ভাগ বেড়ে যাবে। সূর্য রশ্মির একটু তারতম্য হলেই শীত-গ্রীষ্ম হয়ে যায়, কাজেই যখন তার ঔজ্জ্বল্য দশ ভাগ বেড়ে যাবে তখন পৃথিবী ছারখার হয়ে যাবে। প্রচণ্ড তাপমাত্রায় পৃথিবী জ্বলেপুড়ে যাবে, মানুষের বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। (এক বিলিয়ন বছর অনেক দীর্ঘ সময়, মানুষ যদি সত্যি ততদিন বেঁচে থাকতে পারে তাহলে তারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এত উন্নত হয়ে যাবে যে পৃথিবীর সমুদ্রের মাঝখানে বেঁচে থাকার কোনো একটা কায়দা বের করে ফেলবে!)

31.2 নং ছবি : সূর্যের জ্বালানি ফুরিয়ে যাবার পর সেটি পরিণত হবে বিশাল রেড জায়ান্টে

সূর্যের কেন্দ্রে যে হাইড্রোজেনটুকু সেটা শেষ হয়ে যাবে আজ থেকে পাঁচ বিলিয়ন বছর পরে। তখন অত্যন্ত চমকপ্রদ কিছু ঘটনা ঘটবে। এতদিন হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম হওয়ার প্রক্রিয়ায় সূর্যের কেন্দ্রে শক্তি তৈরি হতো, সেই শক্তির কারণে বাইরের দিকে যে চাপের সৃষ্টি হতো সেই চাপটা মহাকর্ষ বলকে ঠেকিয়ে রাখত। যখন হাইড্রোজেন শেষ হয়ে কেন্দ্রে শক্তি তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে গেল তখন মহাকর্ষ বলকে ঠেকিয়ে রাখার আর কোনো উপায় নেই, কেন্দ্রের পুরো হিলিয়ামটুকু তখন মহাকর্ষের প্রচণ্ড আকর্ষণে সংকুচিত হতে থাকবে এবং তার তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে সেটা এমন একটা তাপমাত্রায় পৌঁছাবে যে কেন্দ্রের কাছাকাছি যে হাইড্রোজেন ছিল সেগুলো নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া শুরু করে দেবে। যখন নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া হতো কেন্দ্রের ভেতরে তখন শক্তি এবং চাপের একটা সমন্বয় ছিল এবং সে কারণে সূর্যের একটা নির্দিষ্ট আকার ছিল। এখন নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া শুরু হয়েছে কেন্দ্রের বাইরে এবং সেই শক্তির কারণে সূর্যটা হঠাৎ

AMARBOI.COM

ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকবে। দেখতে দেখতে সূর্যটা একশ গুণ বড় হয়ে যাবে। সেই বিশাল সূর্যের আকার বুধ, শুক্র এমন কী পৃথিবীর কক্ষপথকেও গ্রাস করে ফেলার কথা। পৃথিবী সম্ভবত রক্ষা পেয়ে যাবে কারণ তখন সূর্যের ভর শতকরা 24 ভাগ কমে গেছে, মহাকর্ষবলের আকর্ষণও কমে যাবে তাই কক্ষপথটাও হয়ে যাবে বড়। বিশাল সূর্যের এই রূপের নাম রেড জায়ান্ট বা লাল দৈত্য! সূর্যের ঔজ্জ্বল্য তখন তার আগের ঔজ্জ্বল্য থেকে একশ গুণ বেশি সেই প্রচণ্ড তাপমাত্রায় পৃথিবী তখন পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। পৃথিবীর মানুষ তখন থাকবে কী না কেউ জানে না, বিবর্তনে তাদের রূপ কেমন হবে সেটাও অনুমান করা কঠিন। তবে তারা যদি সত্যি ততদিন টিকে থাকে তাহলে সূর্য রেড জায়ান্ট হয়ে পৃথিবীকে গ্রাস করার অনেক আগেই বিশাল মহাকাশযানে করে তারা পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোনো নক্ষত্রের অন্য কোনো সুন্দর গ্রহে গিয়ে আশ্রয় নেবে। অনেকে অনুমান করেন তাদের খুব বেশি দূরে যেতে হবে না বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহের চাঁদ ইউরোপা এবং টাইটান বেশ মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়ে দাঁড়াবে!

সূর্যের এই বিশাল রূপকে রেড জায়ান্ট বা লাল দৈত্য বলা হয় তার একটা কারণ আছে, এখন সূর্য থেকে সাদা রঙের আলো বের হয়, যখন এটি বিশাল রেড জায়ান্টে পরিণত হবে তখন তার থেকে লালচে আলো বের হবে। একটা নক্ষত্রের তাপমাত্রা যদি বেশি হয় তখন তার থেকে নীলাভ আলো বের হয়, তাপমাত্রা যদি কম হয় তখন সেই আলোর রং হয় লালচে। সূর্য রেড জায়ান্ট হবার পর তার ভেতরে মোট শক্তিপরিমাণ বেড়ে যাবে সত্যিই কিন্তু সূর্যের আকারটাও তখন বিশাল, এই বিশাল পৃষ্ঠদেশ থেকে শক্তিটা বের হবে বলে তার গড় তাপমাত্রা অনেক কমে আসবে তাই সেটাকে দেখাবে লালচে। রাতের আকাশে আমরা যদি তারাগুলো লক্ষ করি তাহলে মাঝে মাঝেই দেখি কোনো কোনো তারা লালচে আবার কোনোটা নীলাভ। এদের রংগুলো এরকম হওয়ার পেছনেও সেই একই কারণ।

31.3 নং ছবি : রেড জায়ান্টের পরবর্তী পর্যায়ে সূর্যের পরিণতি হবে হোয়াইট ডোয়ার্ফ নক্ষত্র

সূর্য রেড জায়ান্ট হিসেবে 100 মিলিয়ন বছর টিকে থাকবে। এই সময়টাতে কেন্দ্রের কাছাকাছি হাইড্রোজেন থেকে তৈরি হওয়া হিলিয়াম কেন্দ্রে এসে জমা হবে। যখন যথেষ্ট পরিমাণ হিলিয়াম জমা হবে তখন মহাকর্ষবলের আকর্ষণে কেন্দ্রের তাপমাত্রা আরো বাড়তে থাকবে, সেই তাপমাত্রায় এক সময় সূর্যের কেন্দ্রে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া শুরু হবে, তখন হিলিয়াম থেকে তৈরি হবে কার্বন। বাড়তি ভরটুকু আবার শক্তি হিসেবে বের হতে

শুরু করবে। সূর্যের বর্তমান অবস্থায় শক্তি তৈরি হয় কেন্দ্রে এবং ধীরে ধীরে সেটা বাইরে বের হয়ে আসে তাই তার আকারটুকু ছোট। রেড জায়ান্ট হয়ে যাবার সময় আকার বড় হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার তার আকার ছোট হয়ে যাবে, আমরা এখন যে সূর্য দেখি তার থেকে অল্প একটু ছোট। তবে তখন তার ভেতরে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ায় শক্তি তৈরি হবে—হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম নয়। হিলিয়াম থেকে কার্বন।

তবে এখন হিলিয়ামের পরিমাণ কম এবং দেখতে দেখতে 100 মিলিয়ন বছরের মাঝে সেটা ফুরিয়ে যাবে। সূর্যের কেন্দ্রে শক্তি তৈরি বন্ধ হয়ে যাবে তাই কার্বন নিউক্লিয়াসগুলো মহাকর্ষবলে কেন্দ্রীভূত হতে থাকবে এবং তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে এত বেড়ে যাবে যে দ্বিতীয়বারের মতো কেন্দ্রের বাইরে থাকা হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে শুরু করবে—দ্বিতীয়বারের মতো সূর্যটা রেড জায়ান্টে পরিণত হয়ে যবে। এবারে সেটি হবে আগের থেকেও বড়, তার আকার বৃহস্পতির কক্ষপথ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যাবে। এভাবে 100 মিলিয়ন বছর কেটে যাবার পর সূর্য তার গ্যাসটুকু হারাতে শুরু করবে। মাত্র এক লক্ষ বৎসরের ভেতর সূর্যের বাইরের অংশটুকু গ্যাস হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে।

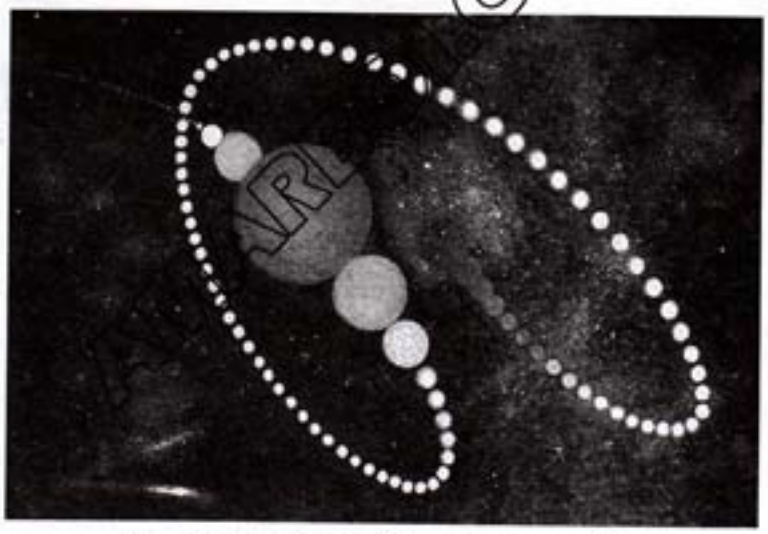

31.4 নং ছবি : সূর্যের জীবন পরিক্রমা ঘটনাবহুল এবং বিচিত্র

ভেতরের কেন্দ্রটুকু তখন আবার সংকুচিত হতে শুরু করেছে। তার তাপমাত্রাও বাড়তে বাড়তে 100,00 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যাবে। কিন্তু এখন আর নূতন করে কোনো বিক্রিয়া শুরু হবে না। সূর্যের এই সংকুচিত কেন্দ্রের আকার এখন মাত্র কয়েক হাজার মাইল, পৃথিবীর কাছাকাছি। এটি এখন মৃত একটি উত্তপ্ত নক্ষত্র—এর নাম হোয়াইট ডোয়ার্ফ বা শ্বেত বামন।

(যদি সূর্যের ভর বেশি হতো তাহলে আরো চমকপ্রদ কিছু বিষয় ঘটত কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার।)

সূর্যের বাকি জীবনটুকু অত্যন্ত সাদামাটা। উত্তপ্ত ক্ষুদ্র নক্ষত্রটি শীতল হতে শুরু করবে। কয়েক বিলিয়ন বৎসর নিয়ে সেটা ধীরে ধীরে শীতল হবে—তার থেকে তখন আলো বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, এই নক্ষত্রটিকে তখন বলা হবে ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ বা কালো বামন!

কালো বামন আসলে অত্যন্ত ছোট জায়গার মাঝে মহাকর্ষবলের প্রচণ্ড তাপের মাঝে আটকে রাখা কার্বন নিউক্লিয়াস। কার্বন নিউক্লিয়াসকে প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হলে সেটা কেলাসিত হয়ে স্ফটিক বা ক্রিস্টাল হয়ে যায়। সেই ক্রিস্টালকে আমরা বলি হীরক বা ডায়মন্ড।

কাজেই আমরা এখন যেটাকে সূর্য হিসেবে দেখছি—আজ থেকে আট-দশ বিলিয়ন বছর পরে সেটা হয়ে যাবে পৃথিবীর আকারের একটি অতিকায় হীরক খণ্ড! কেন জানি মনে হয় আমাদের পরিচিত সূর্যের মৃত্যুর পর হীরক খণ্ড হিসেবে কাটিয়ে দেয়াই বুঝি তার জন্যে মানানসই একটি জীবন!

AMARBOI.COM